তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

লেখক: হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ
সম্পাদনা: মো. রিয়াদুল হাসান
সাহিত্য সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

প্রকাশক: তওহীদ প্রকাশন

তওহীদ প্রকাশন

ঠিকানা: ১৩৯/১ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও-১২১৫
ফোন: ০১৬৮৬৪৬২১৭৫, ০১৭১১০০৫০২৫
Email: hezbuttawheed1995@gmail.com
Web: www.hezbuttawheed.org
www.hezbuttawheed.com
১ম প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫
২য় প্রকাশ: ২৫ এপ্রিল ২০২৫

প্রচ্ছদ: জোবায়ের হাসান
অলঙ্করণ: হেলাল উদ্দিন

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

ISBN: 978-984-99972-4-5

মূল্য: ৫০০ টাকা

আমাদের অন্যান্য বইসমূহ

১. ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
৩. The Lost Islam
৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
৫. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'! (বাংলা ও ইংরেজি)
৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
৯. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
১০. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
১৪. ইসলাম শুধু নাম থাকবে
১৫. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
১৬. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
১৭. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
১৮. দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
১৯. ধর্মব্যবসার ফাঁদে
২০. হলি আর্টিজানের পর...
২১. সওমের উদ্দেশ্য: উপবাস নয় আত্মসংযম
২২. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াইয়ের অপরিহার্যতা
২৩. আক্রান্ত দেশ আক্রান্ত ইসলাম
২৪. সম্মানিত আলেমদের প্রতি
২৫. তওহীদ জান্নাতের চাবি
২৬. শোষণের হাতিয়ার (DIVIDE & RULE -শোষণের হাতিয়ার)
২৭. পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব দূরীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়
২৮. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
২৯. পন্নী পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস
৩০. জঙ্গিবাদ সঙ্কট: উত্তরণের একমাত্র পথ
৩১. পর্দাপ্রথার গোড়ার কথা
৩২. শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদ ও প্রকৃত ইসলাম
৩৩. সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ

নিশ্চয়ই এই কোর'আন সবচেয়ে সুদৃঢ় ও সরল পথে পরিচালিত করে।

সুরা বনি ইসরাইল (১৭:৯)

নিশ্চয়ই এই দীন (ইসলাম) পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে, এমনকি তা কাঁচা মাটির ঘর ও পশমের তাঁবুতেও পৌঁছে যাবে। আল্লাহ এই দীনের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করবেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করবেন।

মুসনাদে আহমদঃ হাদিস ১৬৫০৯

মানবজাতি আজ পর্যন্ত এমন একটা জীবনব্যবস্থা তার নিজের জন্য সৃষ্টি বা প্রণয়ন করতে পারেনি যেটা পালন করলে যান্ত্রিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এই পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে পারে।

এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

সূচিপত্র

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা
(The Concept of a Tawheed-Based Modern State)..................১৯
সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ২৯
তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র: কী কেন কীভাবে
(Modern State on Tawheed: Vision and Strategy).................. ৩৪
তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য: দুটি ঘটনা
(The Purpose of the Tawheed-Based Modern State:
Two Incidents) ৩৯
অন্য মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
(Attitude Towards Another Individual) ৪২
মৌলিক অধিকার
(Fundamental Rights) ৪৪
রাষ্ট্র কাঠামো (Organogram of the State) ৪৫
রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতার ধারাবাহিকতা
(Head of State and Chain of Command)................................ ৪৮
মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers).. ৫৪
শুরা পরিষদ (Advisory Council).. ৫৯
মসজিদ- আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র
(The Mosque – The Center of Administrative and
Spiritual Authority) ৬৩
নাগরিক ও প্রশাসনিক সেবা (Civil Service) ৬৭
রাজনৈতিক দল (Political Parties).. ৭৪
বিচারব্যবস্থা (Judiciary) ৮৪
শিক্ষাব্যবস্থা (Education System) ১০০
ধর্মযাজক ও পুরোহিত শ্রেণি
(Religious Clergy).. ১০৭
প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা
(Defense and National Security)..১১৬
বৈদেশিক সম্পর্ক ও কূটনীতি
(Foreign Relations and Diplomacy) ১২৪

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী
(Law Enforcement Agencies) ১২৮
অর্থনীতি ও বাণিজ্য (Economy and Commerce) ১৪১
ধর্মীয় অধিকার ও সম্প্রীতি
(Religious Rights and Harmony) ১৬৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology) ১৭৫
সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা (Art and Culture).. ১৭৭
যুবশক্তি ও ক্রীড়া (Youth Power and Sports)................................ ১৮২
নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা (Status and Role of Women) ১৮৪
শ্রম ও কর্মসংস্থান
(Manpower and Employment)... ১৯৫
দাসপ্রথা: একটি বিভ্রান্তির অপনোদন
(Slavery: Dispelling a Misconception) ২০১
যুদ্ধবন্দীর অধিকার (Rights of Prisoners of War)......................... ২০৩
গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা
(Press and Freedom of Speech) ২০৭
শাসকের সমালোচনা ও জবাবদিহিতা
(Criticism and Accountability of the Ruler).......................... ২১০
সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (Social Protection System)..................... ২১৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
(Disaster Management, Relief and Rehabilitation) ২২১
স্বাস্থ্যসেবা: পণ্য নয় - অধিকার
(Healthcare: A Right, Not a Commodity)............................. ২২৬
জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা
(Population and Family Planning) ২৩২
পানি সম্পদ ও মৎস্য (Water Resources and Fisheries)............... ২৩৯
পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment and Climate)......................... ২৪৫
কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Agriculture and Food Security) ২৪৬
যোগাযোগ ও পরিবহন
(Communication and Transport).. ২৫০
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
(Power, Energy and Mineral Resources) ২৫৪
পর্যটন শিল্প (Tourism Industry)... ২৫৭

এক নজরে আমাদের মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব
(Our Fundamental Reform Proposal: At a Glance) ২৬৫
হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে দুটি কথা
(About Hezbut Tawheed).. ২৭৯
উন্নয়ন মডেল: চাষীরহাট পাইলট প্রজেক্ট
(Development Model: Chashirhat Pilot Project).................. ২৮১
আমাদের অঙ্গীকার (Our Commitment) ২৯০
আমাদের মূলনীতিসমূহ
(Our Principles)... ২৯১
সমাধানসূত্র: কথা বলতে চাই
(Way Out: We Want to Speak) ২৯২
ইসলামের প্রকৃত আকিদা (The True Concept of Islam) ২৯৩
সালাত (নামাজ) উম্মাহর বাস্তব জীবনের নকশা
(Salat: A Pattern for the Real Life of the Ummah) ৩০০
ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান
(Religion: The Simple Solution to a Big Problem) ৩০৬
রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে অগ্রাহ্যের মানসিকতা কেন?
(Why is Islam deliberately ignored in state affairs?)............ ৩১৩
ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলো কেন দীন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে?
(Why will Islamic democratic parties fail to
establish Deen?).. ৩২২
বিভ্রান্তির বেড়াজালে সুন্নাহ ও হাদিস
(Confusion in the Maze: Sunnah and Hadith) ৩৩৪
হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
(Mohammad Bayazeed Khan Panni:
The Founder of Hezbut Tawheed)... ৩৪৬
পরিশিষ্ট (Appendix)... ৩৫১

লেখক পরিচিতি

অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের চেয়ারম্যান এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার যাবতীয় অসঙ্গতি, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চারণ ইতোমধ্যেই তাঁকে এনে দিয়েছে সুপরিচিতি। জন্ম ২৮ নভেম্বর, ১৯৭২। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পোরকরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা নুরুল হক এবং মাতা হোসনে-আরা বেগম। পিতা ইউপি সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন দুই যুগব্যাপী।

কুমিল্লার নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি ১৯৯৩ সনে স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে প্রথম সারির কর্মী ছিলেন। ৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে তাঁর সাহসী ভূমিকা ছিল। পড়ালেখা শেষ করে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। নিজ এলাকায় তিনি গড়ে তুলেছেন অন্তত অর্ধশতাধিক উন্নয়ন প্রকল্প যা একটি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলকে পরিণত করেছে উন্নত জনপদে।

ছোট বেলা থেকেই ইসলামের চেতনা তাঁকে আকৃষ্ট করত। মুসলিম জনগোষ্ঠীর দুর্দশামুক্তির পথ তিনি খুঁজে বেড়াতেন। ১৯৯৯ সালে টাঙ্গাইলের

করটিয়ার জমিদার পরিবারের উত্তরসূরী হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন, আল্লাহর তওহীদ ও তাঁর দেওয়া সত্যদীনই মানুষের ইহকালীন উন্নতি ও পারলৌকিক মুক্তির একমাত্র পথ। সেই থেকে তিনি উগ্রবাদ, ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, গুজব, হুজুগ ধর্মীয় উন্মত্ততার বিরুদ্ধে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে চলেছেন শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কথা বলে চলেছেন রাজধানীর অভিজাত মিলনায়তন থেকে গ্রামের উঠোনে উঠোনে। তাঁর বজ্রকণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলছে আজ বাংলার ঘরে ঘরে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে তাঁর বক্তব্য দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কেবল জনসভা, সেমিনারে নয়, তাঁর হাতের কলম শানিত তরবারি হয়ে প্রতিটি অন্যায় অবিচারের উপর হেনে চলেছে মরণ আঘাত। তিনি দৈনিক পত্রিকার পাতায় নিয়মিত লিখে চলেছেন মানবতার মুক্তির রূপরেখা। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে **'ধর্মব্যবসার ফাঁদে'** বইটি সচেতন মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ধর্মের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থানের কারণে তিনি ধর্মান্ধ উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলার শিকারও হয়েছেন বহুবার। এ পর্যন্ত ধর্মব্যবসায়ী ও উগ্রবাদীরা তাঁর বাড়িতে চারবার হামলা করে বাড়িঘর লুটপাট করেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। হেযবুত তওহীদের দুজন সদস্যকে তাঁর বাড়ির আঙিনায় নৃশংসভাবে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে।

নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া অবরোধের বিরুদ্ধে তিনি দেশজুড়ে গড়ে তুলেছেন প্রতিরোধ। দেশের তারুণ্যকে অপসংস্কৃতি, মাদক ও ডিজিটাল ডিভাইস আসক্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে তিনি গড়ে তুলেছেন অর্ধশতাধিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। একই সাথে ক্রীড়া ও সংস্কৃতিচর্চার বিরুদ্ধে বিরাজিত ধর্মান্ধ মতবাদকে তিনি প্রতিহত করছেন ইসলামের সঠিক আদর্শ দিয়ে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি শিক্ষার এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন চাষীরহাট নুরুল হক উচ্চ বিদ্যালয়।

হেযবুত তওহীদ বিগত ৩০ বছর থেকেই প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার প্রস্তাব করে আসছিল। ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠায় তিনি সংক্ষিপ্ত কলেবরে 'তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র'- এর রূপরেখা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

ভূমিকা

আমি মনে করি, যারা বইটি হাতে নিয়েছেন, তারা এ সময়ের সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। যুগসন্ধিক্ষণের অনিবার্য দ্বিধা থেকে মানুষকে মুক্ত করবে এই বই। যারা এর মর্ম উপলব্ধি করবেন, তারাও ইতিহাসের অংশ হওয়ার সুযোগ লাভ করবেন। এ বইয়ের পাঠকদের প্রতি আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

প্রসঙ্গ বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কার। বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় অনাচার-অবিচার, সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি, অর্থপাচার, অপরাজনীতি, পরিবারতন্ত্র ইত্যাদি বন্ধের লক্ষ্যে অনেকেই রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই, শুধু প্রশাসনিক কাঠামোর গুটিকয় সংস্কারসাধন করে লাভ হবে না; বর্তমানে যে রাষ্ট্রকাঠামো বা সিস্টেম দিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে, সেই প্রচলিত ব্যবস্থাকেই আমূল পরিবর্তন করে সকল ধর্ম-বর্ণ, পেশার মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

জীবনব্যবস্থা হতে পারে দুই ধরনের- মানবরচিত জীবনব্যবস্থা ও স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা। এতদিন আমাদের দেশ মানবরচিত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে এসেছে, যা একদিনের জন্যও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। গত ৫৪ বছরে ১৭ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, বহু সরকার পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন আইন হয়েছে, কিন্তু জাতির একটি মৌলিক সঙ্কটেরও টেকসই সমাধান হয়নি। মূলত মানবরচিত জীবনবিধান দিয়ে যত মহান নেতা বা দলই দেশ শাসন করুক তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং বাংলাদেশের ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের প্রস্তাবনা হলো- আসুন আমরা মানবরচিত ত্রুটিপূর্ণ জীবনবিধানের চর্চা বাদ দিয়ে, আল্লাহর দেওয়া নিখুঁত, ঐশী জীবনবিধান গ্রহণ করে নিই।

আল্লাহ এক মহা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মানুষকে তাঁর 'খলিফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন (সুরা বাকারা ২:৩০)। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে দায়বদ্ধ। আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকে স্বয়ং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন। কিন্তু পৃথিবীকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন মানুষকে। তাই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের দায়িত্ব (এবাদত) হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধান মোতাবেক পৃথিবী পরিচালনা করা, যাতে মানুষসহ পৃথিবীতে অবস্থানরত সমস্ত সৃষ্টি শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় বসবাস করতে পারে। এই দায়িত্ব সে যেন পালন করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে

আল্লাহর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা (হেদায়াহ) ও জীবনব্যবস্থা (সত্যদীন) যা আল্লাহ যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে নবী-রসুলদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ যে দীন পাঠিয়েছেন, সেখানে যেমন নামাজ-রোজা ইত্যাদির বিধান দিয়েছেন, একইভাবে তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, সামরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিধানও দিয়েছেন। এটা সাধারণ জ্ঞান যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন কোন বিধানে মানুষের জীবনে শান্তি আসবে। তাই তিনি বলেছেন, সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তাঁর (সুরা আরাফ ৭:৫৪)। তাই তাঁর হুকুম-বিধানকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত। এই প্রস্তাবের ভিত্তি কেবল বিশ্বাস বা যুক্তি নয়, বরং ইতিহাসও তার সাক্ষী।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরবের জাহেলি সমাজের চিত্র কতটা ভয়াবহ ছিল। সেখানে জন্মগ্রহণ করে আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) যখন কঠিন সংগ্রাম ও কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তওহীদভিত্তিক দীনুল হক বা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন, ক্রমান্বয়ে আরবের চেহারা পাল্টে গেল এবং অনাবিল শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। এমন নিরাপদ সমাজ গঠিত হলো যে, একা একজন নারী রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে শত শত মাইল পথ হেঁটে যেত; মানুষ ঘরের দরজা খুলে ঘুমাতে পারত; স্বর্ণের দোকান খোলা রেখে মসজিদে যেত; আদালতে মাসের পর মাস অপরাধ-সংক্রান্ত মামলা আসত না; কালেভদ্রে দুই একজন নফসের তাড়নায় অপরাধ করে ফেললেও নিজেই বিচারকের কাছে এসে নিজের শাস্তি দাবি করত। এমন সমাজ কি কল্পনা করা যায় যেখানে ঘরে ঘরে অস্ত্র, অথচ কোনো পুলিশ নেই, অস্ত্রের কোনো লাইসেন্স নেই, আবার কোনো অপরাধও বলতে গেলে নেই। মানবাধিকার এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, ধর্ম-বর্ণ, সাদা-কালো, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, আরব-অনারব, মুসলিম-অমুসলিম, মালিক-শ্রমিক ভেদাভেদ ছিল না। সবাই সমাজের চোখে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। অথচ কিছুদিন আগে এই মানুষগুলোই সকল প্রকার পাপকর্মে, দুর্নীতিতে, মাদকে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ও বিশৃঙ্খলায় ডুবে ছিল। কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় সেই মানুষগুলোই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, মানবতার কল্যাণকামী ও ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত উন্নত চরিত্রের মানুষে পরিণত হলো? সেটা হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীনের আদর্শ, যা আল্লাহ নিজে রচনা করেছেন ও রসুল (সা.) এর মাধ্যমে মানবজাতিকে দান করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন সমস্ত দীনের উপর একে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন (সুরা তওবা ৯:৩৩, সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯)।

রসুল (সা.) ও সাহাবীদের সংগ্রামের মাধ্যমে অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই বিশাল এলাকায় ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তা কায়েম হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস হলো- রসুল (সা.) ও তাঁর

সাহাবীগণ দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর ইতিহাসের একটি পর্যায়ে এসে এই উম্মাহ প্রথমে তাদের লক্ষ্য ভুলে গেল। তারপর তারা দীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অতিব্যাখ্যা, সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, অতি বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ি করল। ফলে মতভেদ করে তারা বহু ফেরকা মাজহাব তরিকায় বিভক্ত হয়ে গেল। নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব করে উম্মাহ ঐক্যের শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ল। আর সেই সুযোগে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আমাদেরকে সামরিক শক্তিবলে পরাজিত করে দুশো বছর শাসন ও শোষণ চালায়। এই সময় ইউরোপীয়রা আমাদের জাতীয় জীবন থেকে আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয় এবং তাদের তৈরি সুদভিত্তিক অর্থনীতি, দলাদলির রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দুর্নীতিগ্রস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া, স্বার্থবাদী আমলাতন্ত্র ও বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিল। তারপর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের মনে-মগজে গেঁথে দেয় যে, আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা প্রাচীন ও সেকেলে, যা আধুনিক যুগে অচল (নাউজুবিল্লাহ); পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দের তৈরি ব্যবস্থা অত্যাধুনিক, উন্নত ও সম্মানজনক।

তাদের এই মগজ ধোলাইয়ের ফল হয়েছিল এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয়রা যখন ভারতবর্ষকে আপাত 'স্বাধীনতা' দিয়ে চলে গেল, আমাদের মুসলিম নেতারা তখনও ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেওয়া সেই কেরানি তৈরি ও প্রশাসন পরিচালনার অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে চালু রাখলেন, স্বাধীন দেশেও তারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রয়োগ করলেন না। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও সিস্টেমেই আমাদের দেশ চলছে, আর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, লুটপাট, টাকা পাচার, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, খুন, গুমও বেড়ে চলেছে। যুগের পর যুগ আমরা মানবরচিত বিধানের মাশুল দিচ্ছি। এমতাবস্থায় হেযবুত তওহীদের কথা হচ্ছে- আর কালবিলম্ব না করে আসুন এবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের সিস্টেম পরিবর্তন করে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীনুল হক) আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করি, তবেই আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি আসবে। আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলো অত্যন্ত মানবিক, প্রাসঙ্গিক, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক। উপরন্তু অত্র অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার সাথেও সঙ্গতিশীল। কাজেই আমরা জনগণ, সরকার, সুশীল সমাজ, শিক্ষক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কৃষক, শ্রমিক সকলকে আমাদের প্রস্তাবনা বিবেচনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহর দেওয়া আধুনিক জীবনব্যবস্থার রূপরেখা কীভাবে উপস্থাপিত হবে তা আমরা এই পুস্তকের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে চলমান সকল প্রক্রিয়াই পরিত্যাজ্য, এমনটি আমরা মনে করি না। বরং, আমরা বিশ্বাস করি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

নতুন পরিচালনার পন্থা ও বিধি-বিধানের বিকাশ ঘটেছে। তবে আমরা শুধু সেই সমস্ত বিধানগুলোকেই পরিত্যাজ্য মনে করি, যেগুলি আল্লাহর কেতাব কোর'আনে বর্ণিত মূলনীতির বিরুদ্ধে যায় এবং সময়ের বিবর্তনে আবেদন হারিয়েছে। তাই চলমান ব্যবস্থাগুলোতে প্রচলিত যে বিধি-বিধানগুলো আল্লাহর কেতাবের মূলনীতিকে লংঘন করে না, সেগুলো প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

আমরা এ বইয়ে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থার সেই রূপরেখা (Outline) তুলে ধরেছি, যা মহামহীম আল্লাহ তাঁর করুণায় আখেরি নবী (সা.)-এর মাধ্যমে নাজিল করেছিলেন। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই রূপরেখার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বইয়ে তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থা সংক্রান্ত বক্তব্যের সারবাণী উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রস্তাবনায় আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা তওহীদকে গ্রহণ করেছি। মহানবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদুনের আদর্শকে আমরা রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার মডেল হিসাবে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমরা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শন, এই উপমহাদেশের কৃষ্টি, জীবনধারা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করেছি। তারমধ্যে যেগুলো আল্লাহর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কল্যাণকর সেগুলো গ্রহণ করেছি। এভাবে, আমাদের দেশের চলমান সংকট নিরসনে একটি যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা আমরা জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। আমাদের উপস্থাপনায় কোনো অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি থাকলে সেটা জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা মানুষ, আমরা ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মহান রাব্বুল ইজ্জতের কাছে পানাহ চাই।

একুশে বইমেলা উপলক্ষে বইটির প্রথম মুদ্রণ তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশের পর আমরা পাঠকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পাই এবং বইমেলাতেই সব কপি শেষ হয়ে যায়। বইটি আমরা সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দিয়েছি। পাশাপাশি বহু লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীকেও বইটি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একাধিক গবেষক বইটি পড়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সেগুলো গ্রহণ করেছি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ
২৫ এপ্রিল ২০২৫, ঢাকা

উৎসর্গ

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী (১৯২৫-২০১২)

প্রতিষ্ঠাতা, হেযবুত তওহীদ

তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা পরিপূর্ণরূপে হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।

সুরা নিসা ৪:৬৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা
(The Concept of a Tawheed-Based Modern State)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে বহু ধরনের সরকার গঠিত হয়েছে। কোনোটা সামরিক, কোনোটা একনায়কতান্ত্রিক, কোনোটা গণতান্ত্রিক। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কোনো সরকার ব্যবস্থাতেই ঘটতে দেখা যায়নি। বর্তমানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে দেশ চলছে। বিভিন্ন দিক থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব আসছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটি বৈষম্যহীন, অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, অপরাজনীতিমুক্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের চেতনা তীব্রতর হয়েছে, যেটা পূর্বেও কিছু পরিমণ্ডলে ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের একটি জোর আওয়াজ সরকার ও জনগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই।

নিঃসন্দেহে একটি রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে কিনা তা নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রে গৃহীত ব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন বা জীবনবিধানের (System of life) উপরে। সিস্টেমটাই যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে কখনোই সেখানে শান্তি আসবে না। বহুরকম চিন্তাভাবনা ও মতবাদ দিয়ে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সংবিধানটি ১৯৭২ সালে তৈরি করা হয়েছিল সেটাকে এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধনও করা হয়েছে। কিন্তু এত করেও শাসকদের স্বৈরাচার হয়ে ওঠা বন্ধ করা যায়নি। বহু আইন-কানুন, বিধি-বিধান রচিত হয়েছে কিন্তু কোনো কিছু দিয়েই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, রাজনৈতিক হানাহানি, রক্তপাত, গরিব মানুষের দুঃখ দুর্দশা, বৈদেশিক ঋণের চাপ, অর্থপাচার, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ হয়নি বরং বেড়েই চলেছে। কারো সদিচ্ছা থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়নি। কারণ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। এখন রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে যদি আমরা এসব দুর্গতি থেকে মুক্তি পেতে চাই তাহলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বজায় রেখে কিছু নিয়মকানুন পাল্টালে কোনো লাভ হবে না, আমাদেরকে রাষ্ট্রচিন্তা ও ব্যবস্থার বুনিয়াদি পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদেরকে ভুললে চলবে না, আমরা কয়েক শ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির গোলামি করেছি। '৪৭ এ আপাত স্বাধীনতা পেলেও তাদের ব্যবস্থার দাসত্বনিগড় থেকে আমরা এখনও মুক্ত

হতে পারিনি। তাদের রেখে যাওয়া অর্থব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির অনুকরণ করেই আমাদের রাষ্ট্র চলছে। **এখন আমাদের জাতিগতভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পশ্চিমা সভ্যতার তৈরি সেইসব ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণই আমাদের অশান্তির প্রধান কারণ।** কাজেই তাদের অন্ধ অনুকরণ ও আনুগত্য থেকে আমাদের সরে আসতে হবে এবং তাদের ব্যবস্থাকে নির্মোহভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে মন্দ দিকগুলো পরিত্যাগ করতে হবে।

আমাদের সমাজে আজ দু ধরনের কট্টরপন্থার বিরোধ ও সংঘাত (Clash) চলছে- কট্টর সেক্যুলার ও কট্টর সাম্প্রদায়িক। কট্টরপন্থী সেক্যুলারদের কাছে ধর্ম মানেই সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মীয় আলোচনা উঠলেই তাদের কথায়, লেখায় এমনকি চোখেমুখে অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পায়। তারা প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় চর্চাকে সীমাবদ্ধ করতে চায় এবং চূড়ান্ত বিচারে নির্মূল করতে চায়। তারা ধর্মকে জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে মেলানোর ঘোর বিরোধী। অপরদিকে, কট্টর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় মতামতকে সমাজের অন্যান্য ধর্মের উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। প্রাকৃতিকভাবেই প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। তাই এই দুটো শিবির একে অপরের বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে উগ্রতা ও একরাশ ঘৃণা নিয়ে বাঁচে। তার প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রের উপর।

মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখনই কেউ কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখনই সেটা ফ্যাসিবাদের (Fascism) রূপ ধারণ করে। ধর্ম নিয়েও আমাদের সমাজের সংকটটা এখানে। যে কাজগুলো খুবই প্রাকৃতিক সেগুলোর পথে যখন ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ধর্মগুরুরা বাড়াবাড়ি রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে থাকেন, যখন মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার উপর ধর্মীয় মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন একটা পর্যায়ে মানুষ ধর্মেরই বিরুদ্ধে চলে যায়। সে ধর্মকে ভয় পেতে এবং এড়িয়ে চলতে শুরু করে। যেমন- মানুষ গান গাইবে এটা তার স্বাভাবিক প্রবণতা। এখন ধর্মের নাম করে তাকে বলা হচ্ছে গান-বাদ্য হারাম। অথবা নারী ও পুরুষ সবাই স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চায়, এটা তাদের উভয়েরই প্রাকৃতিক চাহিদা। এখন নারীকে বলা হল- তুমি বাইরে যাবে না, অন্য পুরুষ যেন তোমাকে না দেখে। তোমার চুল, নাক, মুখ সব কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যা মূলত কোর'আনের বিধান নয়, যা পণ্ডিতদের বাড়াবাড়ি। এ ধরনের অপ্রাকৃতিক সিদ্ধান্ত যখন মানুষের উপর জোর করে চাপানো হয়, তখন ধর্মের প্রতি মানুষ নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে এবং তার সাথে ধর্মের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সরাসরি বিরোধ ঘটে যখন একটি ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী রাষ্ট্রকেও তার ধর্মের ছাঁচে ফেলে দিতে চায়। কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সকল ধর্ম ও বর্ণ, মতের মানুষের সমন্বয়ে রাষ্ট্র তৈরি হয়। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ তিনটি - আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই সবগুলো বিষয় সকল মানুষেরই প্রয়োজন, এগুলো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের বিষয় নয়। তাই এসব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল ধর্মের মানুষের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন আছে। সে হিসাবে এটি একটি সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়। তাই এমন একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম প্রয়োগ করা দরকার, যেটা সকলের এইসব মৌলিক চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারগুলো পূরণ করতে পারে। সেই সিস্টেমটাই হচ্ছে দীন বা জীবনব্যবস্থা। আমরা যে জীবনব্যবস্থার প্রস্তাব করছি সেটা আল্লাহর রচিত জীবনব্যবস্থা। সকল জীবনব্যবস্থার মত এরও একটি দার্শনিক ভিত্তি, মৌলিক নীতিমালা ও কাঠামো রয়েছে। অতি সংক্ষেপে সেই বিষয়গুলো এখানে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমত- জীবনদর্শন (Philosophy of Life)। বর্তমানে প্রায় সমগ্র মানবজাতি যে জীবনদর্শন গ্রহণ করে নিয়েছে সেটা হলো পাশ্চাত্য জীবনদর্শন। এই পাশ্চাত্য জীবনদর্শনকে এক বাক্যে বললে অনেকটা এমন হবে যে, দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফুর্তি কর। অর্থাৎ আমাদের জীবন একটাই যা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবে। কাজেই যতদিন বেঁচে আছ ততদিন এই জীবনটাকে যতভাবে পারা যায় ভোগ কর। আর ভোগ করার জন্য চাই বস্তু ও বস্তুগত উন্নয়ন। সেজন্য চাই টাকা। কাজেই টাকার পেছনে ইঁদুরের মতো দৌড়াও। এ কারণেই এ সভ্যতাকে বলা হয় ভোগবাদী, বস্তুবাদী সভ্যতা (Consumerist and Materialistic Civilization)। এই জীবনদর্শনে মানুষের পরিচয় হচ্ছে, সে এক উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীব। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক বাদে ইতর প্রাণীর সাথে তার যেন আর কোনোই পার্থক্য নেই। আর মানুষের সফলতা হলো এই বুদ্ধিকে ব্যবহার করে বেশি বেশি অর্থ উপার্জন ও বস্তুগত উন্নয়ন ঘটানো আর জীবনকে আরো বেশি উপভোগ্য করে তোলা। এর যা ফল হয়েছে সেটা হলো, যে যত বুদ্ধি ও কৌশল খাটাতে পারে সে তত অর্থের মালিক হচ্ছে; আর যার যত অর্থ সে তত সম্মান, সুখ-সুবিধা, ক্ষমতা লাভ করছে। এখানে আত্মা বলে কিছু নেই, স্রষ্টা বলে কিছু নেই, মৃত্যুর পরে আখেরাত বলে কিছু নেই, স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি বা পুরস্কার-তিরস্কার বলে কিছু নেই। কাজেই এই জীবনদর্শন গ্রহণ করে মানুষ অনিবার্যভাবে হয়ে উঠছে লোভী, স্বার্থপর, কপট, দুর্নীতিবাজ, অসৎ। কিন্তু প্রাচ্যের সমস্যা হল, আমরা জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছি পাশ্চাত্যের ভোগবাদী,

বস্তুবাদী, আত্মাহীন জীবনদর্শন কিন্তু ঐতিহ্যগত কারণে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা থেকে আবার ধর্মকেও বাদ দিতে পারিনি। এ অঞ্চলের মানুষ বংশ পরম্পরায় ধর্মবিশ্বাস লালন করে আসছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের জাতীয় জীবনও পরিচালিত হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও শেষে ইসলাম ধর্মের প্রচলিত বিধান মোতাবেক। ফলে এখানে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জীবনদর্শনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমাদের মতে, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের দর্শন হওয়া উচিত স্রষ্টার প্রেরিত ধর্মগুলোর মূল শিক্ষার উপর ভিত্তি করা।

যে কোনো দর্শন মানবজীবনের গুরুতর প্রশ্নগুলোর (Metaphysical questions) জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে যে, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি এবং কোথায় যাব। আমরা ইসলামের দর্শনে বিশ্বাসী। সে মতে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়ার আগে একটি জীবন ছিল, যা ছিল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীতে আমরা যে জীবন লাভ করেছি এর একটি উদ্দেশ্য আছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার মধ্য দিয়ে তাঁর গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। সেটা হবে কীভাবে? সেটি হবে মানবজীবন থেকে সকল অন্যায় অবিচার অশান্তি যুদ্ধ রক্তপাত নির্মূল করে একটি অনাবিল শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা এবং সেটা শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার মাধ্যমে, আল্লাহর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য প্রমাণ করার মাধ্যমে। এখানে আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা আমাদের জীবন কীভাবে চালাব তার সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটি অদৃশ্য সত্তাকে আল্লাহ আমাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন- সে হচ্ছে ইবলিস। এখন দুনিয়াটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। এখানে ভোগবিলাস করে কাটিয়ে দেওয়াই জীবনের সার্থকতা নয়। কারণ এই জীবনের পরে আমাদের আরেকটি জীবন আছে। সেখানে আমাদের সবাইকে পৃথিবীর নশ্বর এই জীবনের কর্মফল ভোগ করতে হবে। সেই জীবন চিরস্থায়ী।

দ্বিতীয়ত- জীবনব্যবস্থার ভিত্তি (Foundation of the way of life)। আমরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রস্তাব করছি, তাকে আমরা আখ্যায়িত করছি তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই তওহীদভিত্তিক কথাটির মানে কী? আমরা জানি, তওহীদ শব্দটি এসেছে আরবি 'ওয়াহদানিয়াত' শব্দ থেকে যার অর্থ একত্ববাদ। শব্দটি বহুত্ববাদের বিপরীত। বহুত্ববাদ কথাটিকে বোঝানোর জন্য আরবিতে 'শিরক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তওহীদের তাৎপর্য হচ্ছে- একজনকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে সমগ্র জীবনজুড়ে কেবল তাঁরই আনুগত্য করা। যে বাক্যের মাধ্যমে এই তওহীদের ঘোষণাকে প্রকাশ করা হয়

সেটি হচ্ছে পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইলাহ শব্দের অর্থ তিনি এমন এক সত্তা যার হুকুম মানতেই হবে (He who is to be obeyed)। সুতরাং তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থ হল- এই রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে কেবল স্রষ্টার হুকুম- যিনি এক ও অদ্বিতীয়; যাঁকে আমরা মুসলমানেরা বলি আল্লাহ।

আমাদের এই দেশের শতকরা ৯৯% মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোক রয়েছেন এবং তারা কেউ স্রষ্টাকে আল্লাহ, কেউ ভগবান, কেউ ঈশ্বর বলে ডাকেন। যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক, এ সত্য সকলেই স্বীকার করবেন যে তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি, প্রতিভূ (Representative) হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তাই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের মূল দায়িত্ব স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করা। মানুষ কোন ব্যবস্থা, বিধি-বিধান মেনে চললে শান্তি, ন্যায় সুবিচারের মধ্যে থাকবে সেটা সর্বজ্ঞানী মহাপ্রভু আল্লাহ মানুষের চেয়ে ভালো জানেন। তাই তিনি যুগে যুগে নবী-রসুলদের মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি যে পথনির্দেশনা (Guideline) দিয়েছেন, সেটাকে কোর'আনে বলা হয়েছে হেদায়াহ। সেই পথটা হচ্ছে- তওহীদ অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। **আমাদের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, যদি আমরা বাস্তবিক অর্থে শান্তি পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আমরা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রশ্নে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম-বিধান মানবো না।** আল্লাহ যেটাকে বৈধ করেছেন, সেটাই বৈধ, যেটাকে অবৈধ করেছেন সেটাই অবৈধ। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হবে আল্লাহর হুকুম, এই সিদ্ধান্তের নামই হলো- তওহীদ। জীবনের যে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যাঁর কথা চূড়ান্ত বা শেষ কথা, তাকেই বলে সার্বভৌমত্ব (The Sovereign)। এই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে হবে- এই সিদ্ধান্ত স্থির করাটাই হলো একটি জাতিসত্তা, একটি সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা একটি সভ্যতা নির্মাণের পূর্বশর্ত ও প্রথম পদক্ষেপ। আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.) ঠিক এই শর্তের উপরে, অর্থাৎ আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হলেন আল্লাহ, যেখানে আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত থাকবে সেখানে অন্য কারো কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য হবে না, আল্লাহর কথাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে- এই মানদণ্ডের উপরেই তাঁর জাতিসত্তা (উম্মাহ) গড়ে তুলেছিলেন।

তৃতীয়ত- জীবনব্যবস্থা (System of Life)। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, আইন ও দণ্ডবিধি ইত্যাদি কীভাবে চলবে, কোন নীতি মেনে কে বা কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ইত্যাদি বিধি-ব্যবস্থাই হচ্ছে দীন। দীন

অর্থ হলো জীবনব্যবস্থা (System of life)। এটা হতে পারে দুই ধরনের; একটি হলো আল্লাহর তৈরি করা দীন, আরেকটা হলো মানুষের তৈরি করা দীন। মানুষ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, তাই মানুষের তৈরি ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু আল্লাহ সকল ভুলের ঊর্ধ্বে; কাজেই তাঁর দেওয়া জীবনব্যবস্থাও হবে নির্ভুল। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করা জীবনব্যবস্থার বিধি-বিধান রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারসহ জীবনের সর্ব অঙ্গনে গ্রহণ করতে হবে। এই আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাকে অন্যান্য সকল ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছেন (সুরা তওবা ৯:৩৩, সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯)। **আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, আল্লাহর দেওয়া এই দীন যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই কেবল সমাজে পূর্ণরূপে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি আসবে।** দীন প্রতিষ্ঠার এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর রসুলকে ৯ বছরে অন্তত ৭৮টি যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত আরবের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ করে একজন গোত্রপতি বা রাজা হয়ে যাননি, বরং তিনি একটি মহান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চতুর্থত- কর্মসূচি (Modus operendy/Action plan)। এই দীন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে- সেই কর্মসূচিও আল্লাহ দিয়েছেন যার সন্ধান পাওয়া যায় রসুল (সা.) এর বেশ কয়েকটি হাদিসে। তিনি সমগ্র জীবন এই কর্মসূচি অনুসারে সংগ্রাম করে গেছেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি তাঁর নিজ হাতে গড়ে তোলা উম্মাহর উপরে এই কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। তিনি বলেন- 'আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে- তওহীদের উপর ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য (আল্লাহ, রসুল ও আমিরের), হিজরত **(শেরক ও কুফর পরিত্যাগ) ও জেহাদ (তওহীদ প্রতিষ্ঠার, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা)**।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হল, সে নিশ্চয় তার গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলল- যদি না সে আবার তওবা করে ফিরে আসে এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করলো, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]। আমাদের কথা হচ্ছে, এই কর্মসূচির আলোকে সমগ্র জাতির মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্যের সমন্বয়ে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এখন এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা বা আকিদা (Misconception)। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সবার ধারণা এক রকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন রকম। রসুলাল্লাহর (সা.) অন্তর্ধানের এক শতাব্দী পর থেকে পরবর্তী শত শত বছর ধরে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমানদের মধ্যে হাজার হাজার তরিকা, দল, উপদল, ফেরকা, মাজহাব ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি, অতি বিশ্লেষণ, অপব্যাখ্যা ও নানা বিকৃত আমলের কারণে ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া ইসলামবিদ্বেষী অপশক্তি, পশ্চিমা ভাবধারার মিডিয়া ও ব্রিটিশ যুগের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে সমাজে ইসলাম সম্পর্কে রীতিমত এক প্রকার ভীতি (Islamophobia) সৃষ্টি হয়েছে। যার দরুন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু আমরা বলতে চাই- **আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো বিশাল, সহজ-সরল, বিজ্ঞানসম্মত, প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি যৌক্তিক জীবনব্যবস্থা হলো আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলাম যাকে ভ্রান্ত চর্চা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে আড়াল করে রাখা হয়েছে।** এত উত্তম একটি আদর্শ আমাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও আমরা অশান্তির আগুনে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। আমরা মনে করি আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে অবশ্যই সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ণ নিরাপত্তা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও শান্তি আসবেই। এ বইয়ে আমরা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। বিস্তারিত অন্যান্য বইপত্রে রয়েছে। আমরা মনে করি রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনায় জটিল দুর্বোধ্য শব্দজাল (Jargon) সৃষ্টির কোনো মানে নেই। রাষ্ট্র সবার, তাই এর সংস্কারের ধারণাগুলো সবার বোধগম্য ও স্বচ্ছ হতে হবে।

পঞ্চমত- ভারসাম্য নীতি (Balance Principle)। আল্লাহ তাঁর নাজিলকৃত জীবনব্যবস্থার নাম দিয়েছেন সেরাতুল মুস্তাকিম বা সহজ সরল পথ; অর্থাৎ যেটা বুঝতে সহজ, মানতে সহজ; যেটা জটিলতা, বক্রতা, কূটিলতা ও কৃত্রিমতা মুক্ত। এই দীনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced)। কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন, 'যে জাতি এই দীনকে অনুসরণ করবে তারাও হবে ভারসাম্যপূর্ণ জাতি।' (সুরা বাকারা ২:১৪৩)। **এই ভারসাম্য হচ্ছে- দেহ ও আত্মার, ইহকাল ও পরকালের, আইন ও তাসাওয়াফের, শরিয়াহ ও মারেফতের (আধ্যাত্মিকতা)।** মানুষ শুধু দেহ নয়, সে অন্যান্য প্রাণীর মত রক্ত-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় গঠিত প্রাণীমাত্র নয়। সে একদিকে যেমন সামাজিক জীব, অন্যদিকে সে

আধ্যাত্মিক জীবও বটে। কারণ তার একটি আত্মাও রয়েছে। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর রূহ মানুষের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন (সুরা হিজর ১৫:২৯)।

সুতরাং তার সংকট কেবল বস্তুগত বা জৈবিক নয়, তার আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সংকটও আছে। বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থায় এই আত্মিক সংকটের কোনো সমাধান নেই, কারণ সেখানে আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। তাই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোনো সমাজে যখন অতৃপ্ত, সংক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন ঐ সমাজে কোনোভাবেই আর শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় না। আর মানুষের সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি কেবল নশ্বর বস্তুর ভোগ থেকে অর্জিত হয় না। কীসে মানুষের তৃপ্তি হয়? ভোগবাদী সভ্যতা আমাদেরকে আরো বেশি পার্থিব ভোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে ধাবিত করছে বস্তুত তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য। একজন মানুষ যত অঢেল সম্পদের অধিকারী হয় ততই সে আরো ভোগের জন্য লালায়িত হয়। কোনো কিছুতেই তার সন্তুষ্টি মেলে না। এটা তার আধ্যাত্মিক সংকট। আবার কোনো কোনো মানুষ নিজের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে এতটাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে সে তার থেকে দুর্বল অবস্থানে থাকা সবাইকে তুচ্ছ করতে শুরু করে। হয়ে ওঠে অসহিষ্ণু, দুর্বিনীত, দাম্ভিক ও একদম একা। এটা তার আধ্যাত্মিক সংকট। আবার কোনো মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা পাচ্ছে না। এতে সে হতাশ হয়ে পড়ছে, যারা তার চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করছে তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হচ্ছে যা তাকে মানসিকভাবে অস্থিরতার মধ্যে রেখেছে। এটা তার আধ্যাত্মিক সংকট। অনেক সময় কিছু মানুষ এতটাই ক্রুদ্ধ ও অমানবিক হয়ে ওঠে যে তারা অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ বিকৃত বিনোদন লাভ করে (Sadist)। এজন্য তারা নির্দয়ভাবে পিটিয়ে মানুষ পর্যন্ত মেরে ফেলে, একে তারা বীরত্ব মনে করে। আইন-কানুন, নীতি নৈতিকতার কোনো তোয়াক্কা তারা করে না। আধুনিক ভাষায় একে বলে উত্তেজিত জনতার গণপিটুনি (Mob justice)। এটাও তাদের আধ্যাত্মিক অবনতির ফল। অর্থাৎ যে কোনোভাবেই হোক আইনকে ফাঁকি দিতে পারলেই, সে মানবেতর দুরাচারী জীবে পরিণত হয়, কোর'আন যাকে খান্নাস বলে অভিহিত করেছে (সুরা নাস ১১৪:৪)। একমাত্র আল্লাহর সিদ্ধান্তের ন্যায্যতার প্রতি আস্থা, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ ও নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল), আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা ও পরকালের শাস্তির প্রতি ভয়, তাকদির ও আল্লাহর দেওয়া রিজিকের প্রতি সন্তুষ্টিই পারে মানুষকে আত্মিক প্রশান্তি দিতে। কেননা সে জানে, ইহজগতে বঞ্চনা, হারানোর বেদনা, অপ্রাপ্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সবর এখতিয়ারের ফলে পরকালে তার সীমাহীন, অগণিত পুরস্কারের নিশ্চয়তা রয়েছে (সুরা যুমার

৩৯:১০)। ইসলামের জীবনদর্শন এভাবে মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত করে, তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করে, যা সমাজে অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তে দেয় না, যা সমাজে ভারসাম্য ও শান্তিরক্ষার নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। সুতরাং মানুষের জীবনব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যা দ্বারা তার বস্তুগত, জাগতিক জীবনের প্রয়োজন পূরণ হবে, আবার তার আধ্যাত্মিক সংকটেরও সমাধান হবে। এমন জীবনব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর দ্বারাই প্রণয়ন করা সম্ভব, মানুষের দ্বারা নয়।

তাছাড়া মানুষ কেবল ইহজাগতিক নয়। সে পরকালকেও বিশ্বাস করে। সেই পরকালীন মুক্তির জন্য মানুষ বিভিন্ন দিকে ছুটছে। তার পরকালীন সেই মুক্তির দিকনির্দেশনাও তার জীবনব্যবস্থায় থাকতে হবে। পরকালকে অস্বীকার করে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা রচিত হতে পারে না, যদি হয় তবে সেটা হবে ভারসাম্যহীন, জড়বাদী যেটা এখন দুনিয়াময় চলছে। এই জড়বাদী সভ্যতা মানুষের জীবনকে গতিময় করেছে, স্বচ্ছন্দ করেছে, ভোগবিলাসপূর্ণ করেছে কিন্তু একই সাথে তাকে ব্যক্তিগতভাবে অসুখী এবং সামষ্টিকভাবে পারমাণবিক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই আধ্যাত্মিকতা বা তাসাউফ মানে বর্তমানে বিভিন্ন খানকায় চালু বিকৃত সুফিবাদ নয়। ওটা অন্তর্মুখিতা, পলায়ন মনোবৃত্তি। মানুষের সকল বাস্তব সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে কেবল নিজের নফসের ঘষামাজা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের প্রচেষ্টা। আল্লাহর রসুল যে তাসাউফের শিক্ষা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে, সকল কর্মে, সকল অবস্থায় হৃদয়ে আত্মায় আল্লাহর উপস্থিতি গণ্য করা। আল্লাহর আদিষ্ট কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা (যেটা তাকওয়ায় পর্যবসিত হয়)। মানবসমাজে বিরাজিত সর্বরকম সংকট দূর করার জন্য প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া দীন, জীবনব্যবস্থা, সিস্টেমকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে প্রকৃত তাসাওয়াফের উদ্দেশ্য। ভারসাম্যের বিপরীত হচ্ছে বাড়াবাড়ি, কট্টরপন্থা, চরমপন্থা। ইসলামের নীতি হচ্ছে যে কোনো বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর দীনের বিষয়ে কঠিনতা, কঠোরতা আরোপ করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কোর'আনের বহু আয়াতে, রসুলাল্লাহর বহু হাদিসে এমন কি বিদায় হজের ভাষণেও তিনি তাঁর উম্মাহকে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ দীনের ব্যাপারে অপ্রাকৃতিক কঠোরতা আরোপ করা হলে মানুষ দীনের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে, যার পরিণামে এক পর্যায়ে দীনকে তারা এড়িয়ে চলবে। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'দীন সুসংহত, সুতরাং এর গভীরে কোমলভাবে প্রবেশ করো। আল্লাহর ইবাদতকে তাঁর বান্দাদের কাছে অপছন্দনীয় করে তুলো না। নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি যে তার বাহনকে অবিরাম হাঁকিয়ে

নিয়ে শ্রান্ত করে দেয়, অবশেষে না সে সফর করতে পারে, না সে বাহনকে অবশিষ্ট রাখে।' (আয়েশা রা. থেকে ইমাম বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খণ্ড.৩, পৃ. ৪০২)।

তিনি আরও বলেছেন- 'তোমরা দীনের বিষয়ে নিজেদের উপর কঠিনতা (তাশাদ্দুদ) আরোপ করো না। কারণ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের ওপর দীনকে কঠিন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অচিরেই তাদের অবশিষ্টাংশ তোমরা গির্জায় এবং মঠে পাবে' (ইমাম বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, খণ্ড.৩, পৃ. ৪০১; মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, খণ্ড.১, পৃ.৬২)।

রসুলাল্লাহ আরও বলেছেন- 'আমলের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। মধ্যম আমলই সর্বোত্তম আমল। আর আল্লাহর দীন কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির মাঝে অবস্থিত। এই দুটো বস্তুর (আমল ও জ্ঞান) মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর কল্যাণ কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। আর চলনের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট চলন হলো দ্রুতগতিতে চলা' (মাবাদ আল-জুহানী হতে ইমাম বায়হাকী, কানযুল উম্মাল, খণ্ড.১, পৃ.১২৩)। যেমন ব্যয় করার ক্ষেত্রেও মো'মেনরা হবে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন- 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী' (সুরা ফোরকান ২৫:৬৭)।

তাই আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরিয়াহ ও মারেফত এই উভয় ক্ষেত্রের ভারসাম্য যেমন রক্ষিত হবে, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরমপন্থার পরিবর্তে সহজ ও মধ্যপন্থাকে বেছে নেওয়া হবে।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

সার্বভৌম (স. সর্বভূমি+অ) থেকে এসেছে সার্বভৌমত্ব। এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বভূমির উপরে অবাধ কর্তৃত্ব ও সমুদয় ভূমির অধীশ্বর। নিরংকুশ আধিপত্য বোঝাতে সার্বভৌমত্ব শব্দটি সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যেমন জঁ বোডিন, জন অস্টিন, থমাস হবস, জন লক এবং জাঁ-জ্যাক রুশোর প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়টি দাঁড়ায় সেটা হল- সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Supreme power), যা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় (Not bound by any law); সার্বভৌমত্ব হলো নিরংকুশ কর্তৃত্ব (Absolute authority), অখণ্ড ক্ষমতা (Indivisible power); সার্বভৌমত্ব হলো শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে শাসন করার ক্ষমতা; সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের আইন বা আদেশের ওপর সর্বোচ্চ, অপরিসীম ক্ষমতা (Unlimited power) ও আইনের একক কর্তৃত্ব (Who is not subject to any legal limitations)। সুতরাং এই সংজ্ঞাগুলো মিলিয়ে নিলে বোঝা যায়, সার্বভৌম সত্তা হচ্ছে এমন এক কর্তৃপক্ষ যিনি সকল আইনের ঊর্ধ্বে, সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে, যিনি সর্বশক্তিমান। প্রকৃতপক্ষে রক্তমাংসের কোনো মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তাই এমন ক্ষমতার অধিকারী কোনো মরণশীল, পরমুখাপেক্ষী, ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ 'মানুষ' কখনোই হতে পারে না। এজন্য ইসলামে সার্বভৌমত্বের জায়গা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে, যিনি আদি ও অন্ত, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, যিনি সর্বজ্ঞানী ও সকল সত্তার ধারক। সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমায় 'ইলাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইলাহ শব্দের অর্থ তিনি সেই সত্তা, যার হুকুম মানতেই হবে (He who is to be obeyed)। এই কলেমাই ইসলামের ভিত্তি, এটাই আল্লাহর প্রতি ঈমান, এটাই তওহীদ, এটাই ইসলাম গ্রহণের শর্ত, এটাই সকল আমলের পূর্বশর্ত। সকল নবী-রসুল আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'আপনার পূর্বে আমি যে রসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই।

সুতরাং আমারই এবাদত (আনুগত্য) কর।' (সুরা আম্বিয়া ২১:২৫)। এখানে মনে রাখতে হবে, কোর'আন আরবি ভাষায় এসেছে বলে ইসলাম যেমন কেবল আরবের জন্য আগত জীবনব্যবস্থা নয়, তেমনি 'ইলাহ' শব্দটি আরবি শব্দ বলে এই তওহীদ কেবল মুসলমানদের বিষয় নয়। যেহেতু ইসলাম ধাপে ধাপে এসেছে, তাই পূর্ববর্তী নবী-রসুলদের অনুসারীরা কেউ খ্রিষ্টান, কেউ হিন্দু, কেউ ইহুদি, কেউ জৈন, কেউ পারসিক ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন। তাদের ধর্মেরও মূল ভিত্তি ছিল এই তওহীদ, একমাত্র স্রষ্টাকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে মেনে নেওয়া; যদিও সেই মূলমন্ত্রের ভাষা ছিল কখনও হিব্রু, সুমেরিয়, আভেস্তান, অ্যারামাইক, কখনো পালি বা সংস্কৃত ভাষা। সনাতন ধর্মের মূল মন্ত্র, একমেবাদ্বিতীয়াম (তিনি এক যার কোনো দ্বিতীয় বা শরিক নেই) এবং একমব্রহ্ম দ্বৈত্ব নাস্তি (একমাত্র ব্রহ্মাই সত্য, বাকি সবই মিথ্যা)- কথাগুলো তওহীদের ঘোষণারই প্রতিধ্বনি।

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ এমনটাই বলেছেন যে, 'তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সকল জ্ঞানের অধিকারী।' (সুরা ত্বাহা ২০:৯৮, সুরা মুমিনুন ২৩:১১৬, সুরা যুখরুফ ৪৩: ৮৪-৮৫)। এভাবে কোর'আনে বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কাজেই আরবিতে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যে মর্মকথা তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। এটা সার্বজনীন, সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্য।

কেন আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ (নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব) হিসাবে মানতে হবে, সেটারও যুক্তি তিনি বহু আয়াতে উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'যেহেতু তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাই কেবল তাঁরই হুকুম দেওয়ার অধিকার রয়েছে' (সুরা আরাফ ৭:৫৪)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'বলুন- হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী (মালিকুল মুলক)। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সুরা আল ইমরান ৩:২৬)। সুতরাং সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করেন। এখন মানুষের তৈরি যে বিধানাবলি দিয়ে দুনিয়া চলছে, সেখানে সার্বভৌমত্বের জায়গায় রয়েছে মানুষ। যেমন: গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রয়েছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার হাতে, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের সার্বভৌমত্ব রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের একদল প্রতিনিধির হাতে যাদের বলে পলিট ব্যুরো (Politburo), রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রয়েছে রাজার হাতে, এক নায়কতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রয়েছে একনায়কের হাতে। এ

সকল ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে থাকায় একটি পর্যায়ে সেই ক্ষমতাধর মানুষগুলো প্রায়শই স্বৈরাচার (Fascist) হয়ে ওঠে। এজন্য ইসলামের সার্বভৌম একমাত্র আল্লাহ। **এ কারণেই আল্লাহর রসুল ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদিনের কেউ অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেননি।** বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে ছক আকারে দেওয়া হল:

ব্যবস্থা (System)	**সার্বভৌমত্ব** (Sovereignty)
রাজতন্ত্র	রাজা, বাদশাহ, সম্রাট
গণতন্ত্র	জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ	জনসাধারণের একটি বিশেষ শ্রেণি
একনায়কতন্ত্র	এক নায়ক, ডিকটেটর (ফ্যাসিস্ট)
ইসলাম	আল্লাহ (স্রষ্টা)

এই বিন্যাসই এ কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস সম্ভব নয়। ওপরের যে কোনো একটাকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোনটি স্বীকার, গ্রহণ করে নিলে সে আর মুসলিম বা মো'মেন থাকতে পারে না। **কোনো লোক যদি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ বিশ্বাসী এবং জাতীয় জীবনে ওপরের যে কোনটায় বিশ্বাসী হয় তবে সে মোশরেক। এ অবস্থায় সে যতই নামাজ, রোজা করুক কিছুই আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।** এটি ইসলামের একটি বুনিয়াদি ধারণাও বটে, যে বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে ঘোষণা করেছেন, অন্য যে কোনো অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করলেও তিনি কোনোভাবেই শেরক ক্ষমা করবেন না। (সুরা নিসা ৪:৪৮, ১১৬)।

সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিমূল হিসাবে আমরা আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক হিসাবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলামের পরিভাষায় এটাই হচ্ছে তওহীদ। এটি আল্লাহর সাথে বান্দার এক প্রকার চুক্তি। আল্লাহ বহুবার বহুভাবে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, সেরাতুল মুস্তাকিমে অর্থাৎ তওহীদে যে অটল থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার পৃথিবী ভর্তি গুনাহও তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। এ ব্যাপারে বোখারি, মুসলিমসহ অসংখ্য হাদিস পেশ করা যায়। আল্লাহর নবী (সা.) বলেছেন- বান্দাদের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Contract) হচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, তাহলেই আল্লাহ তাদের কোনো শাস্তি দেবেন না (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) [মু'য়ায (রা.) থেকে বোখারি, মুসলিম]।

তিনি আরও বলেছেন- যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তার রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন [ওবাদাহ বিন সোয়ামেত (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বোখারী, মুসলিম] আল্লাহর রসুল আরও বলেছেন- জান্নাতের চাবি হচ্ছে তওহীদ [মু'য়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে আহমদ]। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই তওহীদ বর্তমানের ব্যক্তিজীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। **সহজ বাংলায় এর মূল কথা হচ্ছে, জীবনের যে কোনো অঙ্গনেই হোক, আল্লাহর কোনো বিধান যদি থাকে সেক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম গ্রহণ করা যাবে না**। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রস্তাবিত তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত সূত্র।

বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাঃ একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমানে 'বহুত্ববাদী রাষ্ট্র' এবং 'অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ' - এই ধারণাগুলো বিশ্বব্যাপী এক সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও নৈতিক আদর্শ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বহুত্ববাদ (Pluralism) মূলত একটি রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, যার মূল কথা হলো - রাষ্ট্র কেবল একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, সম্প্রদায় ও চিন্তাধারার মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

১৯শ শতকের শেষভাগে ও ২০শ শতকের সূচনালগ্নে এই তাত্ত্বিক কাঠামো আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রবেশ করে। তবে এর বাস্তব রূপান্তর ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, বিশেষত ১৯৪০ ও ১৯৫০-এর দশকে, যখন ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রের বিপরীতে পশ্চিমা বিশ্বে উদার গণতন্ত্র, মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

বহুত্ববাদের অন্যতম প্রবক্তা, ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Harold J. Laski রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেনঃ The state is only one of the many associations in society, and it should not have absolute sovereignty over other associations. অর্থাৎ- 'রাষ্ট্র হলো সমাজের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি মাত্র, এবং তার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকা উচিত নয়।'

লাস্কি মূলত এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামোর কথা বলেছেন, যেখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মতপ্রকাশ, বিশ্বাসচর্চা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত থাকবে। এই ধারণায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একাধিপত্যমূলক

নয়, বরং এটি হবে অংশগ্রহণমূলক, পরামর্শনির্ভর এবং বিভিন্ন চিন্তাধারার সহাবস্থানে পরিচালিত একটি সমন্বিত কাঠামো।

এখন প্রশ্ন আসে ইসলামের সঙ্গে এই বহুত্ববাদী রাষ্ট্রচিন্তার সম্পর্ক কী? আসলে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও বহুত্ববাদের ভিত্তি পরস্পরবিরোধী নয়। বরং ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক, পরামর্শনির্ভর ও মানবতার কল্যাণে নিবেদিত রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে। কোর'আনে বলা হয়েছে: 'তুমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো।' (সুরা ইমরান ৩:১৫৯)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, চিন্তাধারা, পেশা, নৃগোষ্ঠী এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, জান-মালের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। এর ঐতিহাসিক দলিল হচ্ছে মদিনা সনদ। মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের সকল মানুষের মানবাধিকারের স্বীকৃত দিয়েছিল এই সনদ এবং রসুল (সা.) তা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেই সমাজব্যবস্থাকে বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজের মূল ধারণার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তবে ইসলাম এখানে একটি সীমারেখা আরোপ করেছে। সেটা হলো, যে বিষয়ে আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে, সে বিষয়ে অপর কারো ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর মতামতের বিপরীতে যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করে নেওয়াকে ইসলামের পরিভাষায় শিরক বলা হয়। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে অন্যের অংশীদারত্ব স্থাপন করাই শিরক। কেননা চূড়ান্ত কর্তৃত্ব (Sovereignty) যদি একাধিক মানুষের বা গোষ্ঠীর হাতে থাকে, তবে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য সহজেই বিশৃঙ্খলায় রূপ নিতে পারে। অধিকন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতেও ভুল ও অকল্যাণকর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যেতে পারে। তাই যে বিষয়ে কোর'আনে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে, তা তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অলঙ্ঘনীয় (Non-negotiable) ও অবধারিত (Uncompromisable) হিসেবে গণ্য হবে এবং তা পালন করা সকলের ওপর ফরজ হবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে বহুত্ববাদ ও ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে একটি সমন্বয় সম্ভব। তবে বহুত্ববাদের নামে বহু গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্ব বা সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা ইসলামে শিরক যা তওহীদের ধারণা সরাসরি বিপরীত। তওহীদ হচ্ছে একত্ববাদ। তবে যদি কোনো সমাজে বহুমতের মানুষের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হয়, এবং তা আল্লাহর বিধানের বিরোধী না হয়, তবে তা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়।

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রঃ কী কেন কীভাবে

(Modern State on Tawheed: Vision and Strategy)

ইসলাম এসেছে সালাম শব্দ থেকে যার আক্ষরিক অর্থ শান্তি। আর রাষ্ট্র শব্দটির বুৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত ধাতু 'রাজ' থেকে যার অর্থ রাজ্য। যে ভূখণ্ডে বা রাজ্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ও রসুলাল্লাহ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি, রীতিনীতি (সুন্নাহ) অনুসরণের মাধ্যমে মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনে সুখ শান্তি ন্যায়বিচার, মানবতা, মানবাধিকার, সাম্য, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই হল ইসলামি রাষ্ট্র। এখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সাম্য ও ন্যায়বিচার লাভ করবে। এখানে মানবজাতির বৈচিত্র্যময়তাকে (Cultural diversity) পুরোপুরি স্বীকার করা হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক-আশাক, সংস্কৃতি, ভাষা, রুচি, খাদ্যাভ্যাস ও বিশ্বাস নিয়ে কোনো জবরদস্তি বাড়াবাড়ি কোনোভাবেই করা চলবে না। প্রশ্ন আসতে পারে ইদানীং যে দেশগুলোতে শরিয়াহ আইন চালু আছে বা হয়েছিল সেগুলোর সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবিত 'তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের' পার্থক্য কী?

ম্যাক্স ওয়েবারসহ (১৮৬৪-১৯২০) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেক, রাষ্ট্র হলো এমন একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক সত্তা, যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং যা বৈধভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার রাখে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম শর্ত। আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সঙ্গে ইসলামের রাষ্ট্রচিন্তা অনেকটাই আলাদা। ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন জীবনাদর্শ যা আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য দান করেছেন। তাই ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে একটি জাতিরূপে দেখতে চায় এবং সমগ্র পৃথিবীকে অভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। **ইসলাম পৃথিবীজুড়ে দুইশটি পৃথক পৃথক দেশের বদলে একটি বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা দেয়, যে বিশ্বরাষ্ট্রের বিধাতা (সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক) হবেন আল্লাহ, নেতা (ইমাম) হবেন একজন, মানবজাতি হবে একজাতি, সরকার হবে একটি, জীবনব্যবস্থা হবে ইসলাম, মূলনীতি ও পথনির্দেশ হবে আল্লাহর কোর'আন।**

ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফল হবে শান্তি আর ফল দেখেই বোঝা যাবে যে এই ব্যবস্থা আসল বা আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলাম কিনা। শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা মানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানে শান্তি প্রতিষ্ঠা। শরিয়াহ প্রতিষ্ঠাকেই

আজকাল ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, অথচ যে সব অঞ্চলে এই কথিত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোথাও শান্তি আসেনি। বরং সেসব দেশ সকল দিক থেকে আরো পিছিয়ে পড়েছে। সেখানে যুগের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এক হাজার বছর আগের কেতাব দেখে দেখে অন্ধত্ব ও গোড়ামির চর্চা করা হচ্ছে, যা দেখে বিশ্বের অপরাপর জাতি ইসলামের কথা শুনলেই আতঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করছে। তাদের আচরিত ব্যবস্থা প্রকৃত ইসলাম হলে ফল হতো ঠিক এর উল্টো। সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে তাদের উন্নতি আর প্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকত। সুতরাং ফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে- এটা আমগাছ বলে প্রচারিত হলেও আসলে এটা মাকাল বৃক্ষ। রসুলাল্লাহ ও তাঁর জাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রকৃত ইসলাম। সেই ইসলাম মেনে নেওয়ার ফল কী হয়েছিল তা ইতিহাস। জীবনের সবগুলো ক্ষেত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছিল, সকল মাপকাঠিতে মুসলিমরা আরোহণ করেছিল এমন এক উচ্চতায় যেখানে এ পর্যন্ত আর কোনো জাতিগোষ্ঠী যেতে পারেনি। মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সভ্যতাকে কেবল একটি রাষ্ট্র হিসাবে কোনোভাবেই সংজ্ঞায়িত করা চলে না। ইসলাম এমন একটি জীবনদর্শন যা অবলম্বন করলে যে কোনো মানবগোষ্ঠী উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছবে, তাই একটি কল্পনাপ্রসূত সীমারেখা বা কাঁটাতারের সীমানায় বন্দী একটি ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠীকে 'স্বাধীন' আখ্যা দিয়ে কেবল সেখানে ইসলামের চর্চা করার অর্থ বাকি মানবজাতিকে স্রষ্টার করুণা থেকে বঞ্চিত করা। এক জায়গায় মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে সুখে শান্তিতে থাকবে আর বাকি পৃথিবীতে মানুষ অন্যায় অবিচারের মধ্যে থাকবে তা হতে পারে না। তাই ইসলামিক রাষ্ট্র বলতে সেই এলাকাকে বোঝায় যেখানে স্বাধীনভাবে আল্লাহর হুকুম, বিধান তথা দীন কার্যকর করা যাবে। ফিকাহর ভাষায় একে বলে দারুল ইসলাম। দারুল ইসলাম একটি সম্প্রসারণশীল আদর্শিক রাষ্ট্র (An Expanding Ideological State)। এর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদের ঠিক বিপরীত। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য লুণ্ঠন, অন্যের সম্পদ জবরদখল করা। আর ইসলামের উদ্দেশ্য নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে বিশ্ব থেকে যাবতীয় অপশাসন, অন্যায় অবিচার দূর করে মানবাধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী এটা করতে পেরেছিল বলেই ১৪০০ বছর পরেও পৃথিবীতে ২০০ কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে বহু সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়ক ও জাতির ইতিহাস মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। কারণ তারা কোনো সভ্যতা ও আদর্শ মানবজাতিকে উপহার দিয়ে যেতে পারেনি। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ড সামরিক শক্তিবলে দখল করে সেখানে উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে

সেসব দেশের সম্পদ লুটপাট করে নিজেদের দেশে নিয়ে জমা করেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা যে দেশগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানেই তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাস করেছেন, অন্য কোথাও সে দেশের সম্পদ পাচার করেননি। আমৃত্যু তারা সেখানে বাস করে লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, শোষিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন, সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছেন এবং নিজেদের অস্থিমজ্জা সে দেশের মাটিতেই বিলীন করেছেন। স্থানীয় জনগণ তাদেরকে আপন করে নিয়েছিল বলেই শত শত বছর ধরে তারা শাসনক্ষমতায় টিকে ছিলেন।

আদর্শচ্যুতি, অন্তর্কলহ ও আকিদার অবক্ষয় নিয়ে হলেও আব্বাসীয় খেলাফত (৭৫০-১২৫৮), মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭), অটোমান সাম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২৩) ইত্যাদি যুগে মুসলিম শাসকদের অধীনে সম্মিলিতভাবে শাসিত হয়েছে তদানীন্তন আবিষ্কৃত পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি এলাকা। ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এর চেয়ে বড় কোনো সভ্যতা মানব ইতিহাসে আর কখনও ছিল না। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল মদিনার ছোট্ট একটি ভূখণ্ড যার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৫ কিলোমিটার আর প্রস্থ ৪ কিলোমিটার। অর্থাৎ মদিনার (ইয়াসরিব) আয়তন ছিল মাত্র ২০ বর্গকিলোমিটার। এখান থেকেই উন্মেষ ঘটে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মহান সভ্যতার যা পরবর্তী ১ হাজার বছর ধরে বিকশিত হয়ে অর্ধ-পৃথিবীতে শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করে। **সুতরাং যে কোনো আদর্শভিত্তিক সভ্যতার বিস্তারের জন্য একটি প্রাথমিক ভূখণ্ড বা সূচনা ভূমি** (Initial Territory/ Birthplace of Civilization) **থাকা অনিবার্য। ইসলামের সূচনাপর্বে সেটি ছিল মদিনাতুন্নবী। বাংলাদেশকে আমরা এ যুগের নিরীখে সেই প্রাথমিক ভূখণ্ড হিসাবে কল্পনা করতে পারি।**

এখন আমরা কয়েকজন বিখ্যাত মুসলিম মনীষীর দৃষ্টিতে ইসলামি রাষ্ট্রের স্বরূপ জানার চেষ্টা করব।

০১. **ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমাতে রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন, যার মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং শাসকগণ ইসলামের নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য সামাজিক সংহতি এবং শক্তি প্রয়োজন।

০২. **আল-ফারাবী (৮৭৩-৯৩৭)** তাঁর গ্রন্থ আল-মাদিনাত আল-ফাদিলাতে (The Virtuous City) একটি আদর্শ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন।

রাষ্ট্রের নেতা (খলিফা/ইমাম) একজন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ এবং গুণাবলীতে পূর্ণ ব্যক্তি হওয়া উচিত।

০৩. **ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮)** বলেছেন, ইসলামী শাসনব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয় বরং তা ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। শাসকের দায়িত্ব হলো সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা। সুতরাং, রাষ্ট্রকে তিনি এমন একটি কাঠামো হিসেবে দেখেছেন যা আল্লাহর আইন ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

০৪. **মওলানা আবুল আলা মওদুদীর (১৯০৩-১৯৭৯)** মতে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে আল্লাহর আইন (শরিয়া) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণ ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে শাসিত হয়। তিনি বলেন, **'রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য।'** মওদুদী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিসেবে মানবতার কল্যাণের পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।

০৫. **হাসানুল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯)** ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখতেন, যেখানে রাষ্ট্রের সব দিক আল্লাহর শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তার মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসককে ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার যোগ্য হতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্র কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করবে।

০৬. **মোহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯২)** তাঁর 'ইসলাম ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' বইয়ের শুরুতে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেন, একটি রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামি রাষ্ট্র বলা যায়, যখন ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং দেশের মৌলিক শাসন ও সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (অনুবাদ শাহেদ আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

এখানে বিগত বারোশো বছরে পৃথিবীতে আগত ছয়জন বিশিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। তাদের রাষ্ট্রচিন্তায় একটি সাধারণ বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল, তারা কেউই ইসলামী রাষ্ট্রের শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উল্লেখ করেননি; যদিও আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে আল্লাহর আইন বা শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চলে এবং যে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ এবং শান্তি নিশ্চিত করা। এর তাৎপর্য

হলো, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ যা মানুষকে শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। শান্তিপূর্ণ জীবন কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষের একক অধিকার হতে পারে না, তাই ইসলামকেও ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। **একে সমগ্র পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সু-সংহত জাতিশক্তি বা বাহিনী লাগবে যার কথা ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন।** সেই শক্তিশালী জাতিসত্তা গঠনের রূপরেখা আমরা আমাদের রাষ্ট্রসংস্কার প্রস্তাবনার ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যঃ দুটি ঘটনা
(The Purpose of the Tawheed-Based Modern State: Two Incidents)

ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য রসুলাল্লাহর (সা.) জীবনের অজস্র ঘটনা থেকে দুটো ঘটনা উল্লেখ করছি। একটি ঘটনা ইসলামের একদম প্রাথমিক যুগের আরেকটি একেবারে তাঁর জীবনের শেষ দিকের।

প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে এমনঃ একদিন আল্লাহর রসুল (সা.) কা'বা শরীফের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। সময়টা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণের (রা.) ওপর প্রচণ্ড বাধা এবং অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন চলছিল। এমন সময় একজন সাহাবা, খাব্বাব (রা.) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসুল! এই অত্যাচার নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমাদের বিরোধীরা সব যেন ধ্বংস হয়ে যায়।' কথাটাকে আল্লাহর রসুল যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ঐ সাহাবাকে বললেন, 'তুমি কী বললে?'

'ইয়া রসুলাল্লাহ! এত নির্যাতন নিপীড়ন আর সহ্য হচ্ছে না। আপনি বরং ওদের ধ্বংস হবার দোয়া করে দিন।' - খাব্বাব (রা.) তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু আল্লাহর রসুল খাব্বারের অনুরোধ শুনে ধ্বংসের দোয়া করলেন না। তিনি বললেন, 'শোন, শীঘ্রই সময় আসছে যখন কোনো যুবতী মেয়ে গায়ে গহনা পরে একা সা'না থেকে হাদরামাউত যাবে। তার মনে এক আল্লাহ এবং বন্য জন্তু ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না।' [খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারী ও মেশকাত]।

এই হাদীসটি থেকেই আমরা ইসলামের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে জানতে পারি। প্রথমত, আল্লাহর রসুল উদাহরণস্বরূপ বললেন- মেয়ে লোক, কোনো পুরুষের কথা বললেন না। কারণ নারীদের প্রাণ ও সম্পদ ছাড়াও আরও একটি জিনিস হারাবার সম্ভাবনা আছে যা পুরুষের নেই। সেটা হল ইজ্জত, সতীত্ব, সম্ভ্রম। দ্বিতীয়ত, ঐ নারী বয়সে যুবতী। অর্থাৎ লোভাতুরদের কাছে আরও লোভনীয়। তৃতীয়ত, অলঙ্কার গহনা পরিহিত, চোর ডাকাতের জন্য লোভনীয়।

এতগুলো লোভনীয় বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রসুল বলছেন, অনুরূপ একটি অলঙ্কার পরিহিত যুবতী নারী একা সা'না শহর থেকে প্রায় সাড়ে ছয়শো

কিলোমিটার দূরবর্তী হাদরামাউতে যেতে পারবে, যা অন্তত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, এত দীর্ঘ পথে তার ধনসম্পদ বা ইজ্জত হারানোর কোনো আশঙ্কা থাকবে না। সেই নারী কোন ধর্মের বা গোত্রের তারও উল্লেখ রসুল করেননি। অর্থাৎ, সব ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের নারীর জন্যই এই অভাবনীয় নিরাপত্তাটি কায়েম হবে।

কাজেই ইসলামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটবে না, কোনো ভয়ভীতি, আতঙ্ক থাকবে না, নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না। ইতিহাস সাক্ষী রসুলাল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। বাস্তবেই তেমন একটি শান্তিময় ও নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (আদি ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বোখারি, হাদিস নং ৩৫৯৫)। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেনদেরকে এমন একটি সমাজেরই ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেছেন, সেখানে তিনি মো'মেনদেরকে শাসনকর্তৃত্ব (খেলাফত) দান করবেন, সেখানে আল্লাহর পছন্দের জীবনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা (আমান) দান করবেন। (সুরা নুর ২৪:৫৫)।

দ্বিতীয় ঘটনা: অষ্টম হিজরীর মক্কা বিজয়ের দিন। আজ আল্লাহর রসুল মক্কার সর্বেসর্বা, এমন কেউ নেই তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায়। সেদিন তিনি বেলালকে (রা.) বললেন কাবার ছাদে উঠে আযান দিতে। ইতিহাস বলে- সেদিন বেলালের (রা.) ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো কাপড় ছিল না, মাথায় পাগড়ির তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু লজ্জাস্থান ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড় কোমরে প্যাঁচানো ছিল। সেই অর্ধ-উলঙ্গ বেলালকে (রা.) আল্লাহর রসুল কাবার ছাদে উঠিয়ে দিলেন (আসহাবে রসুলের জীবনকথা-১ম খণ্ড)। তারপর বেলাল (রা.) উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আযান দিলেন। হাজার হাজার সাহাবী তখন বাধভাঙা আবেগে আপ্লুত। সেদিন মহাপবিত্র বায়তুল্লাহর উপরে দণ্ডায়মান কোরায়েশদের ক্রীতদাস বেলাল (রা.), নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি বেলাল (রা.)।

আল্লাহর রসুল অন্য কোনো উঁচু স্থানে তাঁকে ওঠাতে পারতেন, অন্য কোনো সম্মানিত কোরায়েশ সাহাবিকে ওঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি কাবার ছাদে উঠালেন হাবশি ক্রীতদাস বেলালকে (রা.)। এর দ্বারা তিনি মানবজাতির জন্য একটি শিক্ষা রেখে যেতে চেয়েছেন যে, মো'মেনের সম্মান আল্লাহর কাছে কাবারও ঊর্ধ্বে, যদিও বা সেই মো'মেন সমাজের সবচাইতে দুর্বল মানুষটি হয়, সবচাইতে অবহেলিত নির্যাতিত অবজ্ঞাত উপেক্ষিত মানুষটি হয়, এমনকি কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হয়। প্রকৃতপক্ষে জাত্যাভিমানে অন্ধ কোরায়েশদের গালে এই ঘটনা ছিল এক সজোর চপেটাঘাত। এ ঘটনার দ্বারা তিনি প্রমাণ করে দিলেন, ইসলামে

মানুষের মর্যাদা তার বংশগৌরব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাপকাঠিতে নির্ধারিত হবে না, নির্ধারিত হবে তার চরিত্র দিয়ে, তার কর্ম দিয়ে।

এই দুটি ঘটনা থেকে আমরা ইসলাম আগমনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য জানতে পারি। সেটি হলো, শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস উল্লেখ করা যায়, সেটি হলো- 'রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন- ইসলাম একটি ঘর, সালাত (নামাজ) তার খুঁটি এবং জেহাদ হলো ছাদ [হাদিস- মুয়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]।' এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) ইসলামকে ঘরের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ ঘর যেমন মানুষকে প্রতিকূল আবহাওয়া, চোর ডাকাত বা জীব জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করে, তেমনি ইসলামও একটি ঘরের মত মানবজাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেবে। অর্থাৎ ইসলামের উদ্দেশ্য এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মানুষ তার জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা পাবে, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার থাকবে না, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনা থাকবে না। সমস্ত রকম অন্যায়-অপরাধ থেকেই মুক্তি পাবে মানবজাতি। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা যে অসম্ভব নয় সেটিও আল্লাহর রসুল তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রমাণ করে গেছেন। আজও যদি মানবজাতি আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন গ্রহণ করে নেয় তাহলে সন্দেহ নেই যে, এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে অচিরেই সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের কালিমা মুছে যাবে, সমগ্র পৃথিবী আবৃত হবে ন্যায়, সাম্য, মানবাধিকার ও নিরাপত্তার চাদরে। সেখানে বেলালের (রা.) মত নিপীড়িত মানুষেরাও মর্যাদা পাবে। একা একটি মেয়ে মানুষ শত শত মাইল পথ নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করবে।

◇◇

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব (খেলাফত) দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন।

সুরা নূর ২৪:৫৫

◇◇

অন্য মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
(Attitude Towards Another Individual)

একজন মানুষ সম্পর্কে অপর একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটাই তাদের পারস্পরিক আচরণ নির্ধারণ করে। আমাদের প্রস্তাবিত সভ্যতায় এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে:

» আমি যে রকম একজন মাটির তৈরি মানুষ, তেমনি সেও আমার মতো আরেকজন মাটির তৈরি মানুষ। আমাদের উভয়েরই প্রভু একজন- আল্লাহ/স্রষ্টা। আমরা উভয়ই তাঁর বান্দা।

» আমরা সকলেই এক পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান, কাজেই আমরা এক পরিবার। আমরা ভাই-বোন। কাজেই অন্যের সাথে আমার আচরণ হবে নিজ পরিবারের মতোই।

» আমার ভিতরে যেমন আল্লাহর রুহ (আত্মা) আছে, তেমনি তার ভিতরেও আল্লাহর রুহ আছে।

» এই বিশ্বের আলো, পানি, মাটি, বাতাসের উপর আমার যেমন অধিকার আছে, তারও তেমন অধিকার আছে। আমরা উভয়ই বিশ্বনাগরিক হিসাবে সমান, আমরা একই জাতি।

» আমি যেমন আল্লাহর খলিফা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছি, সেও তেমনি আল্লাহর খলিফা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সে আর আমি সম-মর্যাদার অধিকারী।

» আমার যেমন বাক-স্বাধীনতা ও জীবন ধারণের অধিকার, নিজ ধর্মবিশ্বাস লালন ও প্রচারের অধিকার রয়েছে, তেমনি তারও সমপরিমাণ অধিকার রয়েছে। তাই আমি তার আল্লাহ প্রদত্ত কোনো অধিকার হরণ করতে পারি না।

এই বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিগুলো স্মরণে রেখে আল্লাহ ও তাঁর রসুল মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি (আকিদা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকি।' (সুরা হুজরাত ৪৯:১৩, সুরা নিসা ৪:১)।

বিদায় হজ্বের ভাষণে আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'আজকের এই দিন ও এই মাস যেমন পবিত্র; তোমাদের জান-মাল কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র।

হে লোকসকল! জেনে রেখো, তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রেখো, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবের ওপরও অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩৪৮৯)

কাজেই মানুষের মধ্যে বিভাজন হবে মাত্র দুই প্রকার - মো'মেন ও কাফের অর্থাৎ সত্যের অনুসারী ও মিথ্যার অনুগামী। (সুরা তাগাবুন ৬৪:২)।

◇◇

'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। অতএব আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি যে তার সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ করে।'

হাদিসঃ বায়হাকি, মেশকাত

◇◇

মৌলিক অধিকার

(Fundamental Rights)

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে সেগুলো জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' (Universal Declaration of Human Rights) এর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একইসঙ্গে, এই অধিকারগুলো আল-কোর'আন এবং রসুলাল্লাহর (সা.) কর্মপদ্ধতির (সুন্নাহ) সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমনঃ আইনের সুরক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার, জীবনধারণের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জানমালের নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার, ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন ভোগ ও হস্তান্তরের স্বাধীনতা, বৈধ পেশা, বাণিজ্য ও কর্মের অধিকার, শিশুদের সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকার, যে কোনো বল প্রয়োগ থেকে সুরক্ষার অধিকার, জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায় থেকে রক্ষার অধিকার, এক অপরাধে একাধিক শাস্তি না পাওয়া, একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি না দেওয়া, চলাফেরা, ভ্রমণ ও বসবাসের অধিকার, শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে আদালতে আবেদন করার অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার ইসলাম যেমন দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে জাতিসংঘ ও আমাদের জাতীয় সংবিধান।

তবে, এই মৌলিক অধিকারগুলোকে জনস্বার্থ ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে আইনি বিধিনিষেধের মাধ্যমে কার্যত খর্ব, নিয়ন্ত্রিত এবং কিছু ক্ষেত্রে হরণ করা হয়েছে। এর ফলে বাস্তবে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এসব অধিকারের গরু কেতাবে থাকলেও গোয়ালে নেই। এই পরিস্থিতির কারণে স্বাধীনতার পর থেকেই বহুবার বিপ্লব ও পাল্টা বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও সংঘাত ঘটেছে; যা কখনও ভোটের অধিকার, কখনও কোটার অধিকার এবং কখনও অন্যান্য দাবির জন্য হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়নি এবং মানুষ তার মৌলিক অধিকারগুলো পায় নি। কিন্তু আমরা যে জীবনব্যবস্থার প্রস্তাব করছি সেখানে এই অধিকার ও স্বাধীনতাগুলো পূর্ণরূপে বলবৎ থাকবে। কোনো অজুহাত তৈরি করে, শর্ত আরোপ করে কারো মৌলিক অধিকার হরণ করা হবে না।

রাষ্ট্র কাঠামো (Organogram of the State)

আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেওয়া, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিমূলক, তাকওয়াভিত্তিক তথা আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়-অন্যায়ভিত্তিক একটি শাসনব্যবস্থা গঠন করতে হবে। আল্লাহ বলেছেন, 'হে মো'মেনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসুলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তার যিনি তোমাদের আদেশদাতা (উলিল আমর)।' (সুরা নিসা ৪:৫৯)। এই আদেশদাতা হলেন জাতির ইমাম ও তাঁর দ্বারা অনুমোদিত চেইন অব কমান্ডে থাকা বিভিন্ন স্তরের আমিরগণ। ইমাম শব্দের অর্থ নেতা আর আমির শব্দের অর্থ আদেশদাতা। ইমাম হলেন ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদ (Head of State)। এই পদটিকে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি বলা হয়; যদিও কোনো কোনো দেশে প্রেসিডেন্টের পদ আলঙ্কারিক, মূল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু **আমাদের প্রস্তাবিত শাসনব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক হবেন ইমাম, তাকে প্রেসিডেন্টও বলা যেতে পারে। তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।** তার কাছে ধর্ম-বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ সবাই সমান। তিনি স্বজনপ্রীতি করবেন না। রাগ-অনুরাগের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করবেন না। তিনি বিশ্বাসীদের নেতা হিসাবে একাধারে তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রের নেতৃত্ব দিবেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। দায়বদ্ধতার এই বোধ তাঁকে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

ইমামের পরের পদমর্যাদায় থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি ইমামের সকল কাজে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। তার অধীনে থাকবে আইনসভা (শুরা পরিষদ) ও মন্ত্রিসভা।

শুরা পরিষদ (আইনসভা):

» আইন সভার সদস্যরা সচেতন নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হবেন। তাদেরকে আমির অথবা সভাপতি বলা হবে।

» শুরা পরিষদের নেতৃত্বে থাকবেন একজন আমিরে শুরা বা স্পিকার, যিনি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃত মনোনীত হবেন।

শুরা সদস্যদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হবে যারা প্রত্যেকেই হবেন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ তাদের আদেশদানের ক্ষমতা থাকবে। তারা চেইন অব কমান্ড হিসাবে ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধান) সঙ্গে প্রান্তিক নাগরিকের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবেন। যেমন:

» বিভাগীয় আমির
» জেলা আমির
» উপজেলা আমির
» ইউনিয়ন আমির
» গ্রাম আমির
» শহরের জন্য: সিটি আমির, পৌরসভা আমির, ওয়ার্ড আমির

মন্ত্রিসভা

» মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী, যিনি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
» প্রতিটি মন্ত্রণালয় একজন করে মুখ্য সচিবের অধীনে পরিচালিত হবে। বিভাগ, জেলাসহ অন্যান্য স্থানীয় দপ্তরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নির্দেশনা প্রদান এবং রিপোর্ট গ্রহণ এই মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে থাকবে। তবে স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরগুলো (Civil Services) পরিচালিত হবে স্থানীয় শুরা সদস্য (আমির)-এর অধীনে। **এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বর্তমানের মত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের মধ্যে কোনো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হবে না।**

রাষ্ট্রের কাঠামো:

» রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম)
» উপ-রাষ্ট্রপ্রধান
» আমিরে শুরা/স্পিকার (শুরা পরিষদ প্রধান)
» প্রধানমন্ত্রী (মন্ত্রিসভার প্রধান)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

» রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম) নাগরিকদের সম্মতিক্রমে তাদের বায়াতপ্রাপ্ত (Promise of Obedience) হয়েই রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন। যতদিন তিনি আল্লাহর বিধান মোতাবেক, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে শাসন করবেন ততদিন তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে যদি তিনি স্পষ্টত আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেন, যদি তিনি দুর্নীতি, প্রতারণা, ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজ স্বার্থে কাজ করেন তাহলে শুরা সদস্যদের মাধ্যমে তার অভিশংসন করার সুযোগ থাকবে।
» উপ-রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের পরবর্তী সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদ।

» আমিরে শুরা (স্পিকার) এবং প্রধানমন্ত্রী সম-মর্যাদার দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, যারা উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে তাদের নিজ নিজ বিভাগের নেতৃত্ব দেবেন। তবে কোনো স্থানে আমিরে শুরা ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ে উপস্থিত থাকলে আমিরে শুরা প্রাধান্য পাবেন।

» জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের স্বার্থে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকবে।

» সমস্ত অর্থনৈতিক বরাদ্দ রাষ্ট্রপ্রধানের দপ্তর থেকে অনুমোদিত হতে হবে এবং মন্ত্রণালয়গুলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারবে না।

» কোনো বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ বা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আগে রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই শুরা পরিষদে বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধান এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখবেন। তবে, এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ ও ব্যাখ্যা তিনি পরে শুরা পরিষদে উপস্থাপন করবেন এবং পরিষদের অনুমোদন নিশ্চিত করবেন।

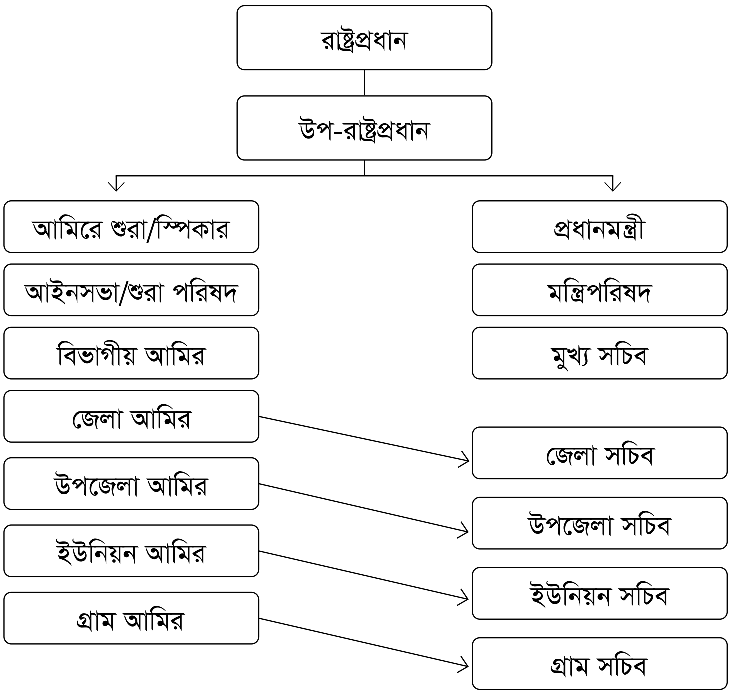

প্রস্তাবিত তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের সরল সংগঠনচিত্র (Organogram)

রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্ষমতার ধারাবাহিকতা
(Head of State and Chain of Command)

পরিবার থেকে সরকার যে কোনো সংগঠনের একজন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ থাকতেই হবে। যে কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে সবাইকে মেনে নিতে হবে। একে বলা হয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ (Supreme Authority)। ইসলামে এই কর্তৃপক্ষকে বলা হয় 'ইমাম' বা নেতা। অর্থগত দিক থেকে যে কোনো নেতাকেই ইমাম বলা যায়, কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় উম্মাহর যিনি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁর পদের নাম হচ্ছে- ইমাম। এটা আরবি শব্দ। ইমামকে ইংরেজিতে প্রেসিডেন্ট ও বাংলায় রাষ্ট্রপতি বলা যেতে পারে। জাতির প্রধানকে বোঝাতে আরবিতে খলিফাতুল মুসলিমিন ও আমিরুল মো'মেনিন শব্দ দুটিও বহুল প্রচলিত। নবী করিম (সা.) এর পরে সাহাবিরা মহান খলিফাদেরকে এ ধরনের উপাধিতে সম্বোধন করতেন। সকল নবী-রসুলগণও তাঁদের স্ব স্ব উম্মাহর ইমাম ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

০১. স্মরণ কর, যেদিন (হাশরের দিন) আমি প্রত্যেক কওমকে তাদের নেতাসহ (ইমাম) আহ্বান করব। (বনী ইসরাইল ৭১)।

০২. যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম করব...। (সুরা বাকারা ২:১২৪)।

০৩. তারা দৃঢ় ছিল বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত (সুরা সেজদাহ ৩২:২৪)।

এই আয়াতগুলোতে একজন নেতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ (Conformed to Natural Law)। নেতা ছাড়া কখনোই দুজন ব্যক্তির মধ্যেও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের কাঙ্ক্ষিত জাতি ও রাষ্ট্রকাঠামোর মডেল হচ্ছে সালাত বা নামাজ। যদি দুজন ব্যক্তিও জামাতে নামাজ পড়েন তাহলে তাদের একজনকে ইমামতি করতে হয়। এমনকি লক্ষ মানুষের জামাতেও একজন ব্যক্তিকেই ইমাম মানতে হয় এবং তাঁর প্রতিটি তাকবিরের সাথে সাথে রুকু সিজদার মাধ্যমে আনুগত্য করতে হয়। নামাজের নিয়তের সময়ই 'ইকতাদাইতু বিহাজাল ইমাম' বলে নামাজের যিনি ইমাম তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা দিতে হয়। মুসল্লিরা যদি কাউকে

ইমাম হিসাবে না মানে, তাহলে কেউ জোর করে তাদের ইমামতি করতে পারে না, করলে সেটা শরিয়তে নিষিদ্ধ। নামাজের উদ্দেশ্য কেবল দোয়া বা প্রার্থনা করা নয়, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল জাতিকে ইমামের নিঃশর্ত আনুগত্যের চর্চা করানো। মুসল্লিদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তাদের বাস্তব জীবনেও এই মডেল অনুসরণ করতে হবে। নামাজে যেমন 'সেজদা' করছে বাস্তব জীবনেও আল্লাহর আনুগত্য (সেজদা) করতে হবে, নামাজে যেমন ইমামের আনুগত্য করা হয়, তেমনিভাবে বাস্তব জীবনেও জাতির ইমামের দিকনির্দেশনায় জনগণ জীবন পরিচালনা করবে, প্রতিটি বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করবে। এই আনুগত্যের শপথকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয়- বায়াত (Promise of Obedience)। **ইমামের বায়াত নেওয়া অর্থাৎ চেইন অব কমান্ডের মধ্যে থাকা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য হবে অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজ)**। রসুলাল্লাহ এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'যে ব্যক্তি ইমামের প্রতি আনুগত্যের শপথ ছাড়া (বায়াতহীন) মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।' (সহিহ মুসলিম- ১৮৫১)।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর সর্বোচ্চ পদে থাকবেন ইমাম (রাষ্ট্রপতি)। তিনি জাতির ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ও জাতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। এজন্য তিনি রাজতন্ত্রের রাজাদের মত বা একনায়কতন্ত্রের শাসকের মতো স্বৈরাচারী ও আইনের উৎস হয়ে উঠতে পারবেন না। একদিকে তিনি হবেন নৈতিক ও সামরিক গুণাবলির অধিকারী, অপরদিকে তাঁর থাকতে হবে দীনের বুনিয়াদি জ্ঞান, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা। তাকে যেমন হতে হবে সৎ, সাহসী, আমানতদার, ওয়াদা রক্ষাকারী তেমনি হতে হবে গতিশীল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামী মানসিকতা সম্পন্ন। তিনি হবেন সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁর থাকতে হবে কর্মক্ষমতা ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা। তাঁর প্রতিও জনগণের থাকবে আস্থা ও বিশ্বাস। ইসলামের মূল নীতির মধ্যে একটি হলো - ইমাম বা নেতার প্রতি জনগণের সম্মান ও আনুগত্য স্বেচ্ছায় হতে হবে (Voluntary), জোরপূর্বক বা জবরদস্তি করে নয়। যেমন নামাজের মধ্যে মুসল্লিদের সমর্থন ছাড়া কেউ ইমামতি করতে পারেন না। ইমাম হবেন জনগণের কাছে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক, তাদের চূড়ান্ত আশা ভরসার স্থল। তিনি তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য একদিকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার জন্য সদা-সতর্ক (মুত্তাকি) থাকবেন, আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান থাকবেন, অন্যদিকে তিনি রাষ্ট্রের জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন। তিনি অবশ্যই জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব

দিবেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করবেন এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে। **ইসলামে ইমাম ও জনগণের মধ্যে শুরা ব্যবস্থা অসাধারণ ভারসাম্য রক্ষা করে যেখানে কোনোভাবেই ইমাম যথেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, জালেম হয়ে উঠতে পারেন না।** জাতির ইমামের মূল লক্ষ্য থাকবে জাতির মধ্যে সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতৃত্বের মূল স্তম্ভ হিসাবে প্রত্যেক সফল খলিফাগণ এইসব গুণাবলি ধারণ করেছিলেন। জাতির ইমাম হবেন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। আধুনিক পরিভাষায় তাঁকে যে নামেই অভিহিত করা হোক আল্লাহ ও তাঁর রসুল জাতির ইমামকে যে স্থান দিয়েছেন তাকে সেই স্থান দিতে হবে। সাধারণত আমাদের মসজিদগুলোতে যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে থাকেন আমরা তাদেরকে ইমাম বলি। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় জাতির যিনি প্রধান তিনিও ইমাম। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর ইউনিয়ন পর্যায়ের সভাপতিকেও বলে ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট, আবার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ সেটাও কিন্তু প্রেসিডেন্ট। সুতরাং যে কোনো মসজিদের ইমাম ও জাতির ইমাম উভয়কেই ইমাম হিসাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম যে কেবল রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তা-ই নয়, তিনি সেনাবাহিনীরও সর্বাধিনায়ক (Commander-in-chief)। জাবির (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে (সা.) বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ইমাম একটি ঢাল; তাঁর পেছনে যুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা হয়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৬১)। **প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) উম্মতে মোহাম্মদীকে এমনভাবে তৈরি করেছেন, এমন সামরিক শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়েছেন যে তাদেরকে আর সামরিক (Military) ও বে-সামরিক (Civilian) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না।** পুরো জাতিই ছিল লোহার মতো ঐক্যবদ্ধ, সামরিক বাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল, আনুগত্যশীল ও সংগ্রামী।

ইমামের অধীনে পর্যায়ক্রমে আরো অনেক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্তরে নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। ইসলামের পরিভাষায় এই নেতৃবৃন্দকে আমির অর্থাৎ আদেশ দানকারী (Commander) বলা হয়। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ পালন কর, রসুলের আদেশ পালন কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা আমির (আদেশ দানকারী, উলিল আমর) তাদের আদেশ পালন কর। (সুরা নিসা ৪:৫৯)। আল্লাহর দেওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক কোনো না কোনো আমিরের অধীনে থাকবেন, কেউ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবেন না। প্রতিটি মুহূর্তে একজন আমিরের অধীনে থাকার গুরুত্ব এতটাই যে রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'যখন তিনজন একত্রিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একজনকে আমির হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত।' (সুনান আবু দাউদ, হাদিস ২৯২৮)।

সাধারণত যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে ফিল্ড মার্শাল থেকে শুরু করে সৈনিক পর্যন্ত ২১টি পদমর্যাদা বা র‍্যাংক থাকে। ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও এমন বিভিন্ন র‍্যাংকের 'আমির' থাকতে পারে। রণাঙ্গনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য যেমন যে কোনো সেনাবাহিনীতে সৈনিকদেরকে সামরিক খেতাব দেওয়া হয়, রসুলাল্লাহও তেমনি তাঁর সৈনিক সাহাবিদেরকে বিভিন্ন সামরিক খেতাবে ভূষিত করেছেন যেমন- খালিদ (রা.)-কে সাইফুল্লাহ, আলী (রা.)-কে আসাদুল্লাহ ও হায়দার, আমির হামজা (রা.)- কে সাইয়েদে শুহাদা ইত্যাদি। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যেভাবে সৈনিকরা তাদের অধিনায়কের আদেশ পালন করে, সেভাবে প্রতিটি নাগরিক স্ব স্ব আমিরের (Immediate Commander/ Commanding Officer) আদেশ পালন করবে। আর সেটাই হবে আল্লাহর আনুগত্য করা। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। আর যে আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হল, সে আমার অবাধ্য হলো।' (আবু হোরায়রা রা. থেকে সহিহ বোখারি, হাদিস নং ২৯৫৭)।

চেইন অব কমান্ড একটি জাতির মেরুদণ্ডের মতো, এটি জাতিকে একটি সুদৃঢ় আকৃতি কাঠামো দান করে। এই শিক্ষাটা জাতিকে দিতে হবে যেন কেউ চেইন অব কমান্ড ভাঙতে সচেষ্ট না হয়। কারণ এটা করলে জাতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে কোনো সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ডকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে মান্য করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে সবসময় সরকারের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে, সামরিক বাহিনীতে তেমন গণতন্ত্র চলে না। সেখানে যে কোনো ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার সুযোগ থাকে না। সেখানে নেতা একবার নিযুক্ত হয়ে গেলে তিনি যোগ্য কি অযোগ্য সেটা আর দেখার সুযোগ নেই, তখন সৈনিকের কাজ তার হুকুম মান্য করা। একইভাবে আমিরের আদেশ মান্য করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো ছাড় দেননি। তিনি বলেছেন, যদি কোনো বিকলাঙ্গ, কুৎসিত, কানকাটা, হাবশি গোলামকেও তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, আর সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালিত করে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। (উম্মুল হুসায়ন রা. থেকে মুসলিম ১২৯৮)। এ কথাটি তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণের মধ্যে বলে গেছেন।

তবে ইসলামের নীতি হচ্ছে, ইমাম থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের আমিরগণ আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো হুকুম দিতে পারবেন না; আর দিলেও

সেটা মানতে কোনো নাগরিক বাধ্য থাকবে না। কারণ বায়াতের শর্তের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্যের লংঘন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমির বা শাসক আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কুফর করার হুকুম না দেন। এ বিষয়ে রসুলাল্লাহর ঘোষিত নীতিমালা রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি রসুলাল্লাহকে (সা.) বলতে শুনেছি, 'মুসলমানের জন্য (ইমাম/আমিরের) নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা ফরজ, সে পছন্দ করুক বা না করুক, যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজে আদেশ করা হয়। তবে যদি তাকে পাপের আদেশ করা হয়, তবে তার জন্য শোনা ও আনুগত্য করার দায়বদ্ধতা নেই।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৯৫৫)।

বর্তমানে আমরা যে জীবনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি সেটা হচ্ছে মূলত 'মাথা গোনার গণতন্ত্র'। ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতানেত্রী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী যেমন আছেন তেমনি আছেন একেবারে অজ্ঞ, নিরক্ষর, দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর নারী ও পুরুষ। কিন্তু তাদের সবার ভোটের ও বিবেচনার মূল্য সমান। অগণিত ভোটার থাকেন যাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও দলের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু সে নির্বাচনী প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে অনুমান ও অলীক কিছু ধারণার (যেমনঃ তার বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন, আমার ভোট যেন না পচে, সব দল দেখা শেষ, এবার নতুন কাউকে দিয়ে দেখি ইত্যাদি) উপর ভিত্তি করে ভোঁকেন্দ্রে গিয়ে তার রায় দিয়ে দেয়। এখানে পপুলিজম অর্থাৎ সস্তা জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে অনেক সময় নেতাদের চেয়ে অভিনেতারা বেশি মূল্যায়িত হন। ফলে অনেক ক্রিকেটার, সিনেমার তারকা, জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী, ব্যবসায়ী, টিভি উপস্থাপক- যাদের আইন রচনা (Legislation) সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, তারা আইনসভার সদস্য হয়ে যায়। ফলে কোনো অবস্থাতেই এই 'মাথা গোনার গণতন্ত্র' দিয়ে জাতির সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে না। আসা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আল্লাহর নীতি- যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই সে বিষয়ের অনুসরণ করো না। (সুরা বনি ইসরাইল ১৭:৩৬)। অর্থাৎ যে সম্পর্কে যার সামগ্রিক ধারণা নেই, সে ঐ বিষয়ে কোনো রায় দিতে পারে না।

আর যারাই নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্বে আসুন না কেন, তারা যত ভালো মানুষই হোন না কেন, তারা যে মানবরচিত শাসনব্যবস্থা দিয়ে দেশ চালাবেন সেটা ভ্রান্ত, সেটাই সকল অন্যায়ের কারিগর। তাই তারা সবাই মানুষকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হবেন। **মহা শিক্ষিত নেতাও যেমন ব্যর্থ হবেন, তেমনি অশিক্ষিত নেতাও ব্যর্থ হবেন।** এই ব্যর্থতার দায় যতটা না ব্যক্তির, তার চেয়ে বেশি ব্যবস্থার। পক্ষান্তরে আল্লাহর হুকুমকে যদি জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে নেওয়া হয়, তাহলে

সেটা হবে অপরিবর্তনীয়। কেউ নির্বাচিত হয়ে চাইলেই কোর'আনের কোনো হুকুমকে পাল্টে দিতে পারবে না। ফলে মানুষ নিশ্চিতরূপে ন্যায় লাভ করবে। কোনো নেতা কোর'আনের কোনো নীতি পরিপন্থী কোনো কাজ করলে জনগণ সেটা মেনে নেবে না, কারণ তাদের বায়াত বা আনুগত্যের শর্ত হচ্ছে, নেতাকে কোর'আনের নীতিমালার মধ্যেই থাকতে হবে। তাই এখানে ব্যক্তি নিরক্ষর হোক বা শিক্ষিত হোক তাতে তেমন কোনো পার্থক্য হবে না। সুতরাং সংক্ষেপে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

০১. **একজন ইমামের আনুগত্য:** জাতির সমগ্র জনগোষ্ঠী একটি অখণ্ড সত্তার ন্যায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (তওহীদ) ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং একজন ইমামের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিবে। যখন তখন, যে কেউ, কারণে অকারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ইমামের বিরুদ্ধাচারণ করবে- সেটা চলবে না। বর্তমানে এমন সুযোগ চালু থাকার কারণেই টেকসই রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছি।

০২. **শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্র কাঠামো:** একটি সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্য যেমন চেইন অব কমান্ডের অধীনে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে একটি সুস্পষ্ট চেইন অব কমান্ডের অধীনে আনা হবে। সবারই একজন আমির বা দায়িত্বশীল থাকবে। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধির আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক থাকবে। তাকে কেবল জনগণের সেবকই নন, তিনি জনগণকে আদেশ দেওয়ার অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হবেন।

০৩. **আনুগত্যের সীমানা:** ইমাম থেকে শুরু করে প্রতিটি স্তরের আমিরগণ আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী কোনো হুকুম দিতে পারবেন না। যদি কেউ এমন আদেশ দেন, তা মানতে কোনো নাগরিক বাধ্য থাকবে না। শাসক যেই হোন না কেন, আল্লাহর চিরন্তন এবং শাশ্বত বিধান কোর'আন সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মূল ভিত্তি হয়ে থাকবে।

বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়।

সুরা নিসা ৪:৬৪

মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers)

অভিধানমতে মন্ত্রী (Minister) শব্দের উৎপত্তি মন্ত্র থেকে যার অন্যতম অর্থ হচ্ছে যুক্তি, পরামর্শ। আর মন্ত্রী শব্দের অর্থ রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা (Adviser), মন্ত্রণাদাতা ও গোপন পরামর্শদাতা (Trusted Consultant)। আল্লাহর রসুলের আলাদা করে কোনো পরামর্শক সভা (মজলিসে শুরা) বা মন্ত্রিপরিষদ (মাজলিস আল-উজারা/দিওয়ান) ছিল না। রসুলাল্লাহ তাঁর বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সাহাবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সব কাজ করতেন, কখনও কখনও তিনি মসজিদে যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য খোলা পরামর্শ আহ্বান করতেন। এ বিষয়ে তিনি নারী পুরুষ, তরুণ বৃদ্ধ ভেদাভেদ করতেন না। আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আনাস বিন মালিক (রা.) এর মত সাহাবিরাও কিশোর বয়স থেকে রসুলাল্লাহর সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের সঙ্গেও রসুলাল্লাহ বহু বিষয়ে পরামর্শ করতেন। সুতরাং এটা ঐতিহাসিক সত্য যে রসুলাল্লাহকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সদস্যবিশিষ্ট শুরা কমিটি বা মন্ত্রিপরিষদ ছিল না। আর উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতা (ইমাম) হিসাবে পরামর্শ করার জন্য তিনি কারো প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না। পরামর্শ করে কাজ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই তিনি প্রচুর পরামর্শ করতেন এবং আবু হোরায়রা (রা.) বলেছেন, আমি রসুলাল্লাহ (সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে বেশি পরামর্শকারী অন্য কাউকে দেখিনি। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৪৮৭২)। বদরের যুদ্ধের আগে তিনি তাঁর সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। সাহাবি হুবাব ইবনে মুনজির (রা.) প্রস্তাব দেন যে, আমাদের পানির উৎসগুলোর কাছে অবস্থান নেওয়া উচিত। রসুলাল্লাহ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধেও রণাঙ্গন নির্ধারণে সাহাবীদের মতামত চাওয়া হয়। অধিকাংশ সাহাবি প্রস্তাব দেন মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা উচিত। রসুলাল্লাহ তাঁদের মতামত গ্রহণ করেন, যদিও তিনি নিজে পরামর্শকালে মদিনার ভেতরে থেকে প্রতিরক্ষা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন (সিরাত-ইবনে ইসহাক)। খন্দকের যুদ্ধে নওমুসলিম সাহাবি সালমান ফারসির (রা.) পরামর্শে তিনি খন্দক খননের মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। আর তাঁর এ যুদ্ধ কৌশল সম্মিলিত বাহিনীকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল এবং মদিনাকে রক্ষা করেছিল।

আবার কোনো কোনো বিষয়ে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনা ও নীতি অনুযায়ী তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতেন। এসব ক্ষেত্রে কারো আপত্তি তিনি গ্রহণ করতেন না। যেমন হোদায়বিয়ার সন্ধির সিদ্ধান্ত তিনি সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে গ্রহণ করেন। উমরের (রা.) মত নেতৃস্থানীয় সাহাবিও আপাত অবমাননাকর এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। হজ না করে মদিনায় ফিরে যাওয়াকে পরাজয়তুল্য মনে করে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। রসুলাল্লাহ তাদেরকে পশু কোরবানি ও ইহরাম খোলার নির্দেশ দেওয়ার পরও তারা তাতে তৎক্ষণাত সাড়া দিতে বিলম্ব করেন। তখন উম্মুল মো'মেনীন উম্মে সালামা (রা.) পরামর্শ দেন যে, রসুলাল্লাহ (সা.) যদি নিজে আগে কোরবানি ও ইহরাম খুলেন তখন সাহাবীরা অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করবেন। রসুলাল্লাহ এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সাহাবীরাও তখন কালবিলম্ব না করে তাঁর অনুসরণ করেন। এই ছিল রসুলাল্লাহর পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি।

উত্তম পরামর্শদাতা, সৎ উপদেষ্টা বা মন্ত্রীকে আরবি ভাষায় বলা হয় ওয়াজির, বাংলাতে উজির শব্দটি এই ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। পরামর্শদাতার চরিত্র সম্পর্কে রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন, 'পরামর্শদাতা হবেন একজন আমানতদার।' (আবু হোরায়রা (রা.) থেকে সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫১২৮)। অর্থাৎ তিনি কাউকে কোনো পরামর্শ দিলে সেটা অপরকে বলবেন না।

রসুলাল্লাহ আরো বলেছেন, 'আল্লাহ যখন কোনো শাসকের কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার জন্য একজন ন্যায়নিষ্ঠ উজিরের (পরামর্শদাতা) ব্যবস্থা করে দেন। তবে শাসক যদি কিছু ভুলে যায় তখন উজির তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর শাসক যদি স্মরণ রাখে তাহলে উজির তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আর যদি আল্লাহ কোনো শাসকের সাথে এর বিপরীত কিছু করতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার জন্য এমন একজন উজিরের ব্যবস্থা করে দেন, যদি শাসক কোনো কিছু ভুলে যায়, তাহলে পরামর্শতাদা তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি শাসক স্মরণ করেন, তাহলেও পরামর্শদাতা তাকে সহযোগিতা করে না। (আয়েশা রা. থেকে আবু দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০৪, আহমাদ ২৪৪১৪, সহীহ আল জামি ৩০২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৯৬।)

আর তোষামদকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ কেবল শাসক নয়, সকল মো'মেনদেরকে সতর্ক করেছেন। আবু মামার (রহ.) থেকে বর্ণিত, কোনো একদিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোনো এক প্রশাসকের সামনেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। এতে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) তার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি নিক্ষেপ

করতে থাকেন এবং বলেন, রসুল (সা.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করি। (তিরমিজি, হাদিসঃ ২৩৯৩)।

একজন শাসকের জন্য উত্তম 'ওয়াজির/উজির' থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের যারা সফল রাষ্ট্রনায়ক তাদের প্রত্যেকের জীবনে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের প্রধান পরামর্শক ছিলেন তার গুরু দার্শনিক অ্যারিস্টটল স্বয়ং। একইভাবে উত্তম পরামর্শদাতা হিসাবে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের সাথে মার্ক অ্যান্টোনির নাম, জুলিয়াস সিজারের সাথে ক্যাসিয়াসের নাম, খলিফা হারুন অর রশিদের সঙ্গে তার উজির জাফর বারমাকীর নাম, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে তার সেনাপ্রধান বার্থিয়েরের নাম, সম্রাট আকবরের সঙ্গে বৈরাম খানের নাম একসূত্রে গাঁথা থাকে।

রসুলাল্লাহর সময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের যারা দায়িত্বপালন করতেন তাদেরকে কাতিব (সচিব, Writer) বলে উল্লেখ করা হত। তারা সরকারি চিঠি লেখা, নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ করতেন। খলিফাদের শাসনামলে ইসলামের আওতাধীন ভূখণ্ড আরও বিস্তৃত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা ও সরকারি কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। এ পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সুসংগঠিত এবং বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে নতুন নতুন দপ্তর বা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়, যাকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। খলিফাদের শাসনামলে, বিশেষ করে উমাইয়া ও আব্বাসী খিলাফতের সময়, এই প্রশাসনিক কাঠামো আরও উন্নত হয়। সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক বিভাগের (Bureaucratic Department) সৃষ্টি করা হয়, যেমনঃ রাজস্ব ও অর্থ বিভাগ (দিওয়ান আল-রাসাদ), সেনাবাহিনী বিভাগ (দিওয়ান আল-জাইশ), প্রতিরক্ষা বিভাগ (দিওয়ান আল-দিফা), মন্ত্রিপরিষদ (দিওয়ান আল-উজারা), দপ্তর বিভাগ (দিওয়ান আল-খাতেম), কাজ ও কার্যক্রম বিভাগ (দিওয়ান আল-আমল), আইন ও বিচার বিভাগ (দিওয়ান আল-কাজা), শাসকের বাসভবন ও প্রটোকল বিভাগ (দিওয়ান আল-দ্বার), দূতাবাস ও পররাষ্ট্র বিভাগ (দিওয়ান আল-সাফারা) ইত্যাদি। এই বিভাগগুলো যারা পরিচালনা করতেন তাদেরকে আব্বাসীয় খিলাফতে 'উজির' বলে আখ্যায়িত করা হত। বিশেষ করে মুসলিম পারস্যে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে সাধারণত ওয়াজির-ই-আজম বলা হতো। আন্দালুসিয়াতে (স্পেন), উমাইয়া খলিফারা বিভিন্ন আমলাতন্ত্রের প্রধান, নির্দিষ্ট কাজের মন্ত্রী এবং খলিফার বিশেষ পরামর্শক হিসেবে বহু উজির নিয়োগ করেছিলেন। ১০০৮ সালে, একযোগে ২৯ জন উজির কার্যরত ছিলেন। তিউনিসিয়ার হুসাইনি রাজবংশের অধীনে বিভিন্ন

মন্ত্রী ছিলেন, যেমন ওয়াজির আল-আকবর (প্রধানমন্ত্রী), ওয়াজির আল-আমলা (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), ওয়াজির আল-বাহর (নৌমন্ত্রী), ওয়াজির আল-হারব (রণমন্ত্রী) ইত্যাদি। তাদের প্রতিমন্ত্রীও ছিল যাদেরকে বলা হত ওয়াজির-উদ-দৌলা। আর শুরা পরিষদের সদস্যদেরকে বলা হত উজির উস-শুরা। বাংলা সালতানাতে আঞ্চলিক অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তাকেও উজির হিসেবে চিহ্নিত করা হতো যেমন সেনামন্ত্রীকে বলা হত লস্কর উজির, কোথাও বলা হত মীর বখশী, অর্থমন্ত্রীকে বলা হত দৌলত উজির। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫ নং ধারায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন, মন্ত্রীদের কার্যাবলি এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে একদিকে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তার যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন; আরেকদিকে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ পুরোপুরি দায়বদ্ধ থাকবে সংসদের কাছে। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদটি গুরুত্বহীন ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। এতে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিপুল ক্ষমতা থাকার কারণে তিনি কালক্রমে স্বৈরাচারী হতে পারেন বলে আমরা মনে করি। কাজেই মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে-

০১. **মন্ত্রিপরিষদ কাঠামো ও সদস্য সংখ্যাঃ** রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। নতুন দপ্তর ও মন্ত্রণালয় গঠিত হলে মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম একীভূত বা গুরুত্ব কমলে মন্ত্রীর সংখ্যা কমানো হবে।

০২. **মন্ত্রী নির্বাচনের প্রক্রিয়াঃ** রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। মন্ত্রিসভার সদস্যরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মনোনীত হতে পারেন। আবার জনপ্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, জাতীয় স্বার্থে অবদান, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং নৈতিকতার দিক থেকে অগ্রণী প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকেও মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

০৩. **দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাঃ** মন্ত্রীরা প্রথমত স্রষ্টার হুকুমের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন, এরপর রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুমের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। তাদের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি ও আদর্শ বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

০৪. **অপসারণ ও পদত্যাগ প্রক্রিয়াঃ** রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদের যে কোনো সদস্যকে অপসারণের ক্ষমতা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীও রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শক্রমে যে কোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করতে পারবেন। মন্ত্রীরা ইচ্ছা করলে নিজ দায়িত্ব থেকে পদত্যাগও করতে পারবেন।

০৫. **প্রশাসনিক ও সাচিবিক কাজ:** মন্ত্রণালয়গুলো তাদের নির্ধারিত খাতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা তৈরি, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, দেশের ভিতরে ও বাইরে সরকারের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারি খাতগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মতো প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পাশাপাশি সাচিবিক কাজ হিসেবে দাপ্তরিক ও দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যেমন রেকর্ড রাখা, চিঠি বা নির্দেশনা প্রেরণ, দলিল প্রক্রিয়া, রিপোর্ট প্রস্তুত করা, রিপোর্ট সংগ্রহ ও মূল্যায়ন এবং কর্মীদের পরিচালনা করা ইত্যাদি সম্পাদন করবে।

০৬. **দ্বৈত দায়িত্ব:** মন্ত্রী একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রধানকে নীতি নির্ধারণে সহযোগিতা করবেন, অপরদিকে নির্বাহী ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে শুরা পরিষদকে সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর অধীনে এক বা একাধিক মন্ত্রণালয় থাকবে। তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম দক্ষ ও অভিজ্ঞ সচিবদের মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। এই সচিবগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দায়িত্ব লাভ করবেন।

০৭. **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা:** মন্ত্রীদের কার্যক্রম স্বচ্ছ হতে হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

০৮. **ক্ষমতার বিভাজন:** মন্ত্রী পরিষদ আইনানুগভাবে পরিচালিত হবে। বিচারবিভাগের উপর মন্ত্রিপরিষদ এবং শুরা পরিষদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না।

০৯. **দুর্নীতি প্রতিরোধ:** মন্ত্রীদের নৈতিক মান বজায় রাখতে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারি কার্যাদি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের কোনো অনৈতিক সুপারিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। তাদের কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে আল্লাহর দেওয়া আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। মন্ত্রী বা জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে না বরং তাদের কার্যক্রম আরো কঠোরভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

শুরা পরিষদ (Advisory Council)

যে কোনো ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রপ্রধানের কিছু পরামর্শক প্রয়োজন হয় যা উপরে বলে এসেছি। এমনকি প্রায় সকল রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) নামে একটি পরামর্শদাতা সংস্থা থাকতো যা কোনো রাষ্ট্রের প্রধান বা শাসকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ প্রদান করত, বিধি-বিধান প্রণয়নে সহযোগিতা করত। ইসলামের সকল খেলাফত ও রাজতন্ত্রেও এমন প্রিভি কাউন্সিল বিদ্যমান ছিল। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও ইমামকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি শুরা পরিষদ থাকবে, যেভাবে বর্তমান ব্যবস্থায় সংসদ বা আইনসভা থাকে।

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই শুরা পরিষদের সদস্যরা হবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। নির্বাচিত হওয়ার পর তাদেরকে তার জনগণের আমির বা আদেশদাতা হিসাবে নিযুক্ত করা হবে এবং জনগণ তার আদেশের আনুগত্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। ইসলামের পরিভাষায় তিনিই হবেন আমির বা আদেশদাতা (Commander)। রসুলাল্লাহ (সা.) যখন বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করতেন, তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সাহাবিকে সেনা-অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ করে দিতেন। তাদেরকে আমির (Commander) বলে অভিহিত করা হত। কোর'আনের ভাষায় উলিল আমর (সুরা নিসা ৪:৫৯) একটি শাসনতান্ত্রিক পদ। একজন ব্যক্তি যখন আদেশদাতার জায়গায় থাকেন তখন তাকে আমির বলা যায়; আবার যখন তিনি সালাতে ইমামতি করেন তাকে ইমামও বলা যায়। এভাবে একটি ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের দেশে চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও দেখে থাকি। যেমন জেলা প্রশাসক যখন জেলার নিয়মিত নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন তখন তাকে বলা হয় ডিসি বা ডেপুটি কমিশনার। কিন্তু নির্বাচন চলাকালে তিনি হয়ে যান রিটার্নিং অফিসার। আইনসভা সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছে:

০১. **জনপ্রতিনিধি:** এই জনপ্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সচেতন নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। তারা যার যার এলাকার আমির হিসাবে পরিগণিত হবেন, তারা দায়বদ্ধ থাকবেন আমিরে শুরা বা স্পিকারের কাছে। তার কাছেই শপথ গ্রহণ করবেন।

০২. **ভোটাধিকার:** সবাই ভোট দিবেন না, ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন কেবল সচেতন নাগরিকগণ। নির্বাচন কমিশন ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি স্পষ্ট মানদণ্ড তৈরি করবে। মানদণ্ডের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সচেতনতা, পেশাগত দক্ষতা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান বিবেচনা করা হবে।

০৩. **নির্বাচন পদ্ধতি:** নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য একটি প্যানেল তৈরি করা হবে, যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। তাদের সংখ্যা পাঁচজনও হতে পারে দশজনও হতে পারে। সরকার তার নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অথবা সামাজিক পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের নাম জনগণের সামনে প্রস্তাব করবে। প্রমাণিত অপরাধী, নৈতিক চরিত্রহীন বা রাষ্ট্রের মৌলিক নীতির প্রতি অনুগত নয় এমন কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কেউ নিজ উদ্যোগে প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি প্রার্থিতার প্রাথমিক যোগ্যতা হারাবেন। নির্বাচনের সব ব্যয় সরকার তথা নির্বাচন কমিশন বহন করবে। একই পোস্টারে সব প্রার্থীর ছবি ও পরিচিতি প্রকাশ করা হবে। নির্বাচনী প্রচার, মিছিল বা সভার প্রয়োজন হবে না। ফলে নির্বাচনী প্রচারণার আড়ালে আত্মপ্রচার বা অন্য প্রার্থীদের চরিত্র হননের সুযোগ থাকবে না। নির্ধারিত সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও তাদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের সুযোগ থাকবে।

০৪. **দায়িত্ব:** জনপ্রতিনিধিগণ (আমির) রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে তার এলাকার জনগণের নেতৃত্ব দিবেন। তিনি জুমা মসজিদে ও ঈদের দিন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য বা খোতবা প্রদান করবেন; বিচার-আচারসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তিনি স্থানীয় জনগণের মৌলিক ও মানবিক চাহিদা পূরণ, দরিদ্রদের মাঝে বাইতুল মালের সম্পদ বিতরণসহ জনগণের নানা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দায়বদ্ধ থাকবেন। আমিরের বেতন-ভাতা অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র প্রদান করবে। আমির যদি নারী হন তিনি কেবল সালাতের ইমামতি ছাড়া সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডেই নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

০৫. **আইন পরিষদের কাজ:** শুরা পরিষদের সদস্যরা (আমির) আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে যে কোনো নতুন পরিস্থিতি, সংকট বা চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজে পেতে গবেষণা (ইজতেহাদ) করবেন। এজন্য তারা জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিবেন, তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ

করবেন। এরপর আইনসভায় এসব বিষয় নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করে ইজমা বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। পাশাপাশি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলোর সংশোধন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ধারা ও উপধারা প্রণয়ন করবেন। যেসব বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবেন না, সেসব বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকেই গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

০৬. **নির্বাচনী অঞ্চল:** দেশের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে অঞ্চলভিত্তিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি পাঁচ লাখ মানুষের জন্য একজন জনপ্রতিনিধি (আমির) নির্বাচন করা হবে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতি বা প্রয়োজন অনুযায়ী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

০৭. **স্থানীয় উন্নয়ন:** জনপ্রতিনিধিগণ তাদের নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করবেন, যা প্রকল্প প্রস্তাব আকারে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে উপস্থাপিত হবে। প্রকল্প অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপ্রধানের দপ্তর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে, যা মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সচিবদের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সচিবগণ তাদের আর্থিক হিসাব ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন। জনপ্রতিনিধিগণ নিজ এলাকার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং এর জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

০৮. **জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব:** বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোয় পুরো দেশকে ৬৪টি জেলায় ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার একজন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ করে থাকে। তারা জনপ্রতিনিধি নন। ব্রিটিশ শাসনামলে এই পদটি 'কালেক্টরেট' নামে পরিচিত ছিল, যা ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব সংস্কারের অংশ হিসেবে 'রেগুলেশন অফ ১৭৭২'-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ এবং জেলা প্রশাসনিক কার্যক্রমের তদারকি করা। ব্রিটিশ শাসন পরবর্তী সময়েও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে এই কাঠামো বহাল ছিল এবং বর্তমানেও জেলা প্রশাসক (ডিসি)-রা কালেক্টরের ঐতিহ্য ধরে জেলা প্রশাসন পরিচালনা করছেন। পাকিস্তান আমলে 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডিন্যান্স ১৯৫৯' (District Magistrate Ordinance 1959) এর মাধ্যমে কালেক্টর পদটি পরিবর্তিত হয়ে জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। তবে আধুনিক সময়ে জনপ্রতিনিধি ও ডিসি'র মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভাগাভাগি নিয়ে স্পষ্ট নীতিমালার অভাবে নীতি নির্ধারণ, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রভাব ও কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে জনগণকে ভোগান্তি পোহাতে হয়, যেমন এতে করে উন্নয়ন প্রকল্পে

বিলম্ব ঘটে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মান কমে যায়, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় এবং রাজনৈতিক অন্যায় বাড়ে।

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একমুখী ধারার ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা হবে। প্রতিটি জেলার নির্বাচনী আসন থেকে নির্বাচিত শুরা সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন একজনকে জেলা আমির হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। তার অধীনে জেলা সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা থাকবেন। তার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট জেলার সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অর্থাৎ আমাদের নীতি হবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এড়িয়ে সমন্বিত ও একমুখী ক্ষমতার কাঠামো নিশ্চিত করা।

আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, আর যদি তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানির কোনোকিছু পরিলক্ষিত হয়, তখন তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণার সাথে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটাতে পারবে না।'

(আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) থেকে মুসলিম)

মসজিদ- আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র
(The Mosque – The Center of Administrative and Spiritual Authority)

মসজিদ অর্থ সেজদার স্থান। আল্লাহর উদ্দেশে ভূমিতে মাথা ঠেকানোই কেবল সেজদা নয়। নামাজের সেজদা হচ্ছে সর্বান্তকরণে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করার অনুশীলন। সেজদার অর্থ যে আনুগত্য করা তা কোর'আনে সেজদা শব্দের ব্যবহার দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহকে সেজদা করে (সুরা রাদ ১৩:১৫)। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'তারকারাজি ও বৃক্ষকূল আল্লাহকে সেজদা করে (সুরা রহমান ৫৫:৬, সুরা নাহল ১৬: ৪৯))। মো'মেনদের ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবন আলাদা নয়, এক সূত্রে গাঁথা। তাই ইসলামের মসজিদ নিছক কোনো উপাসনালয় নয়, এটি ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশাসনিক কার্যালয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদ এমনই ছিল। রসুলাল্লাহ মদিনায় হিজরত করার পর প্রথম যে কাজটি করলেন সেটা হচ্ছে মসজিদ নির্মাণ। এই মসজিদই ছিল ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, কর্মচঞ্চল। বর্তমানে মসজিদকে শুধু নামাজের ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, নামাজের সময়টুকু ছাড়া মসজিদ তালাবদ্ধই থাকে। এভাবে শত শত বছর থেকে সামাজিক, শিক্ষা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক কার্যক্রম থেকে মসজিদকে পৃথক করে ফেলার দরুন সাধারণ মানুষের কাছে মসজিদের আকিদা (সামগ্রিক ধারণা) হারিয়ে গেছে এবং মসজিদ সকল কার্যক্রম হারিয়ে কেবল নামাজের স্থানে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর রসুলের সময় মসজিদে যেসব কার্যক্রম হত তার আলোকে মসজিদ সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

০১. **প্রশাসনিক কার্যালয়ঃ** রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এবং জনগণের অবাধ যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জনবহুল স্থানে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সদরে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে 'জামে মসজিদ' নির্মাণ করা হবে। তবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য পাঞ্জেগানা মসজিদ শুধুমাত্র সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মুসল্লিদের অর্থায়নে নির্মিত হতে পারে। সকল মসজিদই রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার অধীনে পরিচালিত হবে এবং সেগুলোকে বহুবিধ জাতীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হবে। মসজিদ কমিটির পদ বা ফেরকাগত দ্বন্দ্বের কারণে অন্যের জমি দখল

করে কিংবা বিরোধপূর্ণ জমিতে, পাড়ার আনাচে কানাচে মসজিদ নির্মাণের সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। জামে মসজিদগুলোতে জুমার খোতবায় জাতিকে কী বার্তা বা তথ্য দেওয়া হবে, তা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। পাঞ্জেগানা নামাজ ও জুমার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্রের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আনুষ্ঠানিক বার্তা পাবে। এছাড়াও ইসলামের আমল ও আখলাক সংক্রান্ত মৌলিক শিক্ষাগুলো মুসল্লিরা সহজেই জুমার খোতবার মাধ্যমে গ্রহণ করবে। অন্যান্য ওয়াক্তের নামাজের পরও আমিরের মধ্যস্থতায় পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বহু বিরোধ নিষ্পত্তি, সমস্যা সমাধান এবং তথ্য আদান-প্রদান হবে, যার ফলে গুজব ও অনৈক্য ছড়ানোর সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে। বিশেষ করে মসজিদকে গুজব ও বিদ্বেষ প্রচারের স্থান হিসেবে অপব্যবহার করার কোনো সুযোগ রাখা হবে না।

০২. **অর্থনৈতিক কার্যালয়ঃ** মসজিদ হবে রাষ্ট্রের নির্ধারিত কর এবং দানের অর্থ সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম, তবে আরও আধুনিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থা থাকতে পারে। এই অর্থ হিসাবরক্ষকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে পাঠানো হবে। রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে, মসজিদের ইমাম এবং খতিবদের বেতন-ভাতা সরকার নির্ধারণ করবে, যা অন্যান্য মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের বেতন স্কেলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। মুয়াজ্জিন ও মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণকারীদের বেতন-ভাতা সরকার প্রদান করবে। এর ফলে মসজিদের ইমাম এবং খতিবদের জনগণের দানে নির্ভরশীল হতে হবে না এবং মসজিদ নির্মাণের নামে রাস্তার পাশে টাকা তুলতে হবে না। বরং, মসজিদ থেকেই দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য দান ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

০৩. **বিচারালয়ঃ** বিচারব্যবস্থাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জামে মসজিদকে বিচার-সালিশ কেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহার করা হবে। এখানে সালিশি পদ্ধতির মাধ্যমে বিনা খরচে বিচার প্রদান করা সম্ভব হবে। ইসলামী আইন ও অন্যান্য প্রচলিত আইনের বিশেষজ্ঞ বিচারকগণ মসজিদের নির্ধারিত স্থানে সপ্তাহজুড়ে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, শুনানি গ্রহণ করবেন, রায় দেবেন এবং রায় কার্যকর করবেন। যেহেতু জুমার দিনে সবাই মসজিদে একত্রিত হয়, সেদিন কিছু দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড জনসম্মুখে কার্যকর করা হবে। এর মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। তবে, জটিল ও গুরুতর মামলাগুলি উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হবে। অধিকাংশ অভিযোগ স্থানীয় পর্যায়েই মীমাংসা হয়ে যাবে।

০৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ সালাত (নামাজ) হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া উম্মতে মোহাম্মদির প্রধান চারিত্রিক প্রশিক্ষণ। এটি জাতিকে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা, দলগত কাজ (Team work), ধৈর্যশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মনোযোগ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ছাড়াও মসজিদ হবে

জাতির নারী-পুরুষ সকলের জন্য একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র। এখানে দীনের বিজ্ঞ আলেমরা আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক নানা বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দেবেন। মসজিদ থেকে বিনা বেতনে কোর'আন শিক্ষা, প্রয়োজনীয় হাদিসের জ্ঞান, দৈনন্দিন মাসলা-মাসায়েল, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, দীনের মৌলিক আকিদা ও ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া হবে। মসজিদের বাইরেও পৃথক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। কেবল জ্ঞানচর্চাই নয়, রসুলাল্লাহর সময় মসজিদ প্রাঙ্গণে শরীরচর্চা, খেলাধুলা, দৌড় প্রতিযোগিতা, কুস্তি, তীর-ধনুক, বর্শা নিক্ষেপের মতো শারীরিক কর্মকাণ্ডও করা হতো। রসুলাল্লাহ (সা.) সপরিবারে এসব খেলা উপভোগ করতেন এবং কখনো কখনো এতে অংশও নিতেন। এর মাধ্যমে যেমন বিনোদন লাভ হত, তেমনি জাতির তারুণ্যশক্তি হয়ে উঠত গতিময়, প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সদাপ্রস্তুত।

০৫. **আবাসন ব্যবস্থা:** মসজিদকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন গড়ে তোলা হবে। সেখানে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বসবাস করবেন। আল্লাহর রসুল স্বয়ং মসজিদের সন্নিকটে বাস করতেন এবং একদল নিবেদিতপ্রাণ সাহাবি মসজিদেই বসবাস করতেন যাদেরকে আসহাবে সুফ্‌ফা (বারান্দার অধিবাসী) বলা হত। বিভিন্ন গোত্র বা রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিদেরও আবাসন বন্দোবস্ত মসজিদেই করা হত। পরবর্তী খলিফা ও সুলতানদের যুগে একেকটি মসজিদ কমপ্লেক্স বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি হত। যেমন আব্বাসী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের নির্মিত (৮৫৪ খ্রি.) ইরাকের সাম্বার মসজিদের আয়তন ছিল ২,০০,০০০ বর্গমিটার। মসজিদ চত্বরের সন্নিকটে সরাইখানা স্থাপিত হত, যেখানে পথচারী, মুসাফির, দুর্গত মানুষেরা খাবার ও আশ্রয় পেত। এসব সরাইখানাগুলো (Community Canteen) মূলত স্থানীয় অবস্থাসম্পন্ন পরিবারগুলোর দান, সাদকা, ফসলের উশর ইত্যাদি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা পরিচালিত হত। বর্তমান সময়ের মতো জমকালো হোটেলব্যবসা ইসলামের সভ্যতায় দেখা যেত না, যেখানে অর্থ ছাড়া মানুষ মানুষকে চিনে না। না খেয়ে থাকলেও কেউ কাউকে দুটো ভাত খেতে দেয় না। এমন একটি মানবতাহীন সমাজকে পরিবর্তন করতে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

০৬. **নারীদের অংশগ্রহণ:** আল্লাহর ঘর মসজিদে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে অবারিত। তারা দিনে রাতে যে কোনো সময় এবাদত বন্দেগিসহ যে কোনো সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতে পারবেন। কেউ তাদের এই অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। তারা সকল সালাতে, খোতবায়, বিচারিক কার্যক্রমে, বিয়ে-শাদি, আকিকা ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে, আলোচনা

সভায় পুরুষদের মতই অংশ নিবেন, কোনো লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবেন না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এত বেশি সংখ্যক নারী মসজিদে যাতায়াত করতেন যে খলিফা ওমরের (রা.) সময় নারীদের জন্য আলাদা দরজা বানাতে হয়েছিল। সেই সোনালি যুগে নারীদের বসার জন্য পৃথক কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, নারী পুরুষ এক জামাতেই নামাজ পড়তেন, একসাথে বসেই আলোচনা শুনতেন।

০৭. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামরিক কার্যক্রম:** একটি জাতির আইন-শৃঙ্খলা ও সামরিক বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রসুলাল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিদের যুগে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। মসজিদের সম্মুখভাগে কিবলা নির্দেশক স্থানটিকে 'মেহরাব' বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ লড়াইয়ের মঞ্চ। আধুনিক যুগে সামরিক কার্যক্রম অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং এতে উন্নত প্রযুক্তি ও বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম যুক্ত হয়েছে। যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, মিসাইল, সাবমেরিন, রাডার সিস্টেম, হেলিকপ্টার, নৌযান, গাইডেড মিসাইল, এফসিএল (ফোর্স ফিল্ড অ্যাটাক সিস্টেম) এবং রোবট সিস্টেমের মতো ভারী ও প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ উপকরণ ব্যবস্থাপনার জন্য এখন বড় এলাকাভিত্তিক সামরিক স্থাপনা, ক্যান্টনমেন্ট, মিলিটারি বেইজ এবং এয়ারবেস থাকতেই হবে। রাষ্ট্রের নিয়মিত সামরিক বাহিনী সেসব স্থাপনা ব্যবহার করবে। তবে এর পাশাপাশি জাতির সকল সক্ষম নাগরিককে প্রাথমিক সামরিক শৃঙ্খলা, আনুগত্য, শরীরচর্চামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণের স্থান হিসেবেও মসজিদ ও মসজিদ প্রাঙ্গণকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা মসজিদে সাধারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ঘটে। দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদকে শুধু আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে নয় বরং দেশের জাতীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হলে সেগুলো দেশের উন্নয়ন, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৮. **সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির চর্চা:** বিয়ে-শাদি, আকিকাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন করা হবে। রসুলাল্লাহ (সা.) এর যুগে বিয়েশাদিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান মসজিদেই হত এবং এই অনুষ্ঠানগুলো মসজিদে সম্পন্ন করার ব্যাপারে রসুলাল্লাহ উৎসাহও দিয়েছেন। মসজিদ হবে ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। অপসংস্কৃতি রোধ করে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় মসজিদ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও, মসজিদগুলোকে সামাজিক সহায়তা কেন্দ্র, পারিবারিক পরামর্শ সেবা কেন্দ্রসহ নানা বহুমুখী কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সরকারের পৃথক অফিস পরিচালনার খরচ কমানো সম্ভব হবে।

নাগরিক ও প্রশাসনিক সেবা (Civil Service)

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বিভিন্ন নির্বাহী বিভাগ গঠন করা হবে। এসব বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত হবেন দেশের সবচেয়ে যোগ্য, শিক্ষিত, বিশ্বস্ত, আমানতদার, বিনয়ী, ভদ্র, সাহসী এবং তাকওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা। নির্বাহী কার্যক্রমে ঘুষ বা দুর্নীতির কোনো সুযোগ থাকবে না, কারণ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে অপরাধীকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। কোনো অবস্থাতেই অপরাধীকে তার সামাজিক অবস্থান বা প্রভাবের কারণে ছাড় দেওয়া হবে না। এই সুশাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে দুর্নীতি ও অন্যায় থেকে মুক্ত রাখার পাশাপাশি শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

দ্বিতীয় কারণ আল্লাহর দেওয়া দীনে ব্যক্তিগত সততার মূল স্পিরিট বা চেতনা থাকবে তাকওয়া। জাতির প্রত্যেকে এই কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, আল্লাহ যেটা হালাল করেছেন আমরাও সেটা হালাল করব, আল্লাহ যেটা হারাম করেছেন আমরাও সেটা হারাম (নিষিদ্ধ) করব। ফলে প্রত্যেকটি মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। ইসলাম কী, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী, ইসলামের উদ্দেশ্য কী, মানুষের প্রকৃত এবাদত কী, মানব জীবনের সার্থকতা কীসে, তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য কী - এ সকল বিষয়ে যখন মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করবে তখন সে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণে অনুপ্রাণিত হবে। (গ্রন্থের পরবর্তী অংশে 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী' এবং 'ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান' শীর্ষক অধ্যায়গুলোতে এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।) তারা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সব দেখেন, সব শোনেন। তাই অতি সংগোপনেও যদি দুর্নীতি বা অপরাধ করা হয়, সেটার পরিণতি তাকে পরকালে হলেও অবশ্যই ভোগ করা লাগবে। মানুষের চোখ ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তাই একদিকে শরিয়াহর শাস্তি, অপরদিকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়, এই দুই দিক বিবেচনা করে মানুষ সৎ থাকবে। সর্ব অবস্থায় তাদের মনে এই বোধ জাগ্রত থাকবে যে তারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিমাত্র (সুরা বাকারা ২:৩০, সুরা আনআম ৬:১৬৫, সুরা বনি ইসরাইল ১৭:১৭০)। পৃথিবীর অন্যতম সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন আল্লাহর

নবী দাউদ (আ.)। তাঁকে আল্লাহ বলেছেন, ‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে সত্য অনুযায়ী বিচার কর এবং তোমার স্বার্থকে অনুসরণ কোরো না, কারণ তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে, কারণ তারা সত্যকে অস্বীকার করে।’ (সুরা সাদ ৩৮:২৬)। কাজেই শাসক সর্বাবস্থায় একজন সর্বশক্তিমান মহাপ্রভুর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। ফলে কোনোদিন কোনো শাসক স্বৈরাচার, উদ্ধত একনায়কে (Facist, Autocrate, Dictator) পরিণত হতে পারবে না। তারা সবাই কোর’আনে দেওয়া রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সেগুলো হচ্ছে- তারা যে কোনো কাজের আগে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে পরামর্শ করবে (সুরা শুরা ৪২:৩৮), স্বজনপ্রীতি করবে না (সুরা নিসা ৪:১৩৫), পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে না (সুরা মায়েদা ৫:৮), অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস তথা দুর্নীতি করবে না (সুরা নিসা ৪:২৯), রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে আল্লাহর আমানত হিসাবে বিবেচনা করবে (সুরা নিসা ৪:৫৮)। তওহীদভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর হুকুম ও নীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর করবে এবং কোনোভাবেই এর বিচ্যুতি ঘটতে দেবে না।

বর্তমান সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর ইতিহাস বহু পুরোনো। ব্রিটিশরা যখন যুগপৎ ছলচাতুরি ও সামরিক শক্তিবলে ভারতবর্ষ দখল করেছিল, তখন প্রশাসনিক ও সাচিবিক কাজ চালানোর জন্য তাদের প্রচুর সরকারি কর্মচারী প্রয়োজন ছিল। এত কর্মচারী ব্রিটেন থেকে আনা সম্ভব ছিল না, তাই তারা ভারতের লোকদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করল। এর উদ্দেশ্য লর্ড ম্যাকলে’র Minute on Education (১৮৩৫) নীতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, ‘এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে একটি ইংরেজি-শিক্ষিত ‘দ্বিভাষিক শ্রেণি’ (Bilingual class) তৈরি করা হবে, যারা ব্রিটিশ শাসক এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।’ যেমন আদালতে স্থানীয় লোকদের ভাষা ব্রিটিশ বিচারককে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজন পড়ত একজন দোভাষীর। তাই ব্রিটিশ সরকার ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের মূলত কর সংগ্রহ, ভূমি ব্যবস্থাপনা সেক্টরে নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের প্রশাসনিক এবং দাপ্তরিক কাজে নিযুক্ত করত। আর ব্রিটিশ-ভারত প্রশাসনে উচ্চস্তরের পদগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ১৮৫৩ সাল থেকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষা চালু করা হয়। এই পরীক্ষা নেওয়া হত লন্ডনে আর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ২২ বছর। আরো নানারকম নিয়ন্ত্রণের কারণে ভারতীয়দের পক্ষে এই পরীক্ষায় পাশ করে আইসিএস অফিসার হওয়া

ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাই সরকারের উচ্চপদ যেমন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, বিচারক, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, ডেপুটি কমিশনার, মিলিটারি ও উচ্চ সামরিক পদগুলোতে ব্রিটিশ নাগরিকদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হত। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন ভারতীয়দের উচ্চপদে প্রবেশের কিছু সুযোগ তৈরি করলেও তা ছিল সীমিত। এই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা যৎসামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই আমাদের দেশের লোকদেরকে বর্বর, মেধাশূন্য মানুষ হিসাবে ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত আচরণ করত। এমনকি ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় জনগোষ্ঠীও ব্রিটিশ প্রভুদের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদেরকে ব্রিটিশ সমাজের অংশ মনে করতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশরা যখন ভারতের শাসন শেষ করে এবং উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কাঠামো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং দেশীয় নাগরিকরা সমস্ত স্তরে প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ হওয়ার পরে এর নামই হয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)। এই ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির উৎস অনুসন্ধান করা। এটি আমাদের শাসন ব্যবস্থা এবং সামাজিক মনোভাবের একটি গভীর দিককে তুলে ধরে। ব্রিটিশ শাসনামলে আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করে ভারতে আগত ব্রিটিশ কর্মকর্তারা নিজেদেরকে ভারতীয় নেটিভদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক মনে করতেন। দেশভাগ এবং স্বাধীনতার পর সেই জায়গায় বসে পড়েন আমাদের সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তারা। সিস্টেম ও কাঠামোর এক তিল পরিমাণও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। ফলে তাদের মধ্যেও সেই একই সাহেবিয়ানা প্রকাশ পেতে থাকে। অফিসারদেরকে ‘স্যার/ম্যাডাম’ সম্বোধন করতে জনগণকে একপ্রকার বাধ্য করা হয়, আর এ নিয়ে বহু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে (প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের স্যার বলার বিধান নেই- দৈনিক যুগান্তর ১ এপ্রিল ২০২৩)। অথচ সংবিধান অনুযায়ী, সব সময়ে জনগণের সেবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। তাই জনগণকে ‘স্যার’ সম্বোধনে বাধ্য করা কতটা যৌক্তিক? তাহলে তাদের এমন বিপরীত আচরণের কারণ কী? কারণ হিসাবে কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি তো আছেই, মূল কারণ তো সেই ব্রিটিশদের মানসিক দাসসৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থা যা তাদের মননকে বস্তুবাদী জীবনদর্শনের ছাঁচে গড়ে তুলেছে। তাদের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে এই আধ্যাত্মিকতাহীন (মারেফতহীন) বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা। তাদের গন্তব্যকে শৈশবেই বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে - লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে। অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখানে

আধ্যাত্মিকতা বা চরিত্রের উৎকর্ষের কোনো শর্ত নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা জীবনের নীতি নির্ধারণে স্রষ্টা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদিকে কোনো বিবেচনায় নেয় না। এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড আল্লাহ নন। কোনো চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি তারা তাদের কোনো কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক দায়বদ্ধতা লালন করেন না। তারা দেশের আইন ও চাকুরি বিধির প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। তাই অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হাতে রাখতে পারলে বা আইনের ফাঁক ফোকর ব্যবহার করতে পারলেই তারা অর্থপিশাচে পরিণত হন। আল্লাহ তাদের সব কর্মকাণ্ড দেখছেন, তাদেরকে এর জন্য পরকালে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এমন কোনো চিন্তা তাদেরকে পুকুরচুরি করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। অথচ আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন (তিরমিজি:৬/৩১৫)। এই আমলারা কী পরিমাণ দুর্নীতি করতে সক্ষম তার উদাহরণ আমরা সাম্প্রতিক সময়ে লাভ করেছি। সেটা নিয়ে আলোচনা করে পাঠককে ক্লান্ত করাতে চাই না। আমাদের কথা হচ্ছে, তাদের এই চারিত্রিক অধঃপতনের গোড়া শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত।

যাই হোক, বাস্তবতা হলো যে কোনো দেশের প্রশাসন চালাতে সরকারি কর্মকর্তা থাকা অনিবার্য। ইসলামের প্রথম যুগে রসুলাল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলোতে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হতো। পাশাপাশি উম্মাহর জন্য তাদের ত্যাগ, ব্যক্তিগত চরিত্র, সদাচার, মো'মেনের গুণাবলি বিচার করে তাদের এসব দায়িত্ব অর্পণ করা হত। যেমন খলিফা উমরের (রা.) সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন আবু ওবায়দাহ (রা.) যাঁকে স্বয়ং আল্লাহর রসুল আমিনুল উম্মাহ বা উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দায়িত্বের প্রতি কতটা বিশ্বস্ত ছিলেন সংক্ষেপে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক ঈদের আগের দিন খলিফা উমর (রা.) এর স্ত্রী তাঁর সন্তানের জন্য ঈদের নতুন জামা কেনার আবদার জানালেন। অর্ধ পৃথিবীর খলিফা উমর বললেন, 'নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য আমার নেই।' পরে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল আবু ওবায়দাকে এক মাসের অগ্রিম বেতন চেয়ে চিঠি লিখেন। চিঠি পেয়ে আবু ওবায়দা (রা.) খুবই ব্যথিত হলেন এমনকি তিনি কান্না করলেন। কিন্তু তিনি খলিফাকে চিঠির জবাবে অগ্রীম বেতন দেওয়ার বিষয়ে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন! আগামী মাসের অগ্রিম বেতন বরাদ্দের জন্য আপনাকে দুটি বিষয়ে ফয়সালা দিতে হবে- আগামী মাস পর্যন্ত আপনি বেঁচে থাকবেন কি-না?

আর বেঁচে থাকলেও দেশের জনসাধারণ আপনাকে আগামী এক মাস খেলাফতের দায়িত্বে বহাল রাখবেন কি-না?

খলিফা উমর (রা.) আবু ওবায়দার (রা.) চিঠি পড়ে এর কোনো জবাব দিলেন না। শুধু দু'হাত তুলে আবু ওবায়দার (রা.) মত এমন একজন যোগ্য ব্যক্তিকে জাতির বায়তুল মালের রক্ষক করার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানালেন। (ফাতহুল বারি, তাবারি)।

বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪২ জন সাহাবি রসুলাল্লাহর কাতেবে ওহি (Scribes of revelation) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জায়েদ বিন সাবিত (রা.)। তারা রসুলাল্লাহর পক্ষ থেকে সরকারি চিঠিপত্র লিখে দিতেন। আবু বকরের (রা.) আমলে তিনি বিভিন্ন স্থানে লিখিত কোর'আনের পাণ্ডুলিপিগুলোকে একত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করে জায়েদ (রা.) এই দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। উসমান (রা.)-এর শাসনামলে বায়তুল মাল (অর্থ দপ্তর) পরিচালনার জন্য আলাদা হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা হয়, যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আলী (রা.)-এর আমলে, তিনি একজন দক্ষ বিচারক হিসেবে কাজ করতেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন। উমর (রা.) শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে (রা.) মদিনার বাজার নিয়ন্ত্রক (Market Controller) এবং সামারা বিনতে নাহিক-কে (রা.) মক্কার 'বাজার নিয়ন্ত্রক' পদে নিয়োগ দেন। উমর (রা.)-এর আমলে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রাগারের জন্য পৃথক বিভাগ গঠিত হয়, যা সামরিক ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করত। রুফায়দাহ (রা.) চিকিৎসা সেবা ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের যত্নের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দক্ষতা ও চরিত্রের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে অনেক অমুসলিম নাগরিকও সরকারি বিভাগগুলোতে নিয়োগলাভ করেছেন। যেমন উমরের (রা.) সময় সিরিয়ার দামেস্কে জাবাল নামে একজন খ্রিষ্টানকে হিসাবরক্ষণের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল।

আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির ভৃত্য স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই

দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বোখারি ও মুসলিম)।

অন্যায় সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সব ধরনের সুবিধা ও আর্থিক লেনদেনকেই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত করে ইসলাম। তা যে নামেই প্রচলিত থাকুক না কেন। রসুলাল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। কাজ শেষে তিনি ফিরে এসে কিছু দ্রব্য আলাদা করে বলেন, 'এটা বায়তুল মালের সম্পদ এবং এটি আমাকে হাদিয়া (উপহার) দেওয়া হয়েছে।' রসুলাল্লাহ (সা.) তখন মিম্বরে উঠে বললেন, 'এক ব্যক্তি বলছে যে এই সম্পদ তাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না, তখন দেখতে পেত, কেউ তাকে হাদিয়া দেয় কি না! আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, সে যদি কোনো জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন তা নিজের ঘাড়ে বহন করবে।' (সহীহ বুখারি ৬৯৪৭, সহীহ মুসলিম ১৮৩২)।

আমাদের দেশের সরকারি কর্মকর্তাদেরকে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের মানসিক দাসত্ব থেকে বের করে আনতে হবে। তারা যেন প্রকৃতপক্ষেই জনগণের সেবক হন ও মানুষের ভালোবাসা লাভ করেন, সরকারি দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে যেন আখেরাতেও পুরস্কৃত হন এ ধরনেরই একটি সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা সাজানোর প্রস্তাব আমরা করছি। স্বভাবতই সাচিবিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি শক্তিশালী সেক্রেটারিয়েট থাকবে। এই ব্যবস্থার নীতিগুলো হবে এমন-

০১. **উদ্দেশ্য:** সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্য হবে প্রশাসনিক কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা। তাদের মনে রাখতে হবে, তারা জনগণের প্রভু নন, বরং জনগণের সেবক। তারা এমন একটি জাতির দায়িত্ব নিয়েছেন যে জাতির অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত, ক্ষুধার্ত, অস্থিচর্মসার, কৃষক ও শ্রমজীবী। তাদেরই রক্তপানি করা খাজনা ও করের টাকায় কর্মকর্তাদের বেতন চলে। তাই ব্রিটিশ সাহেবদের মত রাজকীয় জীবনযাপন তাদের মানায় না।

০২. **চরিত্র:** এখানে যারা কাজ করবেন তাদেরকে শুধু দুনিয়াবি জ্ঞানের অধিকারী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী হলে চলবে না বরং তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। তাদের বিশ্ব পরিস্থিতি, আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে জানাশোনা যেমন থাকতে হবে, তেমনি তাদেরকে সচেতন হতে হবে দেশের সংস্কৃতি ও মানুষের চাহিদা সম্পর্কে। এগুলো হচ্ছে তাদের জাগতিক জ্ঞানের পরিসীমা। সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্যই চারিত্রিক মানদণ্ডেও উত্তীর্ণ হতে হবে এবং

সেটা যাচাইয়ে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে। চরিত্রের মাপকাঠি হচ্ছে তারা হবেন মুত্তাকি, সত্যবাদী, আমানতদার ও ওয়াদা রক্ষাকারী।

০৩. **প্রশিক্ষণ:** নির্বাচিত তরুণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক কার্যক্রম, মাঠপর্যায়ে কাজ করার দক্ষতা, নেতৃত্ব প্রদানের কৌশল, বক্তব্য প্রদান ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, যোগাযোগে পারদর্শিতা, সংকট মোকাবিলার কৌশল এবং সর্বোপরি নৈতিকতা ও জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতা। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও বিষয়বস্তু পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের কাঠামো তৈরি করা হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক লক্ষ্য অনুযায়ী নতুন বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

০৪. **সুযোগ সুবিধা:** তাদেরকে রাষ্ট্র থেকে সেবার বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য হারে এবং সমতার ভিত্তিতে সম্মানজনক জীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। তাদেরকে দেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পোষ্যানুপাতে বেতন, বোনাস, পেনশন, বাসস্থান, যাতায়াত, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

০৫. **জবাবদিহিতা ও শাস্তি:** ঘুষ, দুর্নীতি, ক্ষমতা ও প্রকল্পের অর্থের অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, মিথ্যা তথ্য প্রদানসহ যেকোনো অনৈতিক ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণ নাগরিকদের মতোই একই ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হবেন। সরকারি কর্মকর্তা হওয়ার কারণে তারা কোনো বাড়তি আইনি সুবিধা পাবেন না, বরং তাদের উপর আরও বেশি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার দায় আরোপিত থাকবে।

০৬. অবৈতনিক সেবা: বিনা বেতন-ভাতায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেবা দিতে আগ্রহীদের মধ্য থেকে যোগ্যতা অনুপাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিধান থাকবে।

রাজনৈতিক দল (Political Parties)

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে হাজার হাজার, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রম করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে ধর্মীয় বিধান দিয়েই মানুষের জীবন পরিচালিত হয়েছে। আমাদের এই ভারতবর্ষেও সুপ্রাচীন কাল থেকে রাজারা শাস্ত্র দিয়েই রাজ্য পরিচালনা করেছেন। ফেরাউন, নমরুদের মতো স্বৈরশাসকদেরকেও ধর্মের নাম দিয়েই রাজ্য চালাতে হয়েছে, পুরোহিত ধর্মযাজকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখতে হয়েছে, কারণ ধর্মের প্রতি একপ্রকার সামাজিক আনুগত্য ছিল, সে ধর্ম সঠিক বা বিকৃত যেটাই হোক না কেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা পশ্চিমা সভ্যতা থেকে যে রাজনৈতিক দর্শন আমদানি করে আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছি, সেখানে তাত্ত্বিকভাবে ধর্মের জায়গাটা নিতান্তই গুরুত্বহীন। এই রাজনৈতিক দর্শনের নামই দেওয়া হয়েছে সেক্যুলারিজম যার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা। এর তাৎপর্য হল, ধর্মের কোনো বিধান রাজনৈতিক জীবনে গৃহীত হবে না, রাষ্ট্রের উপর ধর্মের হস্তক্ষেপ চলবে না। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিষয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও অতি ব্যবহারে সেক্যুলার শব্দটি বিতর্কিত হয়ে যাওয়ায় ইদানীং অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শব্দটিকে রাজনৈতিক বয়ানে আমদানি করা হয়েছে। অনেকেই দাবি করছেন 'ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ' চাই, অর্থাৎ সবাই মিলেমিশে দেশ চালানোর কাজে অংশ নেবে এমন একটি ব্যবস্থা তারা আশা করছেন। কিন্তু সেটা কীভাবে? ধর্মকে বাদ দিয়ে অথবা ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে সীমিত করার ইতিহাস মানুষের সুদীর্ঘ অতীতের ইতিহাসে খুবই বিরল। অনেকে বলতে পারেন, প্রাচীন গ্রিসে তো এটা হয়েছে। হ্যাঁ, আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিকরা গণতন্ত্র নিয়ে যে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা ছিল ক্ষণস্থায়ী ও অতি ছোট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেটাও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে করা হয়েছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং তখনকার দিনের শিল্প, দেব-দেবীর মূর্তির, মন্দিরের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে ধর্মের শক্তিশালী প্রভাবই পাওয়া যায়। যদি ধরেও নেয়া যায় যে গণতন্ত্রের ঐ পরীক্ষা ধর্ম-নিরপেক্ষ ছিল, তা হলেও তা মানুষের হাজার হাজার বছরের ধর্মের ইতিহাসে এক ফোটার বেশি জায়গা নিতে পারে না। প্রায় ৫ম শতাব্দী খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে নাগরিকরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। সেই উদাহরণ টেনেই পশ্চিমা সভ্যতা বিশ্বজুড়ে

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। গ্রিসের দার্শনিক প্লেটোর রচিত ‘দ্য রিপাবলিক’ এবং অ্যারিস্টটলের ‘পলিটিক্স’ বইগুলো পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিমূলক লেখা হিসেবে বিবেচিত হয়। **যদিও প্লেটো নিজেই বলে গেছেন, গণতন্ত্র হল মূর্খ এবং অযোগ্যদের শাসনব্যবস্থা।**

খ্রিষ্টধর্মের মূল শিক্ষায় মানবতার উন্নতি, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর জোর দেওয়া হলেও এতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট আইন, দণ্ডবিধি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বর্ণিত নেই। ফলে মধ্যযুগে যখন ইউরোপে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ভূমিকা ব্যাপক ছিল, তখন ধর্মযাজকরা তাদের মনগড়া বিধানকে ঐশ্বরিক আইন বলে চাপিয়ে দিত। তারা রাজাসহ জনগণের উপর ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তৃত্ব খাটাতো। এসব কারণে গির্জা ও রাজতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যা শত শত বছর ধরে চলে আসছিল, যা এক সময় মারাত্মক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকটে রূপ নেয়। ১৫৩৪ সালে, ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি গির্জার আধিপত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে গৃহীত অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি আইনটি প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান হিসেবে পোপের পরিবর্তে রাজাকেই ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তীতে, ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, লিবারেলিজম, ফ্যাসিবাদ এবং অ্যানার্কিজমের মতো মতবাদের উত্থান ঘটে। এসব মতবাদ ১৭শ থেকে ২০শ শতকের মধ্যে ধীরে ধীরে রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী এনলাইটেনমেন্টের যুগে বিকশিত হয়। এই মতবাদগুলির ভিত্তিতে ১৮ শতকের শেষ এবং ১৯ শতকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের দাবি প্রবল হয়ে উঠায় এ সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য পশ্চিমা দেশে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের (Absolute Monarchy) পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (Constitutional Monarchy) ধারণা গড়ে ওঠে। ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, গণতান্ত্রিক নীতির উপর রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। ১৬৭৮ সালে অ্যাডাম স্মিথ এর নেতৃত্বে হুইগ পার্টি গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে লিবারেল পার্টি হিসেবে পরিচিতি পায়। একইভাবে, ১৭৮৩ সালে এডমন্ড বার্ক এর নেতৃত্বে টোরি পার্টি গঠিত হয়, যা পরে কনজার্ভেটিভ পার্টি হিসেবে পরিচিতি পায়। এই দুটো রাজনৈতিক দল এখনও ব্রিটেনে প্রভাবশালী ও সক্রিয়। ওদিকে আমেরিকায় ১৮ শতকের শেষে ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক দুটি বড় দলের আবির্ভাব ঘটে- আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের নেতৃত্বে ফেডারালিস্ট পার্টি (১৭৮৭ খ্রি.) এবং

থমাস জেফারসন ও জেমস ম্যাডিসনের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক-রিপাবলিকান পার্টি (১৭৯২ খ্রি.)।

ইতোমধ্যে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটে, যা ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিগন্ত খুলে দেয়। স্টিম ইঞ্জিনসহ নানা নতুন উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে সেখানে প্রচুর শিল্পকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। এর ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের আড়ালে সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য আফ্রিকা, এশিয়া এবং মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, উন্নত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রযুক্তির আধিপত্য তাদের সামরিক শক্তিকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৮শ এবং ১৯শ শতকে, ইউরোপীয় শক্তিগুলি মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে উপনিবেশে পরিণত করে, যেমন ভারতবর্ষ, মিসর, অটোমান সাম্রাজ্যের কিছু অঞ্চল এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল। বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, যা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। তারা এসব এলাকায় তাদের তৈরি আইন, শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন করে। উপনিবেশযুগে ইউরোপীয় প্রভুদের উদ্দেশ্য কখনোই জনকল্যাণ সাধন করা ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল এসব ভূখণ্ডের সম্পদ শোষণ করা। এভাবে তারা প্রায় সাড়ে চারশ বছর ধরে (১৫০০-১৯৫০) অন্যের সম্পদ লুট করে বর্তমানে বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশরা শোষণ করেছে ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারাবিয়ান দীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, হংকং। ফরাসিরা শোষণ করেছে পশ্চিম আফ্রিকা, ইন্দোচীন। স্প্যানিশরা শোষণ করেছে লাতিন আমেরিকা, মেক্সিকো। পর্তুগিজরা শোষণ করেছে ব্রাজিল ও আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ। ডাচরা শোষণ করেছে ইন্দোনেশিয়া, সুরিনাম এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কিছু দ্বীপ। আমরা পড়েছিলাম ব্রিটিশদের ভাগে।

ভারতবর্ষ তদানীন্তন অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার মতো কোনো অসভ্য বা বন্য সমাজের দেশ ছিল না, এটি ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। ১৬০০ সালে যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসে, তখন উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করছিল। সে সময় মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত, শক্তিশালী ও সুসংহত। ব্রিটিশরা আসার পর থেকে তারা জুলিয়াস সিজারের মত ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম - Veni, Vidi, Vici’ - এরকম কোনো সহজ বিজয় অর্জন করেনি। কারণ ভারতের সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা তাদের চেয়েও অনেক উন্নত ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুরুতে ভারতের শাসকদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং এই সময় পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তবে

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি থেকে সুবিধা নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্যিক ও সামরিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে থাকে। ব্রিটিশরা যখন সামরিক শক্তি প্রদর্শন শুরু করল, তখনই তারা স্থানীয় রাজাদের দ্বারা প্রবল বাধার মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে ছত্রপতি শিবাজির উত্তরসূরী মারাঠারা, রাজপুত রাজারা, বাংলার নবাবেরা, মহিশুর, সিকিম, অহোম রাজ্যের রাজারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাদের সামরিক শক্তি এবং প্রভাব বিস্তারে বাধা দেন। ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে তাদের বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করার মাধ্যমে তারা বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরপর আরও এক শতাব্দী ধরে ব্রিটিশরা তাদের শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ ও দখল পক্রিয়া চালিয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচয়ে বড় সশস্ত্র প্রতিরোধ। এরপর আরো ৯০ বছর তারা ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করে। কিন্তু এই পুরো সময়টাতে তাদেরকে ক্রমাগত ভাবে ভারতীয়দের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ঐতিহাসিক মুজাহিদ আন্দোলনের (১৮২০-১৮৪০) মধ্যবর্তীকালে বালাকোটের যুদ্ধ (১৮৩১), ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৭০-১৮০৬), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮২৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৬), কৃষক বিদ্রোহ (১৮৬০-১৯০০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) এবং আরও বহু আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা করেছে। এইসব সংগ্রামের মধ্যে বাঙালিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী মতাদর্শ প্রচার, লেখালেখি থেকে শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তি, অস্ত্রাগার লুট, বোমা বিস্ফোরণ, ইংরেজ কর্মকর্তা হত্যা পর্যন্ত করেছেন। হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবী এই সংগ্রামে অংশ নিয়ে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা জেল খেটেছেন, দ্বীপান্তরে গেছেন, গুলি খেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন, এমনকি হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলেছেন। তাদেরকে দমন করতে ব্রিটিশরা নানা ধরনের নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য তারা বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দিত, তাদের লাশ রাস্তা ও শহরের গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখত, কামানের মুখে বেঁধে গোলা মেরে তাদের শরীর ছিন্নভিন্ন করে দিত, আর বিচারবহির্ভূত হত্যার তো কোনো ইয়ত্তা ছিল না। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ব্রিটিশ বাহিনী অতর্কিতভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অন্তত ১,০০০ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে

হত্যা করে। আহত হয় হাজার হাজার মানুষ। পরবর্তীতে তারা শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে অস্থিরতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ব্রিটিশরা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্য তাদের শাসনের জন্য একটি বড় হুমকি। তারা পরিকল্পিতভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করে। তাদের দেশে যেভাবে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটেছে সেটার অনুকরণে এদেশেও তারা রাজনৈতিক দল গঠনের উৎসাহ দেন। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামে একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের উদ্যোগে ১৮৮৫ সনে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, এই অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (আইসিএস) একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই দলের মাধ্যমে ভারতীয়রা তাদের রাজনৈতিক মতামত ও দাবিদাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে অহিংস উপায়ে পেশ করার সুযোগ লাভ করে। ব্রিটিশদের ডিভাইড এন্ড রুল নীতি ও বৈষম্যমূলক প্রশাসনিক পদক্ষেপের কারণে ভূতপূর্ব শাসক মুসলিমরা শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি সবদিকে সহ-নাগরিক হিন্দুদের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসও শুরুতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করলেও এটি ক্রমশ উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দখলে চলে যায়। তখন মুসলমানরা একে তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি হিসেবে দেখতে শুরু করে। তাই মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯০৬ সালে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম নেতা এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সহযোগিতায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশরা আইনসভায় ভারতীয়দের মতামত নিত, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ব্রিটিশদের হাতে। তাই এই রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে আইনের মধ্যে থেকে বাস্তবিক কোনো শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করা কঠিন ছিল। প্রকৃত অর্থে এই রাজনৈতিক দলগুলো ছিল সুদৃশ্য 'হাওয়াই মিঠাই' যা চতুর ব্রিটিশরা ভারতীয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল আর তাদেরকে রাজনীতি নামক একটি গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকিয়ে অন্তবিহীন পথ খোঁজায় ব্যস্ত করে দিয়েছিল। এই ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটি ছিল চিন্তা-চেতনায়, মনে মগজে পুরোদস্তুর ব্রিটিশ, কেবল চামড়ার রঙে (Complexion) ভারতীয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তাদের যে কার্যক্রম ছিল তা সবই ছিল মূলত ব্রিটিশ শাসনকে বজায় রাখা ও তাকে মজবুত করার কৌশল। এই রাজনৈতিক

দলগুলোকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি বলা হলেও ব্রিটিশরা তাদের মাধ্যমে ভারতীয়দেরকে শাসন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়, যা তাদের রাজত্বকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। একই ঢিলে মরেছিল আরো অনেকগুলো পাখি। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দেরকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে বৈধতা দিয়ে জনগণের মনোযোগ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যারা সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদেরকে শিক্ষিত সমাজ ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। ভগৎ সিং, সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দু ঘোষ, বাঘা যতীন প্রমুখ বিপ্লবীরা যে দলগুলোতে সক্রিয় ছিলেন সেই দলের নেতাকর্মীরাও অনেকে মনে করলেন, আইনসভায় জায়গা পেলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধীরে ধীরে তারা ভারতের শাসনক্ষমতা লাভ করবেন। এ কারণে অনেক বিপ্লবী তাদের আগের সহিংস পথ ত্যাগ করেন। এভাবে রাজনৈতিক দল গঠনের এ সিদ্ধান্ত ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশকে আরো পঞ্চাশ বছর টিকিয়ে দেয়। এরই মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস ও ঘৃণা প্রকট আকার ধারণ করে। উভয় সম্প্রদায়ের কট্টরপন্থী অংশ দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে যা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগে গড়ায়।

যাহোক, এবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রসঙ্গে আসি। ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল তাদের সযত্নে গড়ে তোলা সেই অনুগত রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দিয়ে গেল। ভারতে সরকার গঠন করল কংগ্রেস আর পাকিস্তানে মুসলিম লীগ। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ ভেঙে জন্ম নিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ', যা পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম নিয়ে সম্পূর্ণরূপে সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধারণ করে। মাও সেতুং ও কার্ল মার্ক্সের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৪৮ সালে গঠন হয় বাংলাদেশের প্রথম বাম দল 'কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (CPB)' এবং পরে ১৯৫১ সালে গঠন হয় 'বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)'। ১৯৪১ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামি' দেশবিভাগের পর মুসলিম প্রধান পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও চেতনা নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP)। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় ১৯৮০ এর দশকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং এ সময় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় পার্টি। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত মোট রাজনৈতিক দলের

সংখ্যা ৪৮টি হলেও, এদেশে সত্যিকার অর্থে দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা বিরাজমান। এখানে প্রধান দুই দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) পালাক্রমে দেশ শাসন করে থাকে।

গত এক শতাব্দী ধরে বিকশিত হতে হতে এই রাজনৈতিক দলগুলো প্রত্যেকে একেকটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘিরে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে। রাজনীতি করার অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার [বাংলাদেশ সংবিধানের অনুছেদ ৩৯] ও মানবাধিকার [জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৪৮, ধারা ২১(১)] এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা দখল, সরকারের অন্যায় বিরোধিতা, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সহিংসতা, বিরোধী দলের উপর দমন-পীড়ন, হরতাল অবরোধের নামে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি, ভোট কারচুপি ও নেতাদের নৈতিক অবক্ষয়ের মতো নানা কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপকভাবে বিতর্কিত। তারা জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর জন্মের প্রেক্ষাপট, নেতৃত্বের ধারা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কৌশল, নীতি ও আদর্শ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি ও ভোটার আচরণ, বৈদেশিক সম্পর্ক ও অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা প্রায় সবাই হয় কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগ মডেলের অনুসরণ করছে। এমনকি বাম দলগুলোও অনেকাংশে তা-ই করছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক দলের কোনো উল্লেখ নেই, তাই রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান নয়। বর্তমানের বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর গণ-রাজনৈতিক ও জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে; তারা প্রকৃতপক্ষে দলীয় রাজনীতি যেমন, পরিবারতন্ত্র ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, মনোনয়ন বাণিজ্য, পদের জন্য লেনদেন ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে ব্যস্ত। নির্বাচনকালীন মিথ্যা ওয়াদা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও হামলা এমনকি খুন, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ভোটচুরি, কেন্দ্রদখল, বাক্স ছিনতাই, ভোটের জন্য দুর্বল লোকদের হুমকি-ধামকি, মিছিল-মিটিংয়ে লোকবল ভাড়া ইত্যাদি কাজের জন্য ক্যাডার বাহিনী লালন ও তাদেরকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিতে মদদ দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোতে সাধারণ ব্যাপার। দলগুলোর ভেতরে ক্ষমতা দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রায়শই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো এখন রাখঢাকের ব্যাপার নয়; এটাই আমাদের রাজনীতির বাস্তবতা। রাজনীতি এখন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে যে নেতা টিনের ঘরে থাকতেন, পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি হয়ে যান হাজার কোটি

টাকার মালিক। জনগণ মন্দের ভালো দলটিকে বেছে নেওয়ার জন্য পঞ্চবার্ষিকী ভোটাভোটির বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এখন যদি আধুনিক ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করার চিন্তা করা হয় তবে রাজনৈতিক দলগুলোকে যা খুশি তা করার লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। অতীতে অনেক রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থ বা নির্দিষ্ট ইস্যুতে আন্দোলন করে দেশ বা সমাজের ক্ষতিসাধন করেছে। তাই রাজনৈতিক অধিকারের নামে দেশের ক্ষতি করার সুযোগ কাউকে দেওয়া যাবে না। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কোনোটা ভারতপ্রেমী, কোনোটা ভারতবিদ্বেষী, কোনোটা ধর্মনিরপেক্ষ, কোনোটা বামপন্থী, কোনোটা ধর্মভিত্তিক। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন কোনো সুযোগ নেই, যেখানে বিভিন্ন আদর্শের দল গঠন করা যাবে এবং বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যাবে। রসুলাল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবিরা কখনোই নানামুখী আদর্শের উপর রাজনৈতিক দল গঠন করেননি। বরং মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম, আউস, খাজরাজের আটটি গোত্র, সেগুলোর অধীনে আরো তেত্রিশটি গোত্র এবং তিনটি ইহুদি গোত্র বনি কুরায়জা, বনি নাজির, বনি কাইনুকা ও তাদের অধীনে আরো বিশটি ছোট গোত্রকেও এক জাতিভুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বাদ-মতবাদ, সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শসহ সকল বিভেদের প্রাচীর ভেঙে মানুষকে এক জাতিভুক্ত হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা।

শত শত বছর থেকে ইসলামকে 'ব্যক্তিগত ধর্ম' হিসাবে পালন করার কারণে ইসলামের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা কালের গর্ভে একপ্রকার হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্র ও নির্বাচনের যে রোডম্যাপ পশ্চিমা প্রভুরা রেখে গেছেন, ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি সেটার সঙ্গে খাপ খায় না। তবু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একদল ইসলামি পণ্ডিত ইসলামকে জোর করে গণতন্ত্রের মডেলের সাথে খাপ খাওয়াতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং গত শতাব্দী থেকে তারা ইসলামের এরকম একটি রাজনৈতিক ব্যাখ্যা (Narrative) দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। তারা আবিষ্কার করেছেন 'গণতান্ত্রিক ইসলামী দল'। তাদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আল্লাহর রসুল সারাজীবন রাজনীতি করেছেন। তারা রসুলাল্লাহর জেহাদ বা সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে মেলাচ্ছেন। তারা বলছেন যে এই যুগে নির্বাচনই হচ্ছে জেহাদ, আর ইসলামী দলের ব্যালট পেপার হচ্ছে জান্নাতের টিকেট। তাদের বয়ান মোতাবেক প্রকৃতপক্ষে ইসলামই হচ্ছে সবচেয়ে 'গণতান্ত্রিক' ধর্ম। ইসলামের ইতিহাসকেও তারা সেভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন উমর (রা.)-এর শাসনে 'শুরা' বা পরামর্শ সভা ছিল এবং শাসক সিদ্ধান্ত নিতেন

তবে জনগণের মতামতও নিতেন। সুতরাং উমর (রা.) গণতান্ত্রিক ছিলেন! আবার রসুলাল্লাহর (সা.) ওফাতের পর আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন সাধারণ জনগণের মনোনয়নের ভিত্তিতে, কাজেই এ তো গণতন্ত্রেরই তদানীন্তন রূপ!

বিষয়টি আসলে মোটেও এমন নয়। গণতন্ত্রের সূচক বা মাত্রা (Parameter) হল- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা, ক্ষমতার ভারসাম্য, সরকারের জবাবদিহিতা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ, নারী-পুরুষের সম অধিকার, শক্তিশালী সাংবিধানিক কাঠামো, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সম-বণ্টন ইত্যাদি। বাস্তব অবস্থা সেই জনপ্রিয় প্রবাদের মত, গরু কেতাবে আছে কিন্তু গোয়ালে নেই। **কিন্তু আমাদের সংস্কার প্রস্তাবে এই সকল কিছু নিশ্চিত করার জন্য এমন একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি যেখানে নানা মতবাদের উপর জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দল তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না।** জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কোনো কর্মসূচিও দেওয়া যাবে না। সবাইকে রাষ্ট্রের মূল আদর্শের প্রতি অনুগত থেকে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার দেওয়া হবে। ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের নামে জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। যদি গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে এসব করতে দেওয়া হয় তাহলে গরু চিরকাল কেতাবেই থেকে যাবে।

ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা আল্লাহর দেওয়া নীতি ও পদ্ধতিতে এই প্রতিটি বিষয় নিশ্চিত করতে সক্ষম। ইসলামের ইতিহাস তার প্রমাণ। বরং অন্য কোনো ব্যবস্থায় এই মাত্রাগুলো কোনোদিন অর্জন করা সম্ভবই হয়নি। তাই শান্তির আশায় মানুষ বারবার ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে। রাজতন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, সেখান থেকে কমিউনিজম, সেখান থেকে ফ্যাসিজম, আবার সেখান থেকে গণতন্ত্র, সেখান থেকে আবার ফ্যাসিজম। এভাবেই চলছে আমাদের রাজনৈতিক জীবন, বাস্তবে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। মানুষ কেবল ফুটন্ত কড়াই থেকে লাফ দিয়ে বাঁচতে গিয়ে জ্বলন্ত চুলার মধ্যে পড়েছে। আমাদের চর্চিত গণতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, দুর্নীতি, একনায়কতন্ত্রের প্রবণতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আমাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করছি এবং একে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

০১. **রাজনৈতিক দলাদলি নিষিদ্ধঃ** বর্তমানে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুদলীয় রাজনীতি। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থী, ডানপন্থী, মধ্যপন্থী মতবাদ বা যে কোনো অধিকার আদায়ের আন্দোলন

করতে গিয়ে গড়ে তোলা এই রাজনৈতিক দলগুলো সারাবছর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদে লিপ্ত থাকে যা প্রায়ই রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করে। আমাদের দেশের বিগত অর্ধ শতাব্দীতে এটাই ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতা যা আমাদের জাতিকে রাজধানী থেকে পাড়া-মহল্লা পর্যন্ত, সংসদ থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। হাজারো সংলাপ, টকশো, হিতোপদেশ, আইন-কানুন রচনা করেও এই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো প্রকার সম্প্রীতি সংহতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই রাজনীতি স্বার্থের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য নয়। এই পরম সত্য উপলব্ধি করে আমরা এই প্রস্তাবনা দিচ্ছি যে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমাদেরকে আপাতত রাজনৈতিক দলাদলি বন্ধ করতে হবে, এই রাজনীতিও বন্ধ করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ ফেরকার ভিত্তিতে ঐক্যনষ্টকারী সংগঠন করারও অনুমতি থাকবে না। বহুদলীয় রাজনীতি ইসলামের ঐক্য চেতনার পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বাদ-মতবাদ, সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শসহ সকল বিভেদের প্রাচীর ভেঙে মানুষকে এক জাতিভুক্ত হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা। আল্লাহ চান, মো'মেনরা যেন গলিত সীসার মত নিচ্ছিদ্র ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তোলে (সুরা সফ ৬১:৪), ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (তওহীদ) ধারণ করে (সুরা ইমরান ৩:১০৩)। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জাতির ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করে এমন রাজনৈতিক বা ইস্যুভিত্তিক দলাদলির কোনো সুযোগ থাকবে না।

০২. **সামাজিক দায়িত্ব পালন:** রাষ্ট্রের মূলনীতি অর্থাৎ তওহীদভিত্তিক ঐক্যচেতনার প্রতি সম্মান ও আনুগত্য বজায় রেখে রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে জনগণের সমস্যাদি তুলে ধরার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরির অনুমতি থাকবে। তবে কোনো সংগঠন যদি মিথ্যা প্রচার, গুজব বা বিভ্রান্তিকর ইস্যু তৈরি করে জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাদেরকে সে কাজ করতে দেওয়া হবে না।

০৩. **জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি:** রাজনৈতিক অধিকারের নামে কিংবা বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের নামে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারী এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, রাস্তা আটকিয়ে সমাবেশ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

বিচারব্যবস্থা (Judiciary)

আমাদেরকে অবশ্যম্ভাবীরূপে ঔপনিবেশিক যুগের অন্ধ অনুকরণকারী শোষণমূলক, বৈষম্যমূলক বিচারব্যবস্থা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা মানুষের তৈরি বিচারব্যবস্থা, তাই এর মধ্যে ত্রুটি বা গলদ রয়েছে আর সেগুলোর সংশোধনের জন্য কথা বলা মানে আদালত অবমাননা নয়। আমরা নতুন যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি সেখানে আল্লাহর হুকুমই হবে চূড়ান্ত, তাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি বিচারপদ্ধতি ও আইন-কানুন সবই সংস্কারের আওতায় আসবে আর যেগুলো আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা বাদ যাবে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে জনগোষ্ঠীর উপরে বিচারব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস, আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিশীল না হলে বিচারব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হবে। উদাহরণ: এদেশের নব্বই ভাগ মানুষ জানে যে আল্লাহর বিধানে চুরির শাস্তি কী? তারা কোর'আন পড়ে, এই আয়াতও পড়ে, তারা এই বিধানও জানে (সুরা মায়েদা ৫:৩৮)। তারা এটাও জানে যে আল্লাহর বিধান মানা তাদের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক। তারা এটাও জানে যে আল্লাহর কেতাবের কিছু মানা আর কিছু না মানাকে বলা হয় শেরক বা অংশীবাদ যা ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ (সুরা বাকারা ২:৮৫, সুরা নিসা ৪:৪৮)। **কিন্তু আদালতে গিয়ে যখন তারা দেখে যে সেখানে ব্রিটিশের তৈরি আইন দিয়ে বিচার হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। একদিকে আল্লাহর ভয়, আরেকদিকে সরকারের ভয়। এই উভয়সংকট যখন আসে তখন তারা আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ বিধান মানতে পারে না।** ঐ আইনের প্রতি, এমনকি রাষ্ট্রের প্রতিও হৃদয় থেকে শ্রদ্ধা থাকে না, কেবল ভয় থাকে। কাজেই যে জনগোষ্ঠীর উপর বিচার প্রয়োগ করা হবে, সেই জনগোষ্ঠীর আইন মানার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। এখানে সুদভিত্তিক অর্থনীতির প্রসঙ্গও উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব, বিচারপতিদের দলীয়করণ, বিচারপতি নিয়োগ ও বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো, লক্ষ লক্ষ মামলার জট, হয়রানিমূলক ও মিথ্যা মামলার দৌরাত্ম, মামলা পরিচালনার সীমাহীন ব্যয়ভার ইত্যাদি সমস্যা ন্যায়বিচার লাভের পথে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি

করেছে। ইসলামে বিচার বিভাগ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বিচার প্রক্রিয়ার মানদণ্ড হবে আল্লাহর দেওয়া বিধান। আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন সে হুকুম বিচার বিভাগে বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলে ন্যায়বিচার পাবে। বিচার প্রক্রিয়ার কোনো ধাপে বিচারপ্রার্থীকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। বিচার পাওয়া জনগণের অধিকার আর ন্যায় প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কাজেই উকিলের পেছনে অর্থ ব্যয়সহ বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে যেভাবে এখন কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করতে হয় তার কিছুই করতে হবে না। ইসলামের শাসনামলে 'উকিল' (lawyer) বলে আলাদা কোনো পেশাই ছিল না। তবে বিচারিক প্রক্রিয়ায় যেকোনো ব্যক্তি আদালতে নিজের পক্ষে বা অন্যের পক্ষ থেকে কথা বলতে পারত। এই ধরনের প্রতিনিধি বা পরামর্শদাতা বিচারকের অনুমোদন নিয়ে বিচার কার্যক্রমে অংশ নিতেন। **নিয়ম হচ্ছে বাদীই বিচারকের সামনে তার অভিযোগ তুলে ধরবেন। যা ঘটেছে তা-ই যদি তিনি তুলে ধরেন তাহলে উকিলের প্রয়োজন কী?** আইনি পরামর্শের জন্য সরকারি আইনজীবী থাকবেন। কেবল কারও রায়ে যদি শাস্তিস্বরূপ অর্থদণ্ড দেওয়া হয় তখন তাকে সেই অর্থ পরিশোধ করতে হবে, আর সেই অর্থ পাবে বাদী। বিচারব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং সেই সম্পদ বিচারকদের হাতে তুলে দিও না যেন তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের সম্পদ গোপনে গ্রাস করতে পারো।' (সুরা বাকারা ২:১৮৮)। বর্তমানে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও সংস্কার সাধনের জন্য কমিশন গঠন (Commission on Judicial Reforms) ও আলাদা সচিবালয় স্থাপনসহ নানা প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে (দেখুন: প্রথম আলো- ২৭ অক্টোবর ২০২৪: প্রধান বিচারপতির উদ্যোগ - বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনের প্রস্তাব পাঠানো হলো আইন মন্ত্রণালয়ে)। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, বিচারব্যবস্থার বুনিয়াদি পরিবর্তন না করলে এ ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন কোনো সুফল বয়ে আনবে না।

আমাদের প্রস্তাবিত বিচারব্যবস্থায় পুরো দেশকে যত বেশি সম্ভব প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করা হবে এবং বিকেন্দ্রিকরণ করা হতে পারে। যেমন বর্তমানের প্রতিটি ইউনিয়ন একটি ইউনিট। প্রতিটি ইউনিটে জুমা মসজিদ থাকবে এবং আদালত থাকবে। সেই মসজিদগুলো বর্তমানের মত সংকীর্ণ কোনো ভবন নয়, সেটা হবে বড় একটি মসজিদ কমপ্লেক্স। আদালতে সপ্তাহজুড়ে কাজিরা বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। গুরুতর অপরাধের শাস্তি কার্যকর করা হবে জুমার দিন। এভাবে অধিকাংশ মামলা স্থানীয় পর্যায়ে সালিশি পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, যার ঐতিহ্য ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। স্থানীয় পর্যায়ে মামলা নিষ্পত্তি হলে বেশ কিছু

সুবিধা আছে। যেমন এখানে সবাই সবার চেনাজানা। তাই উপস্থিত প্রায় সকলেই অভিযোগ শুনেই অনেকটা ধারণা করতে পারেন যে মামলার সত্যতা কতটুকু। এতে মিথ্যা মামলার সুযোগ বলতে গেলে থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে বাদী-বিবাদী বা স্বাক্ষীদেরকে বিচারক বা বিচার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কেউ চেনে না, পুরোটাই নির্ভর করতে হয় কাগজপত্র আর সকলের মৌখিক বয়ানের উপর। এতে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ থাকে। স্থানীয় সালিশি ব্যবস্থায় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয় এবং ন্যায়ভিত্তিক রায় দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। যার যার এলাকায় মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লক্ষ লক্ষ মামলা আসার কোনো প্রয়োজনই হবে না। সেখানে যাবে কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ও গুরুতর মামলাগুলো। বিচার করার ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নীতি হচ্ছে, 'আল্লাহ যে বিধান নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা (হুকুম) করে না, তারা কাফের, জালেম, ফাসেক।' (সুরা মায়েদা ৫:৪৪, ৪৫, ৪৭)। এ নীতি কেবল যে বিচারকদের জন্য তা নয়, এটা শাসকদের বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্ত। কারণ এই আয়াতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'হুকুম' যার অর্থ আদেশ, শাসন ইত্যাদি। এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।' (সুরা নিসা ৪:৫৮) এমনকি ইসলাম শত্রু সম্প্রদায়ের প্রতিও পক্ষপাতমুক্তভাবে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন, 'কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।' (সুরা মায়েদা ৫:৮)।

আমরা ইতিহাস থেকে জানি, **রসুলাল্লাহ (সা.) যখন সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন বছরের পর বছর আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলাই আসতো না, মামলার জট তো দূরের কথা।** আবু বকরের (রা.) খেলাফতের যুগে উমর (রা.) মদিনায় বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালে বিচারপ্রার্থী মানুষ এতটাই ন্যায়বিচার পেত যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে খুব কম সংখ্যক মামলাই আসতো। পরে আবু বকর (রা.) তাঁকে বলেন, 'তোমার কাছে তো কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে আসে না।' (মুয়াত্তা- ইবনে মালিক, তাবাকাত- ইবনে সাদ)।

বর্তমানে ইসলামের শরিয়াহ নিয়ে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে মনে করা হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে কারো হাত থাকবে না। একটি মুরগি চুরি করলেও চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। বস্তুত এটা একটি প্রোপাগান্ডা, কারণ এটা যদি সত্য হত মনে হয় আরবের ঐ সমাজে ঘরে ঘরে হাতকাটা লোক পাওয়া

যেত। কিন্তু ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। ঐতিহাসিকদের মতে, **ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সাড়ে তিনশ বছরে চুরির দায়ে হাত কাটা হয়েছে মাত্র ৬ জন ব্যক্তির** (Islam: A Misunderstood Religion by Mohammad Kutub)।

এ থেকে বোঝা যায় যে চুরি করলেই হাত কেটে দেয়া হবে ব্যাপারটি মোটেও সেরকম নয়। চুরির অভিযোগে কাউকে অভিযুক্ত করা হলে ইসলামের বিচারব্যবস্থায় একজন বিচারক প্রথমেই খতিয়ে দেখবেন যে, সেই ব্যক্তি কেন চুরি করল। তিনি তার মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করবেন। সে কি অর্থাভাবে বা খাদ্যসংকটে বাধ্য হয়ে চুরি করেছে, নাকি এটি তার স্বভাবের কারণে (Criminal Tendency) অথবা লোভের কারণে করেছে, বা সে কি এমন মানসিক রোগে আক্রান্ত যার অঢেল বিত্ত-বৈভব থাকা সত্ত্বেও চুরির নেশা রয়েছে (Kleptomania)? বিচারক আরও দেখবেন, চুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, চুরিকৃত বস্তুটি কি যথার্থ মূল্যবান এবং তা যথাযথভাবে নিরাপদ স্থানে রাখা ছিল কিনা।

যদি অভাবের তাড়নায় চুরি করতে বাধ্য হয় তবে চোরের হাত কাটা দূরে থাক, তার অভাব দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপরন্তু কেন সে অভাবের কারণে চুরি করতে বাধ্য হয়েছে, তার দায়-দায়িত্ব অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উপর বর্তাবে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেবেন। কোর'আনে আইন আছে বলেই তা সকল পরিস্থিতিতে একইভাবে কার্যকর করা যায় না, অপরাধের মাত্রা, পরিবেশ পরিস্থিতি, আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়েই বিচারক রায় প্রদান করবেন। হজরত উমর (রা.) এর শাসনামলে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দেশের দুর্ভিক্ষ দূর না হওয়া পর্যন্ত হাত কাটার বিধান স্থগিত রাখা হয়েছিল (মুয়াত্তা- ইমাম মালিক, বায়হাকি)।

কাজেই যদি সমাজে আল্লাহর আইন কার্যকর করা হয় তবে সাধারণ গরিব ও দুঃখী মানুষের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভয়ের কারণ সেই সব লোকদের যারা ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করে ঘুষ, দুর্নীতি ও পুকুর চুরি করে, জনগণের ট্যাক্সের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিতে চায়। তারা মূলত হাত কাটার ভয় দেখিয়ে জনগণকে ইসলামের শাসন থেকে দূরে রাখতে চায়। যে সকল দুর্নীতিবাজরা দেশকে লুটপাট করে দেউলিয়া বানিয়ে ফেলেছে, তারা যদি জানতো যে অবৈধ সম্পদ অর্জন করলে তাদের হাত কাটা হবে, তবে তারা আর সেই পথে যাওয়ার সাহস করত না। জনগণও তাদের ন্যায্য সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পেত। কাজেই আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হলে, মুষ্টিমেয় কিছু দুর্বৃত্তের ভয়ের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপামর জনগণের কোনো ভয় নেই; বরং তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও নিরাপত্তা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের হুকুম ও মূল্যবোধ সমাজে

প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তা মানুষের চরিত্রে এমন পরিশুদ্ধি এনে দিয়েছিল যে বহু মানুষ অপরাধ করার পর অনুতপ্ত হয়ে নিজেই এসে নিজের অপরাধের দণ্ড কামনা করত, সেটা যদি প্রাণদণ্ডও হয়। কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি, কেউ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়নি।

২০২৫ সালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ছিল দৈনিকের সংবাদ। কন্যাশিশু ধর্ষণ, বলাৎকার, দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রচুর ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকদিন। গর্ভবতী নারী, বাসের যাত্রী, গৃহিণী, পথচারী ভিক্ষুক এমনকি অশীতিপর বৃদ্ধাও এ থেকে রেহাই পায়নি। বহু শিশু ও নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে পর্যন্ত। পুলিশ সদর দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের মামলা জমা পড়েছিল ১০,৭০৪টি, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬,৮৬৭টি এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতেই মামলা হয়েছে ১,৪৪০টি। গড়ে প্রতিদিন ১২টি মামলা দায়ের হয়েছে। (সূত্রঃ প্রথম আলো, ১০ মার্চ ২০২৫)।

সারাদেশে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ, অবরোধ, ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে আন্দোলন একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। কঠোর আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা বাহিনী, অক্সিলারি ফোর্স- সবই সক্রিয় ছিল, কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র কাজ হয়নি; নারী নির্যাতন, ইভ টিজিং, ধর্ষণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

ধর্ষকদের মধ্যে নেই কে? মেথর, কুলি, পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে মসজিদের ইমাম, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক, এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত জড়িত এই নৃশংস অপরাধে। জনগণ বহু জায়গায় ক্ষুব্ধ হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, ধর্ষকদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে, আদালত প্রাঙ্গণ থেকে আসামি ছিনিয়ে নিয়ে গণধোলাই দেওয়া হয়েছে, ধর্ষকদের পক্ষের আইনজীবীরাও হামলার শিকার হয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে পরিগণিত হচ্ছে। মানুষের তৈরি করা আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে যে এর সমাধান সম্ভব নয়, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। কারণ তিনিই মানুষের স্রষ্টা, তাঁর মন-মস্তিকেরও তিনিই স্রষ্টা। আর যিনি স্রষ্টা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানবেন যে কীভাবে মানুষ একটি অন্যায় অবিচারমুক্ত সমাজে বাস করতে পারে। আল্লাহ ধর্ষণ ও ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে যে কঠোর দণ্ডবিধি প্রদান করেছেন তা এতটাই কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক ছিল যে, ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগের তুলনায় ইসলাম-পরবর্তী যুগের আসমান-জমিনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ধর্ষণ তো একেবারেই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

তবে কালেভদ্রে যদি ব্যভিচারের কোনো ঘটনা ঘটত, দেখা যেত অপরাধী নিজেই আদালতে এসে নিজেদের শাস্তি কামনা করছে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এক ব্যক্তি রসুলাল্লাহর (সা.) কাছে এসে স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যভিচার করেছেন। তিনি বারবার উচ্চকণ্ঠে নিজের অপরাধের ঘোষণা দিতে থাকেন। রসুল (সা.) কয়েকবার তার দিক থেকে মুখ ফিরে অন্যদিকে ঘুরে বসেন। কিন্তু তিনি বারবার অপরাধের স্বীকারোক্তি করায় শেষ পর্যন্ত রসুলাল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি উন্মাদ?' লোকটি বললেন, 'না।' রসুলাল্লাহ (সা.) আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বিবাহিত?' লোকটি বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন রসুল (সা.) ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাকে শাস্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেন। (হাদিস- মুসলিম ৪৪৩৫), বোখারি ৬৮২৩)। এখানে অপরাধীকে ধরে আনার জন্য কোনো পুলিশের প্রয়োজন পড়েনি, অপরাধ প্রমাণের জন্য কোনো উকিলের জেরা বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণেরও প্রয়োজন পড়েনি। কেবল অপরাধবোধ আর অনুশোচনার দহনে মানুষ প্রায়শ্চিত্য করার জন্য নিজে এসে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত কামনা করেছে। মানুষের এমন মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পরিবর্তনের ঘটনা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন।

আল্লাহ স্বয়ং এই আত্মশুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি গড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী--তাদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তোমাদের মনে তাদের প্রতি যেন কোনো অনুকম্পা সৃষ্টি না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর তাদের শাস্তি কার্যকর করার সময় মো'মেনদের একটি দল যেন তা প্রত্যক্ষ করে।' (সুরা আন-নূর ২৪:২)

খুবই মানবিক ও যৌক্তিক এই দণ্ডবিধি কার্যকর করতে আমাদের এত দ্বিধা কেন? এছাড়া আল্লাহ বলেছেন তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হল (সুরা বাকারা ২:১৭৮)। কিসাস অর্থ সমপরিমাণ ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।' (সুরা মায়েদা ৫:৪৫)। তিনি আরো বলেছেন, 'কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, হে বোধশক্তিসম্পন্নগণ! যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।' (সুরা বাকারা, ২:১৭৯)।

আমরা মনে করি, আল্লাহর দেওয়া তওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই পারে সমাজ থেকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন নির্মূল করতে। আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা যতদিন না কার্যকর করা হবে, পরিস্থিতির আরও অবনতি হতেই থাকবে, প্রত্যেকটি মানুষ অনিরাপদ হয়ে পড়বে, কোনো কিছু দিয়েই সামগ্রিক ধ্বংস থেকে জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বর্তমানে উচ্চ আদালতে লক্ষ লক্ষ মামলার জট সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ সাধারণ একটি চুরির মামলা থেকে শুরু করে ভয়ংকর অপরাধ সংক্রান্ত মামলাও শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতে গিয়ে জমা হচ্ছে। সামাজিক বিরোধ মীমাংসার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এমনটা হতে পারছে। অথচ প্রাচীন কাল থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদেশে স্থানীয় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে 'পঞ্চায়েত ব্যবস্থা' প্রচলিত ছিল। গ্রামের প্রবীণ, জ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচার-সালিশ করতেন এবং সেখানে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পেত। পঞ্চায়েতের সালিশের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক আনুগত্য ছিল। সেসব সালিশের উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাদী-বিবাদীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করে মিলমিশ (Reconciliation) করে দেওয়া। এর ফলে সামাজিক বন্ধন আরো দৃঢ় হত। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশরা পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় সালিশ ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ইউনিয়ন কাউন্সিল ব্যবস্থা চালু করে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে কিছু সংস্কার করে ঐ একই ব্যবস্থাই চালু রাখে। বর্তমানে এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বাররা রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। স্থানীয় সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, গ্রাম পর্যায়ে চাঁদাবাজি, দলবাজি, মাস্তানি, খুনোখুনিসহ যাবতীয় অপকর্মের সৃষ্টি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কাজেই স্থানীয় সরকারের এই ব্যবস্থা স্থানীয় জামে মসজিদের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, যার নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি (আমির) স্থানীয় জনগণের পছন্দনীয় ব্যক্তি হওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতে হবে। তার বেতন ভাতা সম্পূর্ণরূপে সরকার বহন করবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ খ্রিষ্টানরা একটি সিস্টেম চালু করেছে বলেই সেটা পরিত্যাজ্য এমন কথা আমরা বলছি না এবং সেটা যৌক্তিকও নয়। আমরা বলছি, প্রত্যেকটা ব্যবস্থার সঙ্গে আল্লাহর হুকুমের সম্পর্ক থাকতে হবে। দীনের বুনিয়াদি নীতির সাথে সম্পৃক্ত না থাকলে যে কোনো ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন, বস্তুবাদী, আত্মাহীন ও দুনিয়াদারী ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। ইহকাল ও পরকাল আলাদা নয়। ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর মূল কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রের কোনো

বিষয়ে ধর্মের বা স্রষ্টার কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। ধর্মকর্ম যার যার ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ থাকবে। তারা আমাদের এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সেই কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তুলেছিল। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে সেই কাঠামো অনুসারে সমাজ পরিচালনার পর এর যে ত্রুটিগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে আবার আমাদেরকে সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে। এই সংস্কারের মূলনীতিই হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বর্তমানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে কখনও কখনও ব্যভিচার, নারী নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরিয়াহ আইন কার্যকর করার দাবি তোলা হয়। এই দাবির উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনের কঠোরতা প্রকাশ করা। বর্তমানে আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ এবং আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে শরিয়াহ আইন আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে। সেসব জায়গায় শরিয়াহ আইন হিসাবে মূলত বিভিন্ন মাজহাবের ইমামদের মতামতকে (Legal opinion) কার্যকর করা হয়। শরিয়াহ আইন সম্পর্কে বিশ্বময় ব্যাপক নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। এমনকি শরিয়াহ আইন কথাটি অধিকাংশ মানুষের কাছে ভীতিকর। শরিয়াহ আইনে শাস্তি কার্যকর করার পদ্ধতিগুলোকে অমানবিক, নৃশংস, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি বলে প্রচার চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে শরিয়াহ এবং দীন এই দুটো ব্যাপারে ধারণা আমাদের মুসলমান সমাজে অনেকের মধ্যেই স্পষ্ট নেই।

'শরিয়াহ' শব্দটি মূলত হিব্রু শব্দ "sara" থেকে এসেছে, যার অর্থ 'পথ' বা 'অনুসরণের পথ'। অনেক গবেষকের মতে শব্দটি প্রাচীন আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'নির্ধারিত পথ'। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন 'শরিয়াহ' শব্দের আদি অর্থ ছিল 'জলের উৎসের পথ'। মরুভূমির কঠিন পরিবেশে পানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যে নালা দিয়ে পানি তার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে পশুদের পানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যায় সেই নালাকে বলা হত শরিয়াহ। তাই স্রষ্টা থেকে আগত জীবন পরিচালনার বিধানকেও পানির পথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী তথা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে এই পানি প্রবাহিত হওয়ার সরু নালাকে বলা হয় ঝোরা, ছড়া, ছড়ি, জোরা ইত্যাদি যা সেমেটিক ভাষার 'শরাহ' শব্দেরই অপভ্রংশ বলে অনুমান করা যায়। ব্যবহারিক বাংলা অভিধানেও এর সমর্থন মেলে। এতে ছড়া শব্দের অর্থ করা হয়েছে পাহাড়-পর্বতের অভ্যন্তর থেকে নির্গত পানির ধারা বা ঝরনা; ক্ষীণতোয়া পাহাড়ি নদী (মাগুরছড়া)। আর ছড়ি অর্থ ছড়ার চেয়ে ছোট পাহাড়ি ঝরনা (খাগড়াছড়ি)। সংস্কৃত শব্দ সরিৎ (পানি) থেকে ছড়ি শব্দের উদ্ভব। আর সংস্কৃত ও সেমেটিক ভাষাগুলোর মধ্যে ভাষার বিনিময় ঘটতেই পারে।

কোর'আনে 'শরিয়াহ' এবং এর সমার্থক 'শির'আহ' শব্দ দুটি মাত্র একবার করে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে এগুলোকে 'সঠিক পথ' বা 'জীবন পরিচালনার বিধান' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় শরিয়াহ মানে হলো আল্লাহর দেওয়া নীতিমালা, বিধান ও আইনসমূহ যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনা করার জন্য নির্ধারিত। পবিত্র কোর'আনের অন্তত চারটি আয়াতে (সুরা বাকারা ২:১৩০, সুরা মায়েদা ৫:৪৮, সুরা শুরা ৪২:১৩, সুরা জাসিয়া ৪৫:১৮) এই শব্দটি বিভিন্ন রূপভেদে এসেছে। সুরা শুরার১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, তিনি তোমাদের জন্যে দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।

এখানে আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন, 'শারাআলাকুম' অর্থাৎ তোমাদেরকে শরিয়াহ দিয়েছি। আবার বলেছেন দীনকে প্রতিষ্ঠা কর। তাহলে স্পষ্টতই বোঝা গেল এখানে দুটো বিষয়- একটা হচ্ছে শরিয়াহ, একটা হচ্ছে দীন। এ আয়াতে এবং আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ শরিয়াহ নয়, দীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠাকেই দীন প্রতিষ্ঠা হিসাবে বোঝানো হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুইয়ের সম্পর্ক কী এবং এদের পার্থক্য কী?

সেটা বোঝার জন্য দীন সংক্রান্ত আয়াতগুলো আলোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম (সুরা ইমরান ৩:১৯)। তিনি তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিয়েছেন হেদায়াহ এবং সত্য দীনকে অন্য সমস্ত দীনের উপরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য (সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯, সুরা তওবা ৯:৩৩)। এখানে আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন - দীন। দীনের বাংলা প্রতিশব্দ হবে জীবনব্যবস্থা, জীবনপদ্ধতি (System of life). দীন শব্দটি আরো বহু আয়াতে আছে, তবে এর তাৎপর্য বোঝার জন্য এ কয়েকটি আয়াতই যথেষ্ট।

ইসলাম একটা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা যার শুরুটা হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণার মধ্য দিয়ে যাকে আমরা বলি- তওহীদ, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এলাহ (হুকুমদাতা, বিধাতা) হিসাবে না মানা। এটা হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া দীনের ভিত্তি। এটাই হচ্ছে হেদায়াহ, সঠিক পথ নির্দেশনা (Guideline), যে পথের উপরে মানবজাতি চলবে। এই তওহীদের উপরে ভিত্তি করা আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, পরিবারব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, বাণিজ্য ব্যবস্থাসহ যত নিয়ম নীতি পদ্ধতি আল্লাহ দিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে দীন।

আল্লাহর এই দীনের দুটো ভাগ। একটা হচ্ছে জাগতিক ব্যবস্থা, একটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ শরিয়ত ও মারেফত। দীনের প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেও এই দুটো ভাগ রয়েছে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক। আরেকভাবে বলতে গেলে একটি হচ্ছে দীনের উদ্দেশ্য, আরেকটি হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। দীনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবন থেকে সমস্ত অন্যায় অবিচার বিলুপ্ত করে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রতিষ্ঠার পথ হচ্ছে জেহাদ ও কেতাল, সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম। এই সংগ্রামও দীনেরই অংশ। একইভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক সংকট, চেতনা, অনুপ্রেরণা, আত্মিক সন্তুষ্টি, এ বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা দীনের অন্তর্ভুক্ত। আবার রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনাও দীনের অন্তর্ভুক্ত। এই দীনের ব্যাপ্তি বিশাল। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র- আত্মিক থেকে শুরু করে বৈশ্বিক সর্ব অঙ্গনের সকল সংকটের সমাধান নিয়ে দীন। আর শরিয়াহ হচ্ছে দীনের অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ আইন-কানুন যেগুলো অপরিবর্তনীয়।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি হয়ত পরিষ্কার হবে। দীন যদি একটি রাজ্য হয় তাহলে সেই রাজ্যের রাস্তাগুলোর মানচিত্র ও সেগুলোতে চলাফেরার নিয়মকানুন হচ্ছে শরিয়াহ। যখন কোনো মানুষ সেই রাজ্যে প্রবেশ করবে তাকে সদা-সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই রাজ্যের অধিকর্তা এমন এক সত্তা যিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন। সর্বদা এই বিষয়টি স্মরণে রাখাই হচ্ছে জিকির। এটাই হচ্ছে দীনের মারেফত বা আধ্যাত্মিকতা। যে এই কথা সর্বক্ষণ মনে রাখবে সে কখনও পথ ছেড়ে বিপথে, গোমরাহিতে যাবে না, পথভ্রষ্ট হবে না।

সুরা শুরার ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ এ কথাটিই বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য আমার বিধান বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি (শার'আলাকুম)। পূর্বের কয়েকজন সম্মানিত রসুলের নাম উল্লেখ করে তিনি শেষ নবীকে (সা.) বলেছেন, কাজেই দীন প্রতিষ্ঠা করো, এতে মতভেদ করো না। অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগে আল্লাহর রাজ্য (আল্লাহর দীন) প্রতিষ্ঠা কর। তারপর সেই রাজ্যে মানুষ কীভাবে চলবে তার বিধিবদ্ধ নিয়ম হচ্ছে শরিয়াহ। ধরা যাক নিয়ম দেওয়া হয়েছে, সন্ধ্যার পরে রাস্তায় কেউ নামবে না, সবাই ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবে, ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালাবে ইত্যাদি- এগুলো হচ্ছে শরিয়াহ। আল্লাহর দেওয়া দীন বা জীবনব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে তাঁর দেওয়া নিয়ম-শৃঙ্খলাই মানতে হবে।

এখন শুরুতে যেটা বলেছি যে আমাদের দেশেও আল্লাহর দেওয়া শরিয়াহ আইন মাঝে মধ্যে চালু করার দাবি ওঠে। কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে রাজপথের ম্যাপ ও ট্রাফিক আইন চালু করার দাবি অবান্তর তেমনি আল্লাহর তওহীদভিত্তিক দীন প্রতিষ্ঠা না করে শরিয়াহ আইন চালু করার দাবিও তেমনি

অবান্তর। সেজন্য আল্লাহ পরিষ্কার করে বলেছেন, আমি হেদায়াহ ও সত্যদীনসহ রসুলকে পাঠিয়েছি এই দীনটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অন্য নবীদেরকেও একই আদেশ করেছি। দীন প্রতিষ্ঠার পর তোমরা আমার দেওয়া শরিয়াহ মোতাবেক ফায়সালা করবে, খেয়ালখুশির (হাওয়াউন) অনুসরণ করবে না, নফসের অনুসরণ করবে না। সুরা জাসিয়ার ২৩ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেন, 'যারা নিজেদের হাওয়াউনের (কল্পনাপ্রসূত বিধান) অনুসরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন।'

তাই আগে আল্লাহর দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠা তারপর শরিয়াহ অনুসরণ। দীন একটি বৃহৎ ধারণা। এর মধ্যে শুরুতেই আসে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি (উম্মাহ) গঠন (সুরা ইমরান ৩:১০৩)। সেই জাতির প্রতিটি সদস্য একজন নেতার (ইমাম) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে (সুরা নিসা ৪:৫৯)। এগুলো দীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো বাদ দিয়ে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা অর্থহীন। যখন এমন একটি জাতি তৈরি করা যাবে তারপর সেই জাতির অভ্যন্তরীণ সমস্যা মিটানোর জন্য আইন-আদালত স্থাপন করা হবে। সেই আদালতের বিচারক নিয়োজিত হবেন রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে। সেই বিচারক যখন কোনো নাগরিককে তার অপরাধের দণ্ড দিবেন সেটা দিবেন আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ড মোতাবেক, আর সেটাই হল শরিয়াহ। যতদিন রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে পাশ্চাত্যের রীতি মোতাবেক, ততদিন সেখানে শরিয়াহ চালু করার কোনো মানে নেই। আর চালু করলেও ইসলামের যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সামগ্রিক শান্তি, সেই উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

আমাদের প্রস্তাবিত বিচারব্যবস্থা কার্যকর হলে কী ধরনের পরিবর্তন হবে তা একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি-

প্রচলিত বিচারব্যবস্থা ও ইসলামের বিচারব্যবস্থার তুলনামূলক ফল

বর্তমান বিচারব্যবস্থার ফল	আমাদের প্রস্তাবিত বিচারব্যবস্থার ফল
১. বিচারের দীর্ঘসূত্রতা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৩ লক্ষ মামলা বিচারাধীন। প্রতি বছর এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	আল্লাহর বিধান মোতাবেক মসজিদে সালিশি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত পর্যন্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকলে কোথাও একটি মামলাও ঝুলে থাকবে না। **কারণ:** আধ্যাত্মিক শিক্ষার ফলে

	অপরাধ অনেক কমে যাবে, তাছাড়া মসজিদ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ফজর থেকে এশা অর্থাৎ সারাদিন খোলা থাকে। তাই যে কোনো সময় অভিযোগ করা যাবে। মসজিদের ইমাম নিম্ন আদালতের সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ফলে অভিযোগ করার সাথে সাথেই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বাদী-বিবাদী, সাক্ষী সকলেই একই সমাজের মানুষ হওয়াতে বিচার নিষ্পত্তি দ্রুত করা সম্ভব হবে। ফলে মামলার জট তৈরি হবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।
২. বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়।	বাদী-বিবাদী কাউকেই কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না। **কারণ:** বাদী-বিবাদী কাউকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উকিল ধরা লাগবে না। প্রত্যেকে তার নিজের বক্তব্য নিজেই উপস্থাপন করবে। কেননা ঘটনার সাথে জড়িত বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীই মূল ঘটনা সম্পর্কে অবগত, কাজেই যা ঘটেছে তাই তারা বলবে। মিথ্যা বানিয়ে বলার তো প্রয়োজন নেই, কাজেই নেহায়েৎ প্রয়োজন না হলে উকিলও লাগবে না। আইনী সহায়তা লাগলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেই সহায়তা দেওয়া হবে। তাছাড়া মামলা ড্রাফ্‌ট করাসহ মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের বিষয় রাষ্ট্র দেখবে।

৩. বহু মামলায় দীর্ঘ হাজতবাসের পর রায়ে আসামি নির্দোষ প্রমাণিত হয়। অথচ এরই মধ্যে বিনা অপরাধে তার জীবন থেকে কতগুলো বছর চলে যায়, বিপুল অর্থ খরচ হয়, সম্মান হানি হয়।	মামলা নিষ্পত্তির আগে উক্ত অপরাধের জন্য কাউকে কোনো ধরনের শাস্তি, কারাবাস ইত্যাদি ভোগ করতে হবে না। **কারণ:** আইনের সংশোধনের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হবে।
৪. বেশিরভাগ অপরাধের শাস্তি হয় কারাবাস। এর ফলে বাড়তি অর্থ ব্যয় হয় রাষ্ট্রের (খাদ্যব্যয় ও অন্যান্য), বছরের পর বছর সে জীবিকা থেকে দূরে থাকায় রাষ্ট্রের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়, তার পরিবার ভয়ানক আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে।	ইসলামের বিধানে কারাবাসের চেয়ে বরং তাৎক্ষণিক শাস্তি যেমন দোর্‌রা বা বেত্রাঘাত, কেসাস (হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ ইত্যাদি), অর্থদণ্ড কার্যকর করা হবে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে শাস্তি ভোগের পরিবর্তে সে সাময়িক শাস্তি ভোগের পর সে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে পারবে। কেবল রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কিছু গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কারাবাসে রেখে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। **কারণ:** কোনো অপরাধ সংঘটনের কারণে কারো জীবনের গতি থেমে যাবে এটা আল্লাহর চাওয়া নয়। তিনি চান দ্রুত নিষ্পত্তি।
৫. মিথ্যা মামলা, গায়েবি মামলা, রাজনৈতিক মামলা, জঙ্গি-নাটকের মামলা- এ ধরনের অসংখ্য অন্যায় মামলা চলে বছরের পর বছর। বিচারক, বাদী, বিবাদী, স্বাক্ষী সবাই জানে যে এটা মিথ্যা মামলা তবুও মামলা ঝুলে থাকে, নিরপরাধ মানুষ হয়রানির স্বীকার হয়।	এ ধরনের কোনো হয়রানিমূলক মামলার অস্তিত্বই থাকবে না। **কারণ:** প্রথমত আধ্যাত্মিক শিক্ষার কারণে এ ধরনের মামলা কেউ করবে না। দ্বিতীয়ত এ ধরনের মামলা গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনোভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে বা করতে গেছে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া

	হবে। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, আর রাষ্ট্র যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে কেউ এ ধরনের অন্যায় করার সাহস পাবে না।
৬. বর্তমান ব্যবস্থায় অপরাধী সাজা ভোগ করার পরেও সংশোধিত হয় না, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরও বড় অপরাধীদের সান্নিধ্যে থেকে নিজেও বড় অপরাধী হয়ে কারাগার থেকে বের হয়। কারাগারেও নানা অপরাধের সাথে সে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া আদালতের রায়ে সে সন্তুষ্টও থাকে না।	আমাদের প্রস্তাবিত বিচারব্যবস্থায় সর্ব প্রথম অপরাধীকে স্মরণ করানো হবে যে, দুনিয়ার আদালতে সে যদি সাজা ভোগ করে তাহলে আল্লাহর আদালতে হাশরের ময়দানে সে ক্ষমা পাবে। তাছাড়া বিচার প্রক্রিয়া আল্লাহর আইনে হওয়ার কারণে সে মো'মেনরা সার্বিক বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট থাকবে। দেখা যাবে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধী নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি পেতে চাইবে এবং একই অপরাধ পুনরায় না করার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করবে, নিজেকে সংশোধন করে নেবে। রায়ের প্রতিও সে সন্তুষ্ট থাকবে। **কারণ:** এটাই ইতিহাস।
৭. বর্তমান ব্যবস্থায় বাদী-বিবাদীর মধ্যে, এমনকি তাদের পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যেও মামলাকে কেন্দ্র করে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় যা আর মিটমাটও হয় না। রায়ের মধ্যে হারজিতের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়। কেউ হারতে চায় না, তাই উচ্চ আদালতে আপিলে পর আপিল করতেই থাকে। এভাবে মামলার জট বেড়েই চলে।	আমাদের বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হবে অপরাধীর সংশোধন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা। এখানে মূল উদ্দেশ্য হারজিত নয়, বরং সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ায় দয়া ও ক্ষমা প্রধান্য পাবে। **কারণ:** ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঐক্য। ঐক্য নষ্ট হলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে -

০১. **বিচারব্যবস্থার ভিত্তি আল্লাহর হুকুম:** বিচার প্রক্রিয়ায় আল্লাহর হুকুমই হবে চূড়ান্ত। প্রচলিত বিচারপদ্ধতি ও আইন-কানুন সবই সংস্কারের আওতায় আসবে আর যেগুলো আল্লাহর আদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তা বাতিল করা হবে।

০২. **ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থা পরিহার:** ঔপনিবেশিক আমলের ব্যয়বহুল, শ্লথ গতিসম্পন্ন এবং জটিল বিচার প্রক্রিয়া পরিহার করে একটি সহজ, দ্রুত কার্যকর ও জনগণের জন্য সুবিধাজনক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই ব্যবস্থা স্থানীয় জনগণের জীবনযাপন, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

০৩. **সমান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা:** ধনী-গরিব, প্রভাবশালী-দুর্বল, নারী-পুরুষ, নেতা-জনতা, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক বৈষম্যহীনভাবে ন্যায়বিচার পাবে।

০৪. **বিনামূল্যে বিচার প্রদান:** জনগণকে বিচার পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে না, কারণ ন্যায়বিচার তাদের মৌলিক অধিকার যা প্রদান করতে রাষ্ট্র তাদের নিকট দায়বদ্ধ।

০৫. **উকিল নির্ভরতা হ্রাস:** আদালতে যাওয়ার জন্য জনগণকে শতভাগ উকিলনির্ভর হওয়ার প্রয়োজন হবে না। বিচার প্রক্রিয়ায় সরকারি আইনজীবীরা আইনি পরামর্শ দেবেন, সহযোগিতা করবেন এবং নাগরিকরা সরাসরি বিচারকের সামনে তাদের অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারবেন। নেহায়েৎ প্রয়োজন পড়লে তারা উকিলের সহায়তা নিতে পারবেন।

০৬. **স্থানীয় বিচার ও সালিশি ব্যবস্থা:** গ্রাম পর্যায়ে সালিশি বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে গ্রামপ্রধান (আমির), প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে বিরোধগুলো মিটমাট করা হবে। পঞ্চায়েত সদস্যরা বাদী-বিবাদীদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা করবেন। উপস্থিত সকলে একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে জানার কারণে বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি সহজ হবে, আদালতের মত তাদেরকে কেবল কিছু কাগজপত্র বা মৌখিক বয়ানের উপর নির্ভর করতে হবে না। স্থানীয় পর্যায়ে অধিকাংশ বিবাদের মীমাংসা হয়ে যাওয়ার কারণে আদালতের উপর চাপ কমে যাবে। ফলে লক্ষ লক্ষ মামলার জট সৃষ্টি হবে না।

০৭. **বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণ:** পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কোনো বিরোধের সমাধান না হলে সেটার জন্য বাদীকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে জামে মসজিদ সন্নিহিত আদালত থাকবে। সপ্তাহজুড়ে সেখানে

বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। গুরুতর অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করা হবে জুমার দিন।

০৮. **কেন্দ্রীয় আদালতের কাজঃ** সাধারণ ফৌজদারি অপরাধের বাইরে গুরুতর অপরাধ যেমন রাষ্ট্রদ্রোহ, অর্থপাচার, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড, যেগুলি দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে, তা স্থানীয় আদালত থেকে কেন্দ্রীয় আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হবে।

০৯. **বিচারবিভাগের স্বাধীনতাঃ** বিচারবিভাগ সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকবে এবং তিনি আদালতের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করবেন। আইন পরিষদ বা মন্ত্রিপরিষদের কেউ বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। বিচারকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতা বা দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে, তা রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুরা নিসা ৪:৬০

শিক্ষাব্যবস্থা (Education System)

যদি কোনো রাষ্ট্র বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে, রাষ্ট্রের প্রধান খাতগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, সমাজে অন্যায় ও অবিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বদলে বিভেদ আর হানাহানি বৃদ্ধি পায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রতারণা ও ছলচাতুরিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে অবশ্যই সে রাষ্ট্রের শিক্ষিত সমাজের উপর এ দায় বর্তায়। এতে স্পষ্ট হয় যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো ত্রুটি রয়েছে।

বর্তমানে এই বাস্তবতা প্রায় সর্বমহলে স্বীকৃত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে, এ কথা শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। যারা এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তাদের সাথে তর্কে না গিয়ে কেবল অনুরোধ করব, আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে। প্রতিবছর এই ব্যবস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে। যারা চাকরিতে প্রবেশ করছে, তাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ঊর্ধ্বতনের আদেশে ভয়াবহ অন্যায় অবলীলায় করে যাচ্ছেন শিক্ষিতরা। কেউ প্রশ্ন করলে বেহায়ার মত উত্তর দেন- কী করব ভাই, চাকরি করি। জাল সার্টিফিকেট দিচ্ছে শিক্ষিতরা। ফলে ভুয়া ডাক্তার, ভুয়া ব্যারিস্টার, ভুয়া প্রফেসর ধরা পড়ছে ভুরি ভুরি। এমনকি এম ফিল, পিএইচডি'র থিসিস পর্যন্ত চুরি করছেন শিক্ষিতরা। একটা সামান্য পদোন্নতির জন্য জঘন্য নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। এজন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও শিক্ষাবিদেরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এই শিক্ষিত শ্রেণি ব্যবসা করতে গিয়ে ট্যাক্স, ভ্যাট ফাঁকি, ব্যাংক ঋণ খেলাপি, প্রতারণা, শেয়ার মার্কেট জালিয়াতি, অর্থপাচারসহ নানাবিধ আর্থিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন, এমনকি খুন পর্যন্ত করেন। উচ্চশিক্ষিত ব্যাংকার সমগ্র ব্যাংক লুটেপুটে খেয়েছেন। ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বড় বড় আমলারা ভয়ানক দুর্নীতি করে ধরা পড়েছেন। উচ্চশিক্ষিত বহু ডিগ্রিধারী রাজনৈতিক নেতারা সুযোগ পেয়ে হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে সমগ্র দেশটাকে দেউলিয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, শিক্ষিতরা কি সত্যিই দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী, কিংবা নতুন উদ্ভাবনের পথিকৃৎ হচ্ছেন? না হলে কেন হচ্ছেন না? উত্তর সহজ- শিক্ষাব্যবস্থার গলদ।

অন্যদিকে মাদ্রাসাকে নৈতিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দাবি করা হলেও বাস্তবে সেখান থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র বা সমাজের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা ধর্মকে ব্যবহার করে ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। 'তওহীদী জনতা'র নামে গণহিংস্রতা বা মব সৃষ্টির মাধ্যমে জ্বালাও-পোড়াও, লুটপাটের মতো কর্মকাণ্ডেও তারা যুক্ত হচ্ছে ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের অনেকে নৈতিক স্খলনের শিকার হয়ে দুর্নীতি, প্রতারণা, ঘুষ, মাদক ব্যবসার মতো অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি নারী ও শিশু ধর্ষণ, বলাৎকারের মতো ভয়াবহ অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে। ইদানীং মাদ্রাসা শিক্ষিতদের কেউ কেউ নাস্তিক ও ইসলাম-বিদ্বেষী পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ কী? নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই এর জন্য দায়ী।

বস্তুত, একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফরাসিদের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন, যেখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল করে গড়ে তোলা। কারণ তিনি তার জাতিকে বিশ্বজয়ের পথে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো- আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য কী, অথবা আদৌ কি রাষ্ট্রের কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে? যদি লক্ষ্য নির্ধারণ করা না হয়, তবে সেটি সবার আগে ঠিক করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনে কী ধরনের নাগরিক প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করেই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত।

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং এর পেছনে ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। ব্রিটিশ শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার সহায়ক একটি কেরানি শ্রেণি তৈরি করা। পাশাপাশি বিকৃত ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের চিরস্থায়ীভাবে গোলামে পরিণত করাও ছিল তাদের মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা সেই ব্রিটিশ যুগের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থাই তার ভিত্তিসহ বহন করে চলেছি। এর নেতিবাচক পরিণতি আজকের শিক্ষিত সমাজে স্পষ্টতই দেখা যায়; সেটা হল তাদের অসততা, নৈতিক অবক্ষয়, দেশপ্রেমহীনতা, স্বার্থপরতা, অপরাধপ্রবণতা; সেই সাথে রয়েছে তাদের সৃজনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের অভাব যে কথা শুরুতেই বলেছি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ বর্তমান সমস্যাগুলোর মূল কারণ শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় নিহিত। এটি কেবল আংশিক

সংস্কারে সমাধান হবে না; বরং শিক্ষার ভিত্তি, লক্ষ্য এবং কাঠামো নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে যখন সামরিকভাবে পদানত করল তারা এই জনগোষ্ঠীকে চিরস্থায়ীভাবে তাদের দাসে পরিণত করার জন্য পাশাপাশি দুটো ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল। একটি হল মাদ্রাসা শিক্ষা, আরেকটি হল সাধারণ শিক্ষা। ১৭৮১ সালে কলকাতায় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার সিলেবাস কারিকুলাম খ্রিষ্টান পণ্ডিতরাই (Orientalist) তৈরি করে দেন। টানা ১৪৬ বছর ধরে ২৭ জন খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদ এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে থেকে মুসলমানদেরকে 'ইসলাম' শিক্ষা দিয়েছেন। এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না যে, তারা যেটা শিখিয়েছেন সেটা আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলাম ছিল না। সেটা কী ধরনের 'ইসলাম' ছিল তা নিয়ে আমাদের একটি ভিন্ন বই রয়েছে যার নাম- 'ঔপনিবেশিক যুগের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা'। সবচেয়ে বড় যে বিকৃতি সেখানে ছিল সেটা হচ্ছে, এই মাদ্রাসায় জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো প্রকার কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া হল না। শুধু মাসলা-মাসায়েল দিয়ে তো সংসার চলে না। ফলে ঐ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষিতরা ধর্মকেই তাদের জীবন জীবিকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হল। আজও সেই ব্যবস্থা চালু আছে। মাদ্রাসা থেকে যারা পড়াশোনা করে বেরিয়ে আসছেন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আজও তেমন কোনো কার্যকর বন্দোবস্ত হয়নি। সেক্যুলার সরকারগুলো নানা সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থে তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও মসজিদ, মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো উপায় সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রধান চার ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে- কওমি, আলিয়া, ফোরকানিয়া/নুরানি ও হাফিজিয়া। এর বাইরেও বিভিন্ন মাজহাব ফেরকা বা তরিকার নিজস্ব মাদ্রাসা রয়েছে যেমন সালাফি মাদ্রাসা, আহলে হাদিস মাদ্রাসা, ছারছিনা মাদ্রাসা ইত্যাদি। এই মাদ্রাসাগুলির আমল, আকিদা, চিন্তা চেতনা, শিক্ষা পদ্ধতি একেক রকম।

একইভাবে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও মাদ্রাসার মতো বহুরকম বিভক্তি রয়েছে। যেমন- ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি। ইংলিশ মিডিয়ামের সিলেবাস কারিকুলাম তৈরি করা হয় ইউরোপের স্কুলগুলোর অনুকরণে। এই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াও সেই ঔপনিবেশিক যুগে। তখন প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ফাইফরমাস খাটার জন্য, তাদের কেরানি ও দোভাষীর কাজ করার জন্য একদল দেশীয় লোককে ইংরেজি ভাষাসহ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখাতে তারা এই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে যে সর্বনাশটা

তারা করেছে তা হল, এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে ধর্মকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, এখানে ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ, অবজ্ঞা, হীনম্মন্যতা ও বিদ্বেষের ভাব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পাশ্চাত্যের সবকিছুই শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এমন একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তারাই আবিষ্কর্তা এমন ইতিহাস শেখানো হয়েছে। তারা যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় তখন এই শিক্ষিত শ্রেণিটির হাতে জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে যায়, যে শিক্ষিত গোষ্ঠীটি চামড়ার রঙে ভারতীয় হলেও মনে মগজে, চিন্তা ভাবনায় খাঁটি ইংরেজ। ফল দাঁড়িয়েছে এটাই- আমাদের ধর্মীয় অঙ্গনে নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা 'ব্রিটিশদের তৈরি ইসলামে' শিক্ষিত। আর আমাদের জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার সৃষ্টি বিভিন্ন তন্ত্র ও মতবাদের পূজারী। এভাবে আমরা এখনও প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক প্রভুদেরই দাসত্ব করে যাচ্ছি।

এইভাবে আমাদের বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত সমাজ তাদের জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছে না। তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বহুধাবিভক্ত এবং তাদের অবস্থান পরস্পরবিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা মনে করছে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা কট্টরপন্থী, কূপমণ্ডূক। আর মাদ্রাসাশিক্ষিতরা মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপের আখড়া। এদিকে মাদ্রাসায় দীনের প্রকৃত মর্মবাণী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মতবিরোধপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়। আর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ-রসুল, পরকাল, নৈতিকতা বা তাকওয়া তথা ধর্মের কোনো শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে না। এখানে দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণার শিক্ষা। ফলে এখান থেকে বের হচ্ছে সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখী বস্তুবাদী একদল লোক। এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, অর্থপাচার, অপরাজনীতি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত যা পূর্বেই বলেছি। অন্যদিকে মাদ্রাসা থেকে যে জনগোষ্ঠীটি বের হচ্ছে তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, ভূগোল, গবেষণা, কারিগরি শিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। জীবন ধারণের জন্য তারা ধর্মকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছেন।

আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, এই বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হবে ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্যপূর্ণ। যেখানে নীতি-নৈতিকতা সংবলিত দীনের জ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটবে। শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হবে- একদিকে নাগরিকদের চরিত্র নির্মাণ অন্যদিকে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে নানা কাজে দক্ষ করে গড়ে

তোলা। প্রথমত এই শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষিত লোক একদিকে যেমন মো'মেন হবে, অন্যদিকে দেশপ্রেমিক ও মানবতার কল্যাণকামী হবে। সে হবে সৎ, আমানতদার, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার প্রতি অগাধ আস্থাশীল ও স্রষ্টার হুকুমের প্রতি অনুগত। দেশের আইন মান্য করার ব্যাপারে সে হবে যত্নশীল, রাষ্ট্রের প্রতি ও রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি হবে অনুগত। শিক্ষিত নাগরিকদের মাঝে গড়ে উঠবে ঐক্যচেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ। একদিকে সে অত্যন্ত সাহসী হবে আর একদিকে সে মানবদরদী হবে। জীবন গেলেও, না খেয়ে থাকলেও সে ঘুষ খাবে না, মৃত্যুর হুমকি আসলেও অর্থপাচার করবে না, দেশের বা মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবে না। অন্তত শিক্ষিত লোকেরা গুজব ও হুজুগপ্রবণ হবে না, মব সৃষ্টি করে অন্যের বাড়িঘরে আক্রমণ করে জ্বালাও পোড়াও করবে না।

অন্যদিকে এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে কর্মমুখী। শিক্ষাজীবনেই শিক্ষার্থিবৃন্দ নানা ধরনের বাস্তবমুখী কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে যার ফলে শিক্ষাজীবন শেষ করে বেকার থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। আবার শিক্ষাজীবন শেষ করে যেন তারা উদ্যোক্তা হতে পারে, নানা ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে সেই উপাদানও শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকবে। উচ্চতর শিক্ষায় ব্যাপকভাবে গবেষণার সুযোগ থাকবে যেন এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, লেখকসহ সৃজনশীল কার্যের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়। এভাবে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এদেশের মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, চাহিদা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতি-নৈতিকতা সংবলিত একটি কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব আমরা করছি। সংক্ষেপে আমাদের এ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো হচ্ছে:

০১. **একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা:** বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে একটি একমুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই ব্যবস্থায় দেহ ও আত্মা, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হবে। শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে চরিত্রবান ও সুশৃঙ্খল জনশক্তি তৈরি করা, যারা জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, ঐক্যচেতনা, দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা হবে। একই সঙ্গে অন্যায়বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলে তাদেরকে ন্যায়পূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

০২. **শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করা:** শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হতে দেওয়া হবে না এবং ধনী-গরিব সবার জন্য শিক্ষার সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। এর জন্য সরকার পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করবে। সমাজের দানশীল বিত্তবান

শ্রেণিকে শিক্ষাখাতে সাদাকাত (দান) করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে। শিক্ষাকে সাশ্রয়ী করে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রে কাজ করবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যাতে তারা শুধু মুনাফার দিকে নজর না দিয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।

০৩. **কর্মমুখী শিক্ষা:** শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের উপর জোর দিতে হবে যেন তারা জাতির বোঝায় পরিণত না হয়। এ লক্ষ্যে তাদেরকে আইসিটি, কারিগরি শিক্ষা, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

০৪. **দ্বাদশবর্ষ শিক্ষা পরিকল্পনা:** প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ এবং ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে একটি সুষম একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হবে; যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অন্যদিকে জাগতিক জ্ঞান হাসিল করবে। স্নাতক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুযায়ী যে কোনো বিষয় নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।

০৫. **জাতীয় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ:** শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় নিরাপত্তা সংকট ও দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ (ক্যাডেট) প্রদান করা হবে, যাতে তারা দেশের প্রয়োজনে প্রস্তুত থাকে। শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সুস্থ, সবল এবং সাহসী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শরীর গঠনমূলক খেলাধুলায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে মার্শাল আর্ট শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

০৬. **সবার জন্য শিক্ষা:** শিক্ষার কোনো বয়স থাকবে না। শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক সক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন, যাতে তারা তাদের মেধা এবং প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ লাভ করতে পারেন।

০৭. **গবেষণা ও উদ্ভাবন:** উচ্চতর শিক্ষায় ব্যাপকভাবে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এজন্য গবেষণাখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে যাতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকেই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, লেখকসহ সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। তাদের দেশে কর্মসংস্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে মেধা পাচার রোধ করা সম্ভব হয়।

০৮. **উদ্দেশ্যমূলক ও বিকৃত ইতিহাস বর্জন:** শিক্ষার্থীদের সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হবে। ঔপনিবেশিক যুগে লেখা ইতিহাসের মাধ্যমে যা মানসিক

দাসত্ব এবং ইংরেজদের প্রতি অন্ধ মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিল, তা সংশোধন করা হবে। ঔপনিবেশিক শাসনে বিজয়ী জাতির জয়গান এবং ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুদের ইতিহাস বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে পুনর্লিখন করা হবে। নিজেদের সাহস, সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠত্বের গল্পগুলোর পাশাপাশি সকল জাতির মহান ইতিহাস শেখানো হবে।

০৯. **পারিবারিক বন্ধনের শিক্ষা:** শিক্ষার্থীদের পারিবারিক বন্ধন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হবে। বাবা-মা, ভাইবোন এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি দায়িত্বশীল ও যত্নশীল মানসিকতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে তারা পরিবারের প্রতি আন্তরিক দায়িত্ব পালন করবে এবং বৃদ্ধ বাবা-মায়ের বৃদ্ধাশ্রমে থাকার প্রয়োজন হবে না। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানবিক, পরিবারমুখী এবং যৌথ জীবনধারায় উৎসাহী হবে।

১০. **জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ:** শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও প্রাথমিক চিকিৎসাজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হবে। একই সঙ্গে তাদেরকে নিজেদের খাবার রান্না করা, কাপড় পরিষ্কার রাখা, ঘরবাড়ি গুছিয়ে রাখা, অর্থ উপার্জন ও ব্যবস্থাপনা, সাধারণ মেরামত কাজ, পরিবেশ সচেতনতা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জীবনমুখী দক্ষতাগুলো শেখানো হবে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রায় আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

১১. **ভাষাগত দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে তারা মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষ হতে পারে। এই দক্ষতা তাদেরকে সুষ্ঠু যোগাযোগ, কর্মের সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জ্ঞান-বিনিময় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

১২. **বিশেষ শিশুদের শিক্ষা:** প্রতিটি বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা রাখা হবে। তাদের জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে, যাতে তারা দক্ষতা অর্জন করে নিজেকে সমাজে মূল্যবান মানবসম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

ধর্মযাজক ও পুরোহিত শ্রেণি
(Religious Clergy)

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। সেটা হল- ইসলাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে কোনা যাজক বা পুরোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে যথা নামাজ পড়িয়ে, আজান দিয়ে, কোর'আন খতম করে, ওয়াজ মাহফিল করে, কোর'আন হাদিস তথা দীন শিক্ষা দিয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, বিয়ে পড়িয়ে, দোয়া-মোনাজাত করে, জানাজা ও দাফন পরিচালনা করে, কবর জিয়ারত করে অর্থাৎ পৌরোহিত্য করে অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। প্রকৃত ইসলামের যুগে মসজিদে যেমন সালাত কায়েম হতো, তেমনি মুসুল্লিদের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য বিধিবিধানও এখান থেকেই লোকেরা শিখে যেত বিনে পয়সায়।

কিন্তু পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা যখন লুপ্ত হয়ে গেল তখন আল্লাহ ও জনগণের মাঝখানে এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি গজিয়ে উঠল। এই শ্রেণিটিই ইসলামের মধ্যে পুরোহিততন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। তারা জীবন চালানোর জন্য জরুরি উল্লিখিত সাধারণ জ্ঞানগুলোও মানুষকে দান না করে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখছে। ফলে আমাদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে বাধ্য হয়েই তাদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ইসলামের প্রতিটি বিষয় নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে হাজার হাজার মাসলা মাসায়েল আবিষ্কার করে সহজ সরল ইসলামকে একটি ভয়াবহ জটিল ধর্মে পরিণত করেছে যা শিখতে শিখতেই একজন মানুষের জীবন পার হয়ে যাবে। সুতরাং সেটা সবার পক্ষে অসম্ভব।

অথচ ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনদর্শন যা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। শেষ নবী কোনো গোত্রীয় নবী নন, তিনি বিশ্বনবী (সুরা আরাফ ৭:১৫৮)। কাজেই তাঁর আনীত দীন ইসলাম সবাইকে জানতে হবে। সেটা কোনো নির্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণির কুক্ষিগত থাকতে পারে না। ইসলামের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে আল্লাহ এ শ্রেণিটির কোনো ব্যবস্থা রেখেছিলেন কি না জানি না, তবে এই শেষ সংস্করণে যে রাখেননি তা নিশ্চিত। কারণ বিশ্বনবীর (সা.) সময়ে এবং তার অনেক পরে পর্যন্ত এই শ্রেণির জন্ম হয়নি। তারপর পূর্ববর্তী দীনগুলিতে যেভাবে এই শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে ঠিক সেইভাবে এই শেষ দীনেও এদের আবির্ভাব হল- অর্থাৎ

দীনের আইন-কানুন, আদেশ, নিষেধগুলির চুলচেরা বিচার, পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ। পূর্ববর্তী দীনগুলির ঐ বিকৃতি রসুলাল্লাহ (সা.) খুব ভালভাবেই জানতেন এবং তাদের পরিণতি কী হয়েছিল তাও জানতেন, তাই তিনি নিজের সৃষ্ট জাতিটাকে, তার উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে এই উম্মাহও যেন ঐ একই ভুল করে ধ্বংস না হয়। একজন সাহাবা তাঁকে একটু খুঁটিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি উষ্মাভরে বলেছিলেন- তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক জাতি তাদের নবীদের এমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করত, তারপর সেই উত্তরগুলি নিয়ে নানা গবেষণা করে মতভেদ সৃষ্টি হত এবং ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদের যতটুকু করতে বলেছি ততটুকু করতে চেষ্টা করো, ওর বেশি আমাকে প্রশ্ন করো না (হাদিস- আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারি-৭২৮৮, মুসলিম-১৩৩৭)। বিশ্বনবীর (সা.) এই হাদিসটিকে ভাল করে বোঝার প্রয়োজন আছে। এই হাদিসটির মধ্যে তিনটি জিনিস আছে। প্রথম হল- তাকে খুঁটিয়ে কোনো প্রশ্ন করা অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় হল- ঐ কাজের পরিণতি হল জাতির বিভক্তি ও ধ্বংস। তৃতীয় হল- রসুলাল্লাহ (সা.) যেটুকু করতে সরাসরি আদেশ করেছেন তার বেশি এগুতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ অতি ধার্মিক হওয়া, দীনের অতি বিশ্লেষণ করে সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করা নিষেধ হয়ে গেল। আল্লাহর রসুল (সা.) যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজ শরিয়াহ মোতাবেকই যে নিষিদ্ধ, হারাম আশা করি তাতে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই উম্মাহর দুর্ভাগ্য শুধু নয়, মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) যে কাজ নিষিদ্ধ করেছেন সেই নিষিদ্ধ কাজই করা হল এবং করা হল পুরোদমে, মহা উৎসাহে এবং অতি পূণ্যের, সওয়াবের কাজ বলে মনে করে। এই উম্মাহর দুর্ভাগ্য এই জন্য যে, ঐ কাজ করে জাতির মন-মগজ আসল উদ্দেশ্য, বিশ্বনবীর (সা.) দায়িত্ব, সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন, জীবন-বিধান চালু করার সংগ্রাম থেকে মোড় ঘুরিয়ে ঐ দীনের খুঁটিনাটি পালন করার মধ্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল এবং ফলে নানা মাজহাবে (দলে) ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে চরমভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল। আর মানবজাতির দুর্ভাগ্য এই জন্য যে, এই উম্মাহ যদি তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতো তবে সব মানব জাতির উপর এই শেষ দীন প্রতিষ্ঠা হত যার ফলে মানব জাতি আজ শান্তিতে (ইসলাম) বাস করত। আল্লাহও তাঁর রসুলের (সা.) নিষেধ অমান্য করে অতি বিশ্লেষণের ফলে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে মানবজাতি ঐ চির কাঙ্ক্ষিত শান্তি (ইসলাম) থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই শেষ ইসলাম তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের জাতীয় জীবনের জন্য নিজেরা রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা

তৈরি করে নেওয়ার ফলে আজ পৃথিবী অবিচার, অনাচার, যুদ্ধ ও রক্তপাতে পূর্ণ। শুধু তাই নয়, আত্মাহীন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ফল, প্রচণ্ড শক্তিশালী মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে দৈহিকভাবে সমূলে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে, সামান্য একটু যান্ত্রিক ভুলের জন্য আজ পারমাণবিক যুদ্ধ লেগে যেতে পারে- যার ফলে সমগ্র মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং যদি হয় তবে সেই ধ্বংসের সঙ্গে ধ্বংস হবে সেই জাতিটিও, যার উপর দায়িত্ব ছিল এই ধ্বংস রোধ করা, কিন্তু যেটা নিজেরাই আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি, গায়রুল্লাহর তৈরি জীবন-বিধান তার জাতীয় জীবনে চালু করেছে। আজ পৃথিবীময় যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুঃখ, অশ্রু, রক্তপাত হচ্ছে তার জন্য দায়ী-

প্রথমত: বিশ্বনবীর (সা.) ৬০/৭০ বছর পর যারা বিশ্বনবীর (সা.) অর্পিত দায়িত্ব ভুলে যেয়ে সংগ্রাম, জেহাদ ত্যাগ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: ঐ সংগ্রাম ত্যাগ করার পর যারা পৃথিবীর দশটা রাজা-বাদশাহর মত শান-শওকতের সাথে রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। মহানবী (সা.) এর জন্য অর্থাৎ তাদের রাজত্ব করার জন্য রাজ্য জয় করার জন্য একটি অপরাজেয় দুর্ধর্ষ জাতি সৃষ্টি করেন নি [রসুলাল্লাহ (সা.) কর আদায় করার জন্য প্রেরিত হননি- ওমর (রা.)।]

তৃতীয়ত: যারা দীনের খুঁটিনাটির অবিশ্বাস্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করে জাতিকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ঐ বিভক্তিগুলির মধ্যে বাদানুবাদ, তর্কাতর্কি সৃষ্টি করে, ঐক্য নষ্ট করে জাতিকে দুর্বল নির্জীব করে দিয়েছিলেন, সেরাতুল মোস্তাকীম- সহজ সরল দীনকে, জটিলতার, দুর্বোধ্যতার চরমে নিয়ে সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চতুর্থত: যারা এই ভারসাম্যপূর্ণ দীনের মধ্যে ভারসাম্যহীন সুফিবাদ আমদানী করে উম্মাহর বিস্ফোরণমুখী (Explosive), বহির্মুখী (Extrovert) চরিত্রকে উলটিয়ে একেবারে অনড় (Passive) ও অন্তর্মুখী (Introvert) চরিত্রে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এই চার রকম মানুষের কাজের সম্মিলিত ফলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (সুরা আলে ইমরান ১১০) শুধু সর্ব নিকৃষ্টেই পরিণত হল না, যাদের উপর তাদের জয়ী হবার কথা এবং এক সময় হয়েও ছিল, তাদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত হল।

বর্তমানে এই পুরোহিত শ্রেণি তাদের পূর্ববর্তী অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিতদের অর্থাৎ ফকিহ, মুফাস্‌সিরদের সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবে, ফেরকায় বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ছোটখাট অনর্থক বিষয় নিয়ে ফতোয়াবাজিতে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ত

নয় ঐ ফতোয়াবাজি নিয়ে মারামারি, রক্তারক্তি করতেও তারা দ্বিধা করেন না। উম্মাহটাকে তারা ছিন্নভিন্ন করে রেখেছেন, এর ঐক্য ধ্বংস করে ফেলেছেন। অথচ ঐ ঐক্য যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন যে, কোর'আনের কোনো আয়াত, কোনো কথা নিয়ে মতভেদ কুফর। ঐ কুফরের মধ্যে তারা ডুবে আছেন। আল্লাহ ও রসুলের (সা.) আদেশ অমান্য করে কোর'আনের বিভিন্ন অর্থ করে জাতিকে এই পুরোহিত শ্রেণি বহু ভাগে ভাগ করে রেখেছেন। ফলে জাতি এক হয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। এই শ্রেণির লোকেরা দীনের ছোটখাট নিয়ম-কানুন পরম নিষ্ঠার সাথে পালন করেন দিনরাত ধরে কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্যও জানেন না, এর লক্ষ্যও জানেন না। অথচ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন সমস্ত কাজ অর্থহীন। দীনের খুটিনাটি মসলা-মাসায়েলের বাইরে এদের কোনো জ্ঞানই নেই, যে খুঁটিনাটির কোনো দাম নেই যদি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হারিয়ে যেয়ে থাকে এবং যে খুঁটিনাটিকে বিশ্বনবী (সা.) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এই বলে যে, এই ছোটখাট, খুঁটিনাটির পেছনে লাগলে তা পূর্ববর্তী উম্মাহগুলিকে যেমন ধ্বংস করেছে, তোমাদেরও তেমনি করবে।

এই যে এরা খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েল নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে উম্মাহকে শক্তিহীন ও অক্ষম করে রেখেছেন ঐ খুঁটিনাটি মাসলা-মাসায়েলগুলিও সবই ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। জাতীয় জীবনের মসলা-মাসায়েলের গুরুত্ব এদের কাছে নেই, কারণ যে উদ্দেশ্যে, যে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য এই উম্মাহর সৃষ্টি হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যই তো কবে হারিয়ে গেছে, কাজেই ঐ ব্যাপারে মসলা-মাসায়েলের প্রয়োজনীয়তাও আর নেই। কিন্তু এরা এ কথা বোঝেন না যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই যেখানে নেই সেখানে ঐ ব্যক্তিগত নিয়ম-কানুন মেনে জীবনযাপন করার কোনো দাম নেই। এই জন্যই রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, এমন সময় আসবে যখন মানুষ সারা মাস রোজা রাখবে, তা শুধু না খেয়ে থাকা হবে এবং রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে, তা শুধু ঘুম নষ্ট করা হবে- এখন সেই সময়।

বর্তমানে 'মুসলিম' দুনিয়ার এই পুরোহিত শ্রেণির জন্ম ধর্মের, দীনের ইতিহাসে নতুন নয়। এই শ্রেণি সৃষ্টির অনুমতি আল্লাহ কোনো দীনকেই দেননি, অন্তত যে কয়টি দীন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তার আগেরগুলির কথা বলতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক দীনেই এরা গজিয়েছেন। নিজেদের নিজেরা সৃষ্টি করেছেন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, সম্মান, প্রভাব ইত্যাদি ভোগ করার জন্য। আর প্রত্যেক দীনকেই, জীবন ব্যবস্থাকেই তারা নতুন ব্যাখ্যা করে নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেছেন, গুরুত্বের (Priority) উল্টা-পাল্টা করে ফেলেছেন, যার ফলে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে গেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান,

ইহুদি ইত্যাদি প্রত্যেক দীনের ঐ একই ইতিহাস, একই অবস্থা। শেষ ইসলামে এই শ্রেণির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই উম্মাহ যখন তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে, সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করে মানব জীবনে শান্তি আনয়নের সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে রাজত্ব করতে আরম্ভ করল অর্থাৎ তাদের নেতার, রসুলাল্লাহর (সা.) প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ করে এই দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করে জাতিকে বহু ভাগে ভাগ করে ফেললেন, জাতির আকিদা নষ্ট হয়ে গুরুত্ব উলটে-পালটে গেল, তখন জন্ম হল এই পুরোহিত শ্রেণির।

অতি বিশ্লেষণের ফলে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা যা জাতির সর্বস্তরের মানুষের জন্য এসেছিল তার ব্যাখ্যা ইত্যাদি করার অধিকার কেবল এই বিশেষ শ্রেণি অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণিটির হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। স্বভাবতই, কারণ যে আদেশ নিষেধগুলি জাতির সবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে তা সবারই বোধগম্য ছিল- কিন্তু ওগুলিকে বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের বোঝার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে- ফলে ঐ বিশ্লেষণ নিয়ে ঘাটাঘাটি করায় ব্যস্ত ঐ শ্রেণিটির মধ্যে তা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং পরবর্তীতে জীবন-বিধানের সব রকম ব্যাপারে তাদের মতামত হয়ে দাঁড়িয়েছে চূড়ান্ত। এমনি করেই প্রতি জীবন-বিধান, প্রতি ধর্মে এরা এই পুরোহিত শ্রেণিটি নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছেন এবং জীবনবিধানের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট হয়ে গেছে। জাতির জনসাধারণ অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে পুরোহিতদের কাছে প্রক্রিয়ার ছোট খাট ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে বিধান (ফতোয়া) জানতে চেয়েছে আর পুরোহিতরা অতি উৎসাহে নতুন নতুন দুর্বোধ্য বিধান তৈরি করেছেন আর তা তাদের দিয়েছেন।

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি শুধুমাত্র ধর্মের কথা বলবে আর অন্যরা বলতে পারবে না- এই নীতি যে ইসলামের নীতি নয় এটা কেবল আমাদের দাবি নয়, ইসলামী বিশ্বকোষও এ কথাই বলছে। সেখানে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে:

» ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো নবী অতি-মানব নহেন, তাঁহার কোনো উত্তরাধিকারী ধর্মাধিকরণরূপে অভ্রান্ত (Infallible) বিধান দেওয়ার কোনো অধিকার লাভ করে না, অনুসারীর পাপ মোচনের ক্ষমতা অর্জন করে না। পৌরোহিত্য বা যাজকত্বের স্থান ইসলামে নাই। সুতরাং Theocracy (মোল্লাতন্ত্র) -ও ইসলামে অবান্তর।

» ধর্মপুস্তক অর্থাৎ কোর'আনের অধ্যয়ন এবং ইহার ব্যাখ্যা দান কোনো Consecrated সম্প্রদায়ের বা কোনো বর্ণের বিশেষ ইখ্‌তিয়ারভুক্ত নহে।

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃ, ইসলাম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ (হাদিসঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, সুনানে ইবনে মাজাহ)। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরজ মানেই অন্ধত্ব নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই জ্ঞান কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার কারণে আজ এই ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষই ধর্মান্ধ। ইসলামের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সামগ্রিক ধারণা নেই বললেই চলে। মুসলিম সমাজের প্রত্যেককে কোর'আনের পণ্ডিত হতে হবে, ফকিহ মুফতি হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু জীবন চালাতে প্রয়োজন পড়ে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ নিষেধ, সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে। যেমন যে ব্যবসা করবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধগুলো কী কী। যে বিয়ে করবে তাকে অবশ্যই বিয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলো জানতে হবে। এই জ্ঞানগুলো অর্জন করাই বাধ্যতামূলক। ইসলামী বিশ্বকোষে এটাই বলা হয়েছে যে, কোর'আন অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যা দান কোনো পৃথক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এর অধ্যয়ন, শিক্ষা ও প্রচার প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ তাঁর দীনের জ্ঞান, হেদায়াতের জ্ঞানের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময়, অর্থমূল্য, স্বার্থসিদ্ধিকে সামানান ক্বালিলা বা তুচ্ছমূল্য বলে বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং মজুরি (আরবিতে উজরান) গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জীবনব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য মানব সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। এটার মালিক কোনো মানুষ নয়, এটা কোনো ব্যবসায়িক পুঁজি বা পণ্য নয়, এটা কোনো গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয় যে কেউ একে বিক্রি করে ভোগ করতে পারে। এটা মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে, তাই এর কোনো পার্থিব বিনিময় চলে না। আল্লাহ বলছেন শুকর খাওয়া হারাম, মৃত জন্তু খাওয়া হারাম, তারপর বলছেন নিরুপায় হলে তাও খেতে পারো। কিন্তু ধর্মের বিনিময় নেয়া একেবারে হারাম যার কোনো ক্ষমা নেই। সুরা বাকারার ২:১৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা- (১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না, (২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, (৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও করবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী ক্রয় করেছে, (৬) তারা

দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে, (৭) আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল'।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইসলামের সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলো কাজ করবে। আর প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা মানুষ লাভ করবে 'উলিল আমরের' মাধ্যমে। প্রতি দুইজন মানুষেরও একজন আমির থাকবে, তাই কারো পক্ষেই ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সুযোগ থাকবে না। **এই 'উলিল আমর' রাষ্ট্রের চেইন অব কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত। তিনি কোনো বিচ্ছিন্ন পেশাদার (Professional) পুরোহিত বা ধর্মযাজক নন। 'উলিল আমর' একটি শাসনতান্ত্রিক পদ।** সুরা ইয়াসিনের (৩৬:২১) নাম্বার আয়াতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহ আনুগত্য করতে বলেছেন এমন ব্যক্তির যারা কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করে না এবং নিজেরা হেদায়াতে আছেন।

বিশ্বের সর্বত্র মসজিদগুলোতে আজ নামাজের মধ্যে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কয়েকশ' টাকার বেতনভোগী বেচারা প্রকৃতির 'ধর্মীয়' ইমাম সাহেবের পেছনে তার তকবিরের (আদেশের) শব্দে ওঠ-বস করেন সমাজের এমন নেতারা যারা রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। সালাত শেষ হলেই কিন্তু ঐ 'অধর্মীয় নেতারা' আর 'ধর্মীয় নেতার' দিকে চেয়েও দেখেন না, পাত্তাও দেন না। কারণ তারা জানেন যে ঐ বেচারা প্রকৃতির 'ধর্মীয়' নেতার দাম কয়েকশ টাকা বেতনের বেশি কিছুই নয়, জাতীয় জীবনে তার কোনো দাম নেই, প্রভাব নেই। ঐ 'ধর্মীয় নেতারা' অর্থাৎ ইমামরা যদি 'অধর্মীয় নেতাদের' সামনে কোনো ধৃষ্টতা-বেয়াদবি করেন বা নিজের কোনো স্বাধীন মত প্রকাশ করতে যান যা তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তখনই তাদের নেতৃত্ব অর্থাৎ মসজিদের ইমামতির কাজ শেষ। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ ও পায়রবি করতে করতে এই জাতি এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, ঐ খ্রিষ্টানদের পোপ-পাদ্রিদেরও তাদের জাতির উপর যেটুকু সম্মান ও প্রভাব আছে, আমাদের হতভাগা মুসলমান জাতির এই 'ইমাম'দের তাও নেই।

আল্লাহর রসুল আলেম ওলামাদেরকে তাঁর ওয়ারিশ, উত্তরাধিকার বা ওরাসাতুল আম্বিয়া বলেছেন (হাদিস)। আম্বিয়ারা যেভাবে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন নিঃস্বার্থভাবে এবং কোনো বিনিময় গ্রহণ করেননি, যারা আম্বিয়াগণের ওয়ারিশ তাদেরকেও বিনামূল্যেই দীনের জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে নবী-রসুলদের চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই আল্লাহর কেতাবকে নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে দুনিয়ালোভী একটি শ্রেণি। তাদের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, 'তাঁদের পর কিছু লোক কেতাবের ওয়ারিশ

হলো কিন্তু তারা এর বিনিময়ে দুনিয়ার নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করত এবং বলত আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তাদের নিকট কি এই ওয়াদা নেওয়া হয় নি যে আল্লাহর ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলবে না? (সুরা আরাফ ৭:১৬৯)

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ কেবল শেষ রসুলকে সত্য প্রচারের বিনিময়ে কোনো মজুরি, সম্পদ, বিনিময় (payment, wealth, reward) গ্রহণ না করার জন্য অন্তত ছয়টি আয়াতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, তাদেরকেই (নবীদেরকেই) আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর; বল! এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। এটা তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ (সুরা আনআম ৬:৯০, সুরা ইউসুফ ১২:১০৪, সুরা সা'দ ৩৮:৮৬, সুরা শুরা ৪২:২৩ সুরা তুর: ৫২:৪০, সুরা মুমিনুন: ২৩:৭২)। সুতরাং শেষ রসুলের উম্মতের জন্যও এই হুকুম পালন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

প্রত্যেক নবী-রসুল তাদের জাতির উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। এ বিষয়ে নবী রসুলদের (আ.) বেশ কয়েকজনের ঘোষণা আল্লাহ দৃষ্টান্তস্বরূপ পবিত্র কোর'আনেও সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন নূহ (আ.) এর ঘোষণা: হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট (সুরা হুদ ১১:২৯, সুরা শু'আরা ২৬:১০৯, সুরা ইউনুস ১০:৭২)। একইভাবে বিভিন্ন আয়াতে এসেছে হুদ (আ.) এর একই ঘোষণা (সুরা হুদ ১১:৫১, ১২৭), সালেহ (আ.) এর একই ঘোষণা (সুরা শু'আরা ২৬:১৪৫) লুত (আ.) এর একই ঘোষণা (সুরা শু'আরা ২৬:১৬৪), শোয়েব (আ.) এর একই ঘোষণা (সুরা শু'আরা ২৬:১৮০)। অর্থাৎ শেষ ইসলাম নয় কেবল, পূর্ববর্তী সকল নবীর ইসলামে দীনের বিনিময় গ্রহণ করা ছিল নিষিদ্ধ। মহানবীর উম্মাহর মধ্যেও যেন কখনও দীনের বিনিময় বা ধর্মব্যবসা প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ এতগুলো আয়াতে একই বিষয় পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করেছেন। এগুলোই সব নয়, আরো বহু আয়াত আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারতাম কিন্তু পাঠককে ক্লান্ত করতে চাচ্ছি না। আমার লেখা **'ধর্মব্যবসার ফাঁদে'** বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সুতরাং ধর্মযাজক শ্রেণি সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতি হবে:

০১. **ধর্মজীবিকা নিষিদ্ধকরণ:** ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে- ইসলাম আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে কোনো যাজক বা পুরোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দীনের কাজের বিনিময়ে যথা নামাজ পড়িয়ে, আজান দিয়ে, কোর'আন খতম করে, ওয়াজ মাহফিল করে, কোর'আন হাদিস তথা দীন শিক্ষা দিয়ে, মিলাদ পড়িয়ে,

বিয়ে পড়িয়ে, দোয়া-মোনাজাত করে, জানাজা ও দাফন পরিচালনা করে, কবর জিয়ারত করে অর্থাৎ পৌরোহিত্য করে অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই এবং সেটার প্রয়োজনও পড়বে না। এই কাজগুলো সত্যনিষ্ঠ আলেমরা এবং রাষ্ট্রের নিয়োজিত প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবাদত হিসাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য নির্বাহ করবেন। তাই এ জাতীয় কোনো পেশা ইসলামের মধ্যে থাকবে না। কোর'আন যেভাবে সুদ নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি দীনের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণও নিষিদ্ধ করেছে। কাজেই তওহীদভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রে সব ধরনের ধর্মজীবিকা নিষিদ্ধ থাকবে। তবে অন্যান্য ধর্মগুলো এই ব্যবস্থার বাইরে থাকবে।

০২. **কর্মসংস্থানের উদ্যোগ:** বর্তমানে অনেক মাদ্রাসাশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যারা বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়েই ধর্মকে জীবিকা হিসেবে ব্যবহার করেন। ধর্মজীবিকা নিষিদ্ধ হলে তারা যেন কর্মহীন না হয়ে পড়েন, সে লক্ষ্যে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেমন, তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়া, তাদের হালাল উপার্জনের জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে, যাতে তারা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। যেহেতু একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই মাদ্রাসাশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কর্মহীন বা বেকার থাকার সুযোগ থাকবে না।

০৩. **সরকারি চাকুরিতে অন্তর্ভুক্তি:** বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতে মাদ্রাসাশিক্ষিতদের অন্তর্ভুক্তির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এজন্য তাদেরকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

০৪. **আরবি শিক্ষকতা:** মাদ্রাসাশিক্ষিতরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে আরবি ভাষা শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা করতে পারবেন। কিন্তু হেদায়াতের বাণী প্রচার করে, কোর'আনের আয়াত শিক্ষা দিয়ে, ওয়াজ করে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। অনেকে ধারণা করতে পারেন এতে কোর'আন শিক্ষার বিষয়টি পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোর'আনের শিক্ষা আরো বেগবান হবে, কারণ রাষ্ট্রীয় খরচে জাতির সকলকে কোর'আনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা হবে।

প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা
(Defense and National Security)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থার অনুসারীদেরকে আল্লাহ একটি 'উম্মাহ' বলে অভিহিত করেছেন (সুরা ইমরান ৩:১১০)। একটি জাতির সদস্যদের ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণ নিয়ে যেমন ঐ ব্যবস্থায় নির্দেশনা রয়েছে, তেমনি জাতির সামরিক বিষয় ও নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েও নীতিমালা রয়েছে। ইসলামে নামাজ যেমন ফরজ (সুরা বাকারা ২:১৫৩), রোজা যেমন ফরজ (সুরা বাকারা ২:১৮৩), যুদ্ধও তেমন ফরজ (সুরা বাকারা ২:২১৬)। প্রশ্ন হচ্ছে যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী হবে- সেটাও পবিত্র কোর'আনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। দুটো আয়াতের উদাহরণ দিয়ে উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করছি। সুরা আনফালের ৩৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত ফেতনা নির্মূল না হয়।' এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয় যে ফেতনা, ফাসাদ, অন্যায় অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাত ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া আল্লাহর নীতি। আবার সুরা নিসার ৪:৭৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না নিপীড়িত নির্যাতিত (মুস্তাদ'আফিন) সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।'

এ আয়াতেও স্পষ্ট হয়ে গেল যে যেখানেই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলবে, মানবাধিকার লংঘিত হবে, সেখানেই ইসলামিক রাষ্ট্রের যুদ্ধনীতি কার্যকর হবে। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'কেতাল' যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। তাই এখানে সশস্ত্র বাহিনীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যখন রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সকল উপায় ব্যর্থ হয় তখন যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়, এটি একটি চিরন্তন সত্য যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক জাতি, রাজ্য ও সভ্যতায় সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থা ছিল-আছে-থাকবে। বর্তমানে আমরা একে প্রতিরক্ষা বাহিনী বলে থাকি। বর্তমানে আমরা একটি জাতির

মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক এই দুটো ভাগ দেখতে পাই। এক্ষেত্রে ইসলামের সাথে প্রচলিত পদ্ধতির একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জাতিরক্ষার দায়িত্ব জাতির (উম্মাহ) প্রত্যেকের। তাই রসুলাল্লাহর যুগে গজফিতা দিয়ে মেপে ওজন করে কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে যুদ্ধে পাঠানো হয়নি। বরং গোটা জাতিকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধের সকল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে হয়েছে, এমনকি নারী ও শিশু-কিশোররাও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে; ঠিক যেভাবে দেশের প্রয়োজনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আপামর জনতা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা সামরিক শক্তিবলে আমাদের ভারত উপমহাদেশের ভূখণ্ড দখল করার পর এখানে এক প্রকার নিরস্ত্রীকরণ ও নিবীর্যকরণ (Disarmament and demoralization) প্রক্রিয়া চালু করেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরে তারা ব্যাপকভাবে নিরস্ত্রীকরণ কার্যক্রম শুরু করে। অর্থাৎ এদেশের মানুষগুলো যেন একদম গোবেচারা, নিরীহ, নিরুত্তাপ, চেতনালুপ্ত দাসে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত জিন্দেগির বাইরে যেন জাতীয় চিন্তাভাবনায় না জড়ায় সেজন্য সকল বন্দোবস্ত পাকা করল। তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে, সমাজনেতা ও ভাড়াটে আলেমদের নিয়োগ করে মুসলিমদের জেহাদ অর্থাৎ সামরিক চেতনাকে লুপ্ত করে দিল। ব্রিটিশরা ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে সীমিত সংখ্যক ভারতীয়কে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বেতনভুক্ত সৈন্যে পরিণত করেছিল। এই সেনাবাহিনী মূলত ব্রিটিশ শাসনকে সুসংহত করা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর মাধ্যমে ভারতীয়দের সামরিক চেতনাকে কার্যত রুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের সিস্টেম হল সমগ্র জাতিকেই জীবনভর সামরিক প্রশিক্ষণ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা। ইসলামের ইতিহাস এমন ছিল না যে জাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ জাতিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীতে চাকরি করবে আর বাকিরা দেশ রক্ষার ব্যাপারে নির্বিকার থাকবে আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে। এজন্য আল্লাহর রসুল সমগ্র জাতির নিরাপত্তা রক্ষায় জাতির সকল সক্ষম সদস্যকে একটি ন্যূনতম সামরিক শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগে একে গণবাহিনী (Militia) বলা হয়।

বর্তমানে সামরিক ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে প্রযুক্তিনির্ভর এবং অত্যাধুনিক, কাজেই বাছাই করা একটি নিয়মিত বাহিনী থাকতে হবে যারা যুদ্ধবিদ্যা ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞান হাসিল করবে। তারা পুরো জাতির সামরিক নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু সমগ্র জাতির সক্ষম নারী পুরুষকেও মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ অর্থাৎ সামরিক শৃঙ্খলা, শারীরিক প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার, অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ,

প্রাথমিক চিকিৎসা ও আত্মরক্ষার কৌশলে প্রশিক্ষিত হতে হবে। তারা বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিজ জাতিকে যেমন রক্ষা করবে, তেমনি বিশ্বের যেখানেই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার হবে, মানবাধিকার লংঘিত হবে, সেখানেই তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত ভূমিকা রাখবে। এ কাজটি বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে করা হচ্ছে যার নেতৃত্বে রয়েছে পশ্চিমারাই। এ পর্যন্ত (২০২৪) ৪৩ টি দেশে/অবস্থানে জাতিসংঘের ৬৩ টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৬ জন শান্তিরক্ষী অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন। এছাড়াও আমরা দেখি যে বিশ্বের বহু দেশে যখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লংঘিত হয় সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপ করে; উদ্দেশ্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। গত এক শতাব্দিতে তারা এভাবে কোরিয়া (১৯৫০-১৯৫৩), ভিয়েতনাম (১৯৫৫-১৯৭৫), গ্রেনাডা (১৯৮৩), পানামা (১৯৮৯), হাইতি (১৯৯৪), ইরাক (২০০৩), লিবিয়া (২০১১), সিরিয়া (২০১৪-বর্তমান) ইত্যাদি দেশে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। একইভাবে মানবাধিকার রক্ষায় ইসলামের ন্যায়-সুবিচার, সাম্য ও মৈত্রীর সুমহান বাণী ও ব্যবস্থা অপরাপর জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া ইসলামিক রাষ্ট্রের সামারিক বাহিনীর দায়িত্বের আওতাধীন। এটি যুগপৎ একটি ঐশী দায়িত্ব, কেননা আল্লাহর শেষ নবীকে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি' (সুরা আম্বিয়া ২১:১০৭)। তিনি তাঁর রসুলকে বলছেন, 'হে রসুল আপনি বলুন- হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুল' (সুরা আরাফ ১৫৮)। তিনি রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি হেদায়াহ ও সত্যদীন সহকারে আমার রসুলকে প্রেরণ করেছি যেন তিনি অন্যান্য সকল দীনের (জীবনবিধান) উপর একে বিজয়ী করেন।' (সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯, সুরা তওবা ৯:৩৩)। অতএব, বিশ্বের অপরাপর মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ভূমিকা রাখার সেই প্রেরণা, সেই আদর্শ জাতিকে শিক্ষা দিতে হবে। এই শান্তি মিশন কেবল জাতিসংঘের অধীনে নয়, বরং আমাদের স্বতন্ত্র উদ্যোগেও প্রেরণ করা যেতে পারে। এই কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত সৈনিক (মুজাহিদ) রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করবেন ইসলামে তাদেরকেই শহীদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত (সুরা বাকারা ২:১৫৪, সুরা ইমরান ৩:১৬৯)। ইসলামের সর্বোচ্চ মর্যাদা (Rank) তাদের জন্য রাখা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রও দীন প্রতিষ্ঠার

সংগ্রামে যারা শহীদ হবেন তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেবে এবং তাদের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তবে ইসলামের সামরিক কর্মকাণ্ড কখনও কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। এই সামরিক বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকবেন। প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থাকতে পারে যেমন স্থল বাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী, স্পেশাল অপারেশন ফোর্স, সাইবার ফোর্স ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ঘটনা। হিটলার জার্মানির পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পোল্যান্ড, বেলারুশ, ইউক্রেন অতিক্রম করে রাশিয়া আক্রমণ করেছে, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়াম, ফ্রান্সসহ অন্তত আরো দশটা দেশে আক্রমণ করেছে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশী দেশ সুইজারল্যান্ডকে আক্রমণ করেনি। না করার পেছনে ভৌগোলিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা কারণ থাকলেও সমর বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সুইজারল্যান্ডের মিলিশিয়া সিস্টেম ছিল এর অন্যতম কারণ। তারা সাধারণ নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছে যা বিদেশি শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর। সুইজারল্যান্ড ছাড়াও ইসরাইল, ফিনল্যান্ড, তুরস্ক, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর- এই দেশগুলো তাদের মিলিশিয়া বা সশস্ত্র নাগরিক ব্যবস্থার জন্য পরিচিত। ঠিক এই কাজটি মহানবী (সা.) দেড় হাজার বছর আগে জাজিরাতুল আরবে করেছিলেন। আজকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতায় এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন বলেছেন, '১৮ বছরের সবাইকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।' (বাংলানিউজ ২৪, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের উপর পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি উত্তেজনা সব সময়ই ছিল। আর এখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের তৈরি কোয়াড (যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপানের জোট) এবং অকাসের (অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জোট) মতো জোটগুলো এ অঞ্চলকে চিনের প্রভাবমুক্ত করার জন্য পুরোদমে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে 'পাওয়ার শিফটস: দ্য জিওপলিটিক্যাল চেজবোর্ড ইন এ ফ্র্যাকচার্ড ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় নিরাপত্তাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের (বিআইপিএসএস) প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) আ ন ম মুনীরুজ্জামান বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক কৌশলগত প্রতিযোগিতার ভরকেন্দ্র এখন ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল।' (প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর ২০২৪)। এমনকি আমাদের সেনাপ্রধানও বলেছেন,

সামনে কঠিন সময়। এখন এই কঠিন সময়টা চলে আসার আগেই জাতির সকলকে ন্যূনতম সামরিক শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখার পক্ষে আমাদের এই প্রস্তাবনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। এ বিষয়ে আল্লাহর নীতি কোর'আনে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আর শত্রুদের জন্য প্রস্তুত কর যতটুকু পার শক্তি, ঘোড়া ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি (রিবাত), যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন' (সুরা আনফাল ৮:৬০)।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং একে অপরকে দৃঢ়তা অবলম্বনে সহযোগিতা করো এবং সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকো (রিবাত) এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পার।' উল্লেখ করলে এমন আরো বহু আয়াত আছে। কিন্তু এই দুটি আয়াতই সকলের বোঝার জন্য যথেষ্ট। এই আয়াতগুলোতে 'রিবাত' শব্দটি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় 'রিবাত' বলতে সাধারণত সীমান্ত পাহারা, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, প্রহরায় নিযুক্ত থাকার জন্য স্থাপিত দূর্গ, কেল্লা, ঘাঁটি বা সেনানিবাসকে (Border Garrison) বোঝানো হয়। ইসলামের বিজয়ের যুগে মুসলিম বিশ্বজুড়ে এমন বহু দূর্গ স্থাপিত হয়েছিল। এখনও মিশর, স্পেন, সিরিয়া, তিউনিশিয়া, মরোক্কো ইত্যাদি দেশে সেসব রিবাতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। রসুলাল্লাহ (সা.) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সওয়াব সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'একদিন এক রাত সীমান্ত পাহারা দেওয়া এক মাস রোজা ও রাতে নামাজ আদায়ের থেকে উত্তম।' (সহিহ মুসলিম ১৯১৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রহরায় থাকে, তার আমলনামায় সওয়াব চলতে থাকে এবং মৃত্যুর পরও তাকে রিযিক দেয়া হয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ২৮৮৬)। তবে মনে রাখতে হবে, এসব হাদিসে কেবল সেই দেশের সীমানাকে নির্দেশ করা হয়েছে যে দেশ মো'মেন মুসলিমদের এমন আবাসভূমি এবং সে দেশ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীন) দ্বারা পরিচালিত হয়।

কোর'আনের শিক্ষা ও রসুলাল্লাহর সাহাবিদের দিকে তাকালে আমরা দেখি, তাদের জীবনযাপন ও চরিত্র সামরিক শিক্ষা ও শৃংখলার দিক থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলাম তার উম্মাহর সদস্যদেরকে একটি আদর্শ দ্বারা এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করে যে প্রয়োজনে তারা জান দেবে, শহীদ হবে, নিজেদের সমস্ত সম্পদ মাটি ও মানুষের জন্য উৎসর্গ করবে কিন্তু সম্মান দেবে না, জাতিকে পরাজিত হতে দেবে না, জাতির স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না।

বর্তমানে অনেকে সেনা সদস্যদের বেতনভাতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, কারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সৈনিকদের বেতনভাতা চলে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা যে ঝুঁকি গ্রহণ করে তার গুরুত্ব বিবেচনা করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকাংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছেন (সুরা আনফাল ৮:৪১, হাদিস বোখারি- ৩১২৬, মুসলিম)। কাজেই সৈনিকরা বিদেশের মাটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে গিয়ে যে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেখান থেকে লব্ধ আয়ের অধিকাংশের হকদার সৈনিকরাই।

জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে, অস্ত্র ও প্রযুক্তি আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ভয় দেখিয়ে অনৈতিক চাপ সৃষ্টির ঘটনা বারবার ঘটেছে এবং সেনাবাহিনীগুলো তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষানীতিই পারে জাতিসংঘ বা অন্য যে কোনো পরাশক্তির অনৈতিক দাবির মুখে নিজেদের জাতির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে।

বর্তমানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রায়ই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সেনাবাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অভ্যন্তরে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ বৈষম্য। সুযোগ সুবিধাসহ নানাপ্রকার শ্রেণি বৈষম্য। ইসলামে আমির আর মুজাহিদদের মধ্যে কোনো বৈষম্য দেখা যায়নি। সাধারণ সৈন্য, আমির, সর্বাধিনায়ক এমনকি খলিফা পর্যন্ত এক সঙ্গে, কখনও এক পাত্রে বসে খাবার খেতেন। এমন দৃশ্য দেখে অমুসলিম বাহিনীর লোকেরা চমৎকৃত হয়ে যেত যে এমন শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য কী করে সম্ভব? একটি উদাহরণ দিই। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে আমর ইবনুল আস (রা.) মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া জয় করার পর, বিজিত কপটিক খ্রিষ্টানরা মুসলিম বাহিনীর সম্মানে একটি ভোজের অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। এ আয়োজনে বিভিন্ন পদমর্যাদার সৈন্যদের জন্য আলাদা আলাদা বসার স্থান নির্ধারণ করা হয়। ভোজ শুরু হলে আপ্যায়নকারীরা লক্ষ্য করেন যে, মুসলিম বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলো খালি পড়ে আছে। তারা তাদেরকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে, মুসলিম সেনাপ্রধান আমর ইবনুল আস (রা.) ও অন্যান্য অধিনায়করা সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে বসে ভোজন করছেন। ইসলামের এই অভূতপূর্ব সাম্যনীতি দেখে তারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে যান। (Muslim Conquest of Egypt and North Africa, AI Akram)।

উমর (রা.) একবার একটি সভায় বলেছিলেন, 'আমি যদি কোনো সৈন্যের থেকে ভালো খাওয়ার সুযোগ পাই, তাহলে আমি খলিফা হওয়ার যোগ্য নই।' (বায়হাকি, মুসান্নাহ ইবনে আবি শায়বা)। তাই ইসলামের নীতি অনুসরণ করলে সামরিক বাহিনীতে সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। অফিসার ও সাধারণ সৈন্য একে অপরকে নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসবে, সম্মান করবে এবং যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে; আর বিদ্রোহের তো প্রশ্নই আসে না। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিরক্ষা কৌশল হবে নিম্নরূপ:

০১. **নাগরিকদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ:** সকল নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম সামরিক শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। আধুনিক যুগে একে গণবাহিনী (Paramilitary force) বলা হয়। বর্তমানে সামরিক ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে প্রযুক্তিনির্ভর এবং অত্যাধুনিক, কাজেই বাছাই করা একটি নিয়মিত বাহিনী থাকতে হবে যারা যুদ্ধবিদ্যা ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করবে। তারা পুরো জাতির সামরিক নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু সমগ্র জাতির সক্ষম নারী পুরুষকেও দেশপ্রেম ও ইমানী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণ অর্থাৎ সামরিক শৃঙ্খলা, শারীরিক প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার, অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও আত্মরক্ষার কৌশলে প্রশিক্ষিত করা হবে।

০২. **আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় ভূমিকা:** আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী ও গণবাহিনী বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিজ জাতিকে যেমন রক্ষা করবে, তেমনি বিশ্বের যেখানেই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার হবে, মানবাধিকার লংঘিত হবে, সেখানেই তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত ভূমিকা রাখবে। এই শান্তি মিশন কেবল জাতিসংঘের অধীনে নয়, বরং আমাদের স্বতন্ত্র উদ্যোগেও প্রেরণ করা যেতে পারে।

০৩. **সামরিক কর্মকাণ্ড সার্বভৌমের অধীন:** ইসলামের সামরিক কর্মকাণ্ড কখনও কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। এই সামরিক বাহিনীর যাবতীয় কার্যক্রম সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে থাকবেন।

০৪. **যুদ্ধলব্ধ সম্পদ:** নিয়মিত বেতনের পাশাপাশি শান্তি মিশনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যেমন ক্ষতিপূরণবাবদ প্রাপ্ত অর্থ অধিকাংশ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

০৫. **শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস:** সেনাবাহিনীতে অফিসার ও সাধারণ সেনাদের মধ্যকার বেতনভাতা ও সুযোগ সুবিধার বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যেন

সৈনিকদের মধ্যে কোনো ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়। অফিসাররা তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে যৌক্তিক হারে অবশ্যই বেশি বেতন পাবেন, তবে সাধারণ সৈন্যদের জন্যও একটি ন্যায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের পরিবারের অবস্থা নির্ধারণ করতে খানা জরিপ চালানো হবে এবং তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী বেতন, ভাতা এবং রেশন প্রদান করা হবে।

মো'মেনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা হল এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে।

সুরা সফ ৬১:১১-১৩

বৈদেশিক সম্পর্ক ও কূটনীতি
(Foreign Relations and Diplomacy)

ইসলামের আকিদায় বর্তমানের মত জাতিরাষ্ট্রের (Nation State) কোনো স্থান নেই। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার উৎপত্তি হয় মূলত ইউরোপে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে রাজা, সামন্তপ্রভু ও চার্চের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংঘাত চলছিল। একটি পর্যায়ে ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ইউরোপের সাম্রাজ্যগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এককে ভূখণ্ডে এককে রাজা রাজত্ব করতে থাকে। এরই মধ্যে নিজেদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে যুদ্ধ চলতে থাকে। একটি পর্যায়ে ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণার সূচনা হয়। এই চুক্তি ইউরোপের ৩০ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের ভেতরের বিষয়গুলোতে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার প্রদান করে এবং সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রগুলোর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার স্বীকৃতি নিশ্চিত হয়। পরে, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব জাতিরাষ্ট্রের ধারণার বিকাশে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতির অভিন্ন পরিচয়, সমানাধিকারের ধারণা এবং গণপ্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে, ইউরোপজুড়ে জাতীয়তাবাদের চেতনা বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন ও গঠন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয়রা যখন তাদের উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দিয়ে ফিরে যায়, তখন সেগুলোকে একইভাবে ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্র হিসাবে ভাগ করে রেখে যায়। পরবর্তীতে সেগুলো স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এই জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ইসলামের এক বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণার বিপরীত। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরো মানবজাতি এক জাতি, একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। গত কয়েক শতাব্দ ধরে পরিকল্পিতভাবে ভৌগোলিক স্বাধীনতার নামে পৃথিবীকে দুই শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে হাজার হাজার মাইল অনাবাদি জমি পড়ে আছে, যেখানে গুটি কয় মানুষ পাশবিক ভোগবিলাসে জীবন কাটাচ্ছে। অপরদিকে কোটি কোটি মানুষকে সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ করে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে

নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন মানবাধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না, শান্তি আসবে না। তবে বর্তমানে যেহেতু জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং আছে, কাজেই আমাদের রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রগুলোর কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক - এক কথায় বহুমাত্রিক সম্পর্ক থাকবে। এক্ষেত্রে বর্তমান বাস্তবতায় অন্যান্য জাতিসত্তার সাথে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় (International and Inter-state) সম্পর্ক কেমন হবে তার রূপরেখা কোর'আন ও সুন্নাহয় স্পষ্ট করে বিবৃত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবিত নীতি হবে,

০১. **সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর আধিপত্য:** আমাদের জাতির বাইরে অন্য যত জাতি বা রাষ্ট্র থাকবে তারা কেউ আমাদের প্রভু নয়। আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ। কাজেই নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কোনো স্থান আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় নেই। নবী (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রে কূটনৈতিক মিশন পাঠিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কখনোই মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদাকে খাটো করেননি।

০২. **ইসলামের নীতি শান্তির পক্ষে:** কোনো বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলাম কখনোই অন্য জাতির ওপর অযথা হামলা, শোষণ বা বঞ্চনা করার অনুমতি দেয় না। অন্য জাতিগুলো যদি শান্তি কামনা করে তাহলে আমাদেরকেও শান্তির দিকে ঝুঁকতে হবে। (আল-আনফাল ৮:৬১)। যে কোনো দেশকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক সংকট বা যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় মানবিক সাহায্য পাঠাব।

০৩. **বাণিজ্যনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক:** বাণিজ্যনীতি, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে হবে। সকল দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করা হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে যে কোনো দেশের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। অন্য জাতির চাপের মুখে নিজের দেশকে উন্মুক্ত বাজারে পরিণত করতে দেওয়া যাবে না। মদিনায় নবী (সা.) যখন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন সেখানে তিনি একটি স্বাধীন বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, নবী (সা.) মক্কার কাফেরদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন যা ছিল একটি বহুমাত্রিক কৌশলগত সমঝোতা চুক্তি। প্রথমে এটি মুসলিমদের কাছে অপ্রিয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত এটি ইসলামের জন্য অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়। চুক্তির মাধ্যমে মক্কার কাফেররা মুসলিমদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা ইসলামের প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যা যেমন বন নিধন, অতিমাত্রায়

কার্বন, সিএফসি ও অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস নিঃসরণ, সাগরের দূষণ মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি ও কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

০৪. **বহিঃশত্রু আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা:** যদি কোনো কারণে কখনও বহিঃশত্রু দ্বারা আমাদের রাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য শক্তিবৃদ্ধিকল্পে অন্য যে কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তি করা হবে। সন্ত্রাসবাদ, সাইবার হামলার মত দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জান্তিক সংকট মোকাবিলায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করা যেতে পারে। মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোভাবেই নিজেদের দিক থেকে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মো'মেনগণ! তোমরা কৃত চুক্তি পূরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।' (সুরা মায়েদা ৫:১)। তবে সেই চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রকে তার কোনো অন্যায় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা হবে না। কেননা এর পরের আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। (সুরা মায়েদা ৫:২)। মদিনার নিরাপত্তা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য রসুলাল্লাহ মদিনার বিভিন্ন গোত্র এবং ইহুদিদের নিয়ে মদিনা সনদ (Constitution of Medina) চুক্তি করেছিলেন এবং সেই চুক্তি রক্ষা করেছিলেন। বনি মুস্তালিক, বনি খুজা'আ, বনি নাজিরসহ বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা চুক্তি (Peace Treaty/Non-Aggression Pact) করেন যার মাধ্যমে তারা মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র না করার এবং শত্রুপক্ষকে সহায়তা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে ইসলামি রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব থাকতে পারে, সন্ধিচুক্তি হতে পারে কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র কারো করতলগত হবে না, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপস করতে পারবে না।

০৫. **আদর্শের প্রচার:** মহানবী (সা.) যখন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তখন নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্যান্য রাজা, সম্রাট, গোত্রপতিদের উদ্দেশে তিনি চিঠি প্রেরণ করেছেন। ঐ চিঠিতে যে আদর্শের উপর ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, সেই আদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান করেছেন। যেমন আজকের পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যান্য শক্তিশালী দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন জাতির কাছে লিখিত বার্তা পাঠিয়ে, প্রতিনিধি পাঠিয়ে, বিবৃতি প্রকাশ বা বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধারের জন্য আহ্বান জানিয়ে থাকে। তারা প্রায়ই এই লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, কখনও কখনও শক্তি প্রয়োগও করে, এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করে। আমরাও আমাদের জীবনবিধান ও আদর্শকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সামনে উপস্থাপন করব এবং

সেটা গ্রহণের প্রস্তাব করব। আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হবে। এতে আমাদের ইতিহাস, শিল্পকলা, শিক্ষা এবং দর্শন প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে।

০৬. **কূটনীতিকদের ভূমিকা:** অন্য রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দেশের উন্নয়ন, মানবাধিকার পরিস্থিতি ও বার্তা তুলে ধরার জন্য চৌকস, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন, শক্তিশালী আলোচনা ও যোগাযোগ দক্ষতাসম্পন্ন কূটনীতিকগণ নিয়োজিত থাকবেন। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আপনি প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।' (সুরা নাহল ১৬:১২৫)। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অন্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, দূতাবাস, কনস্যুলেট স্থাপন ও নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। দেশে-বিদেশে নিয়োজিত আমাদের কূটনীতিকগণ সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার মান্য করবেন। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে ন্যায়, বিনয়, সততা ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ-অভ্যর্থনা করা রসুলাল্লাহর সুন্নাহ ছিল। তাঁর আচরণে প্রভাবিত হয়ে ইয়েমেন থেকে আগত প্রতিনিধিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ফিরে গিয়ে তাদের এলাকায় ইসলামের প্রচার চালিয়েছিল। মদিনায় আগত নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদলকে মহানবী (সা.) মসজিদে প্রার্থনার সুযোগ দিয়েছিলেন, যা ইসলামের ধর্মীয় সহনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও সর্বমহলে প্রশংসিত।

০৭. **বিদেশি শক্তির কাছে নালিশ নিষিদ্ধ:** দেশের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো কর্মকাণ্ড- যেমন বিদেশি শক্তির কাছে নালিশ বা লবিং করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এটি কেবল দেশের স্বার্থবিরোধী নয়, বরং রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল হতে পারে। যে কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানে দেশের নিজস্ব সক্ষমতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার ওপর জোর দেওয়া হবে। জাতীয় ঐক্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা সমাধানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে, যাতে বাইরের কোনো দেশের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

০৮. **প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা:** আমাদের দেশ সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য সুরক্ষা এবং ডিজিটাল বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও সকল দেশের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী
(Law Enforcement Agencies)

শেষ রসুলের (সা.) মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানবজাতির একটি অংশে প্রয়োগ ও কার্যকর করার ফল কী হয়েছিল তা একবার দেখা যাক। যারা আমার এই লেখা পড়ছেন, তাদের অনুরোধ করছি আপনারা মনে মনে কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কল্পনা করুন। কল্পনা করুন এই সমাজে অস্ত্র কিনতে বা তৈরি করতে কোনো বাধা নেই, কোনো লাইসেন্স প্রয়োজন পড়ে না, যে কেউ অস্ত্র কিনে বা তৈরি করে তার ঘর ভরে ফেললেও কেউ তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। কল্পনা করুন, এই সমাজে কোনো আইন শৃংখলা রক্ষাকারী অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী নেই। বর্তমানের মতো হাজার হাজার লোক রাখার উপযোগী কোনো জেলখানাও সেখানে নেই। শুধু বড় বড় শহরগুলোতে দুই চারজন লোক রাখার মতো ছোট জেলখানা আছে। কিন্তু সমাজে বলতে গেলে কোনো অপরাধ নেই। বিচারালয়গুলোতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা প্রায় অনুপস্থিত।

আমি জানি, এমন একটি সমাজ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমার আরজ হচ্ছে, আপনারা যা কল্পনা করতে পারছেন না, তা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের জাতি গঠন থেকে শুরু করে এই জাতির আদর্শচ্যুতির ফলে পতন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত বহু বছর ধরে এই অবস্থা বিরাজ করেছিল। **অস্ত্রের মালিকানা, অস্ত্র তৈরি ও বিক্রয়ের উপর সামান্যতম কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও, দেশে কোনো পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল।** দুই একটি অপরাধের ঘটনা কালেভদ্রে ঘটলেও অপরাধী নিজে এসে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দাবি করত। তাকে ধরে আনারও প্রয়োজন পড়ত না। এই অকল্পনীয় অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? এর একমাত্র কারণ, মানুষ মানবরচিত সকল ব্যবস্থা, বিধান প্রত্যাখ্যান করে তার স্রষ্টার দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ করেছিল অর্থাৎ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কারও বিধান মানবো না' এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করেছিল। আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোনো কিছু ঘটতে দেখলে সেটা ঐ সমাজের কেউ বরদাস্ত করত না, সবাই সমস্বরে সেটার প্রতিবাদ জানাতো। বর্তমান সময়ে যেমন অন্যায় করেও মানুষ সমাজে

সম্মানের আসন পায়, ইসলামপূর্ব আরবের জাহেলিয়াতের যুগেও সেটা হত। ইসলাম মানুষকে এখান থেকে সরিয়ে তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমাজের প্রতিটি মানুষ সেই মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। ফলে সেই সমাজে থেকে কেউ কোনো অন্যায় করলে সে সমাজের আশ্রয় হারাতো, নিজ সমাজে সে ধিকৃত ও নিন্দিত হত, সামাজিক মর্যাদা হারাতো। এই কারণে মানুষ অন্যায় করতে নিরুৎসাহিত হত। পাশাপাশি ছিল কঠোর আইনের শাসন। এসব মিলিয়ে অপরাধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। রসুলাল্লাহর যুগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তার জন্য কোনো পুলিশ বাহিনীরও প্রয়োজন হয়নি। কারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করার দায়িত্ব প্রত্যেক মো'মেনের আর মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে তাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। (সুরা ইমরান ৩:১১০)। আল্লাহ আরো বলেছেন, 'তোমরা উত্তম কাজে ও আল্লাহর মানদণ্ড রক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য করো এবং পাপকর্ম ও আল্লাহর দেওয়া সীমালংঘনের কাজে সাহায্য করো না।' (সুরা মায়েদা ৫:২)

তবে পরবর্তীতে খলিফা উমরের (রা.) সময় ইসলামিক রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির পর নিয়মিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম ছিল 'আশ-শুরতা'। নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধ দমন করা, অপরাধীদের গ্রেফতার করা, আদালতের রায় মোতাবেক শাস্তি কার্যকর করা, বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সরকারি সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষা করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বা বিদ্রোহীদের সনাক্ত করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা যে কোনো বিপর্যয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল এই বাহিনীর কাজ। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনামলে আশ-শুরতার প্রধানকে সাহিব আশ-শুরতা (Head of National Security) বলা হতো।

মধ্যযুগের অর্থাৎ সুলতানি যুগের পুলিশি কার্যক্রমের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র শুধু অপরাধীদেরকেই আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি দিত না, প্রয়োজনে চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্য এবং **অপরাধীদেরকে ধরতে না পারার ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্তকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাসহ দায়ীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করত**। এমনকি এই দায়ীদের তালিকায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরও রেহাই দেওয়া হতো না। (History of the Rise of the Mahomedan Power in India of Mahomed Kasim Ferishta)।

আমাদের বাংলাদেশে আফগান সুলতান শেরশাহের আমলে গ্রামে চুরি, ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় গ্রাম-প্রধানকেই প্রথমে এই মর্মে দায়ী করা হতো

যে, হয় সে অপরাধীকে সশরীরে ধরে এনে আইনের হাতে সোপর্দ করবে, না হলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে। অপরাধীকে যে কোনোভাবে ধরে এনে ন্যায়বিচারান্তে কঠোর শাস্তিপ্রদান অথবা সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে বিকল্প হিসেবে দায়িত্ববান কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের বাধ্যতামূলক নিয়ম প্রবর্তনের একটি অনিবার্য ও ইতিবাচক ফল এই হয়েছিল, সুলতানিযুগে বিশেষত শেরশাহের সময়ে সাম্রাজ্যব্যাপী আইন-শৃঙ্খলার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তারিখ-ই-ফিরিশতার সূত্রে জানা যায়ঃ বাংলা, সোনারগাঁও থেকে শুরু করে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল দূরত্বের পথে এতটাই নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, শেরশাহ সুরির শাসনামলে পথচারী ও বণিকদের অনেকেই রাস্তার পাশে তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রি রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। তাদের মনে ডাকাতির হওয়ার কোনো ভয় জাগত না। ইংরেজ ঐতিহাসিক হেনরি বেভারেজ বলেছেন, বাংলা থেকে কাবুল, তেলেঙ্গানা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পথিক ও বণিকরা তাদের মালপত্র রেখে রাজপথে নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। (অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস- কাবেদুল ইসলাম)। কোরায়েশদের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার সাহাবিদেরকে আশ্বস্ত করতে আল্লাহর রসুল ভবিষ্যতের এই পরিস্থিতির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সময় আসছে যখন একা একটি যুবতী নারী মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দিনে ও রাতে সা'না থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে, তার মনে এক আল্লাহ ও বন্য পশুর ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় জাগ্রত হবে না। [খাব্বাব (রা.) থেকে বোখারী ও মেশকাত]

পশ্চিমা সভ্যতার সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার হওয়ার পর আমাদের সমাজের এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা হারিয়ে যায়। কঠোর আইন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ লক্ষ পুলিশও আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। বরং আমাদের সমাজে পুলিশের অবস্থান নানা কারণে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। সরকারি ভাষ্যে পুলিশকে জনগণের বন্ধু বলা হলেও বাস্তবতা বিপরীত। জনগণ পুলিশকে দেখে আতঙ্কিত হয়, এমনকি মায়েরা বাচ্চাদের পুলিশের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। পুলিশের দুরাচারিতা প্রকাশ করতে বাংলা ভাষায় প্রবচন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।' অধিকাংশ মানুষের চোখে পুলিশ এখন রক্ষক নয়, ভক্ষক। পুলিশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো লাগামহীন দুর্নীতি, ঘুষ, অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, হয়রানি, মুক্তির জন্য অর্থ দাবি এবং রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং দমন-পীড়ন চালাতে পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়ে

থাকে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল নয়, সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণিও তাদের প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে পুলিশকে পেটোয়া বাহিনীর মতো ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের কার্যকলাপ পুলিশের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি জনগণের আস্থাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে গেছে। **সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই পুলিশের চাকরিতে যোগদান করেন কিন্তু পরিস্থিতির তাগিদে বেশিভাগ পুলিশই আর সৎ থাকতে পারেন না, কারণ প্রচলিত মানবরচিত সিস্টেমটাই এমন। পথই যখন বাঁকা হয় তখন গাড়ি সোজা চলতে পারে না।**

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, দুর্নীতির তালিকায় পুলিশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর নিচু স্তর থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ঘুষের অর্থ বণ্টনের প্রক্রিয়া চলে, যা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। পুলিশের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনসহ সাধারণ জনগণের প্রতি অমানবিক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও প্রচুর। এমনকি রাজনৈতিক চাপ ছাড়াও নিছক অর্থের লোভে পুলিশের একটি অংশ সাধারণ নাগরিকদের উপর অত্যাচার চালায়। এছাড়া, বহু পুলিশ সদস্য সন্ত্রাসী, মাদক চোরাকারবারি এবং বিভিন্ন অপরাধী চক্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

পুলিশ বাহিনীর বর্তমান হতাশাজনক পরিস্থিতির পেছনে এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাকালের ইতিহাসের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। আধুনিক পুলিশ বাহিনীর জন্ম হয় ঔপনিবেশিক যুগে। এটি সকলেরই জানা যে, ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকেই বাংলায় শুরু হয় ভয়াবহ অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। নবাবের প্রশাসনের বেতনভুক্ত হাজার হাজার সৈন্য, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজদের ব্যয় বহন করা পরবর্তী পুতুল নবাবদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনিতেই এ সময়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নিরাপত্তাহীনতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তার উপরে দ্বৈত শাসনের সময়জুড়ে চাকরিহারা পাইক পেয়াদারা চোর-ডাকাত ধরে তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ ছিনিয়ে নিত, কখনও তারা নিজেরাই চুরি ডাকাতি করত, কখনও তারা তস্করদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লুটের মাল বাটোয়ারা করে নিত।

১৭৯২ সালে প্রথমবার ব্রিটিশরা পুলিশ-ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস Regulations for the Police of the Collectorships in Bengal, Behar and Orissa নামে একটি প্রবিধান প্রণয়ন করেন। সেই প্রবিধানের একাধিক ধারা এখনও বলবৎ আছে। এর মধ্যে ১৫ নম্বর ধারা ছিল- 'চোরাই বা লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করার জন্য দারোগাগণ উক্ত

সকল মালের মূল্যের ওপর ১০% হারে কমিশন পাবে।' (কাবেদুল ইসলাম, অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস)। ফলে দেখা গেল, চোর-ডাকাত পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুণ্ঠিত মালের মূল্যের ১০ শতাংশের চেয়ে বেশি অর্থ পুলিশকে প্রদান করে পার পেয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ **নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে যখন ভালো কাজের কেবল আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার রীতি তৈরি করা হলো তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল।**

ভারতে ১৮৬১ সালে Indian Police Act of 1861 প্রণয়নের মাধ্যমে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই হচ্ছে আধুনিক পুলিশ বাহিনীর কাঠামো, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণের মূল ভিত্তি। এই আইনের অধিকাংশ ধারা এখনও চালু আছে, শুধু সময়ের প্রয়োজনে কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। ব্রিটিশ যুগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশের প্রধান কাজ ছিল স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকারীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন চালানো। তাই গোড়া থেকেই পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বৈরী এবং আজও পুলিশ জনগণের বন্ধু বলে বিবেচিত নয়।

ধর্মীয় বিধান দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাধারণত ধর্মতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র (Theocracy) বলা হয়। ইসলামের নামে পরিচালিত মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিক পুলিশ, শরিয়াহ পুলিশ নামে একটি বিশেষ বাহিনীর কার্যক্রম দেখা যায় যাদের কাজ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশে ও অঞ্চলে 'শরিয়াহ আইন' বলবৎ রয়েছে। এসব দেশে শরিয়াহ আইন বলতে যে আইনগুলোর চর্চা হয়ে থাকে সেগুলো মূলত বিগত এক হাজার বছরে লিখিত বিভিন্ন ফিকাহ ও মাস'আলা-মাসায়েলের গ্রন্থাদি থেকে উৎসারিত। শরিয়াহ রাষ্ট্রের (Sharia-Based State) অনেক আইন নিয়ে ইসলামের বিভিন্ন মাজহাবের ফকিহদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। আর কোর'আন ও রসুলাল্লাহর সুন্নাহর সঙ্গেও রয়েছে এসব শরিয়াহ রাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈপরীত্য। তাই যেসব এলাকায় কথিত 'শরিয়াহ আইন' প্রতিষ্ঠিত আছে, সেসব এলাকায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের সেই অনাবিল সৌন্দর্য প্রকাশিত হওয়ার বদলে শরিয়াহ আইনের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে 'শরিয়াহ পুলিশ' বা মোরাল পুলিশ নামক বিশেষ পুলিশিং ব্যবস্থা।

এই নৈতিক পুলিশ বাহিনীর কাজ হচ্ছে কে কতটুকু 'রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ' পালন করল সেটা তদারকি করা- যেমন কোনো নারীর হেজাব ঠিক আছে কিনা, তাদের চুল দেখা যাচ্ছে কিনা, কোনো মেয়ে আঁটশাট পোশাক পরল কিনা, কোনো পুরুষ দাড়ি কামালো কিনা, কেউ হাফপ্যান্ট বা পশ্চিমা

স্টাইলের পোশাক পরল কিনা, নামাজের সময় কেউ দোকান খোলা রাখল কিনা, কেউ মসজিদে না গিয়ে ঘোরাফেরা করছে কিনা, রমজানে কোনো খাবার দোকান খোলা রেখেছে কিনা, কেউ রোজা না রেখে বাড়ির বাইরে খাওয়া দাওয়া করছে কিনা, অবিবাহিত কোনো যুগলকে একসাথে দেখা গেল কিনা, কোনো স্থানে নারী পুরুষ একত্রে কাজ করছে কিনা, কেউ জোরে গান বাজাচ্ছে কিনা ইত্যাদি তদারকি করা।

দেশভেদে এসব 'অপরাধের' ভিন্ন ভিন্ন সাজা রয়েছে, যেমন গ্রেপ্তার, জেল, জরিমানা, উপদেশ, সফর নিষেধাজ্ঞা, প্রকাশ্যে অপমান, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মার, সংশোধনমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ইত্যাদি। নৈতিক পুলিশের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানার জন্য কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি যেগুলো ঘটার পর বিশ্বে এই বাহিনী ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছে।

ইরান: ইরানের নৈতিক পুলিশ বাহিনীর নাম গাশতে ইরশাদ। নৈতিক পুলিশ প্রসঙ্গে বলতে গেলে মাহসা আমিনির প্রসঙ্গ এসেই যায়। ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ২২ বছরের কুর্দী তরুণী মাহসা আমিনি তার পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে তেহরানে নৈতিক পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, তিনি হিজাব সঠিকভাবে পরেননি, ফলে তার কিছু চুল বেরিয়েছিল। পুলিশ তাকে ডিটেনশনে নিয়ে যায় এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালায়। তাদের নির্যাতনের সময় মাহসা পুলিশি হেফাজতেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং তিন দিন কোমায় থাকার পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এই নির্মম ঘটনায় ইরানজুড়ে তীব্র জনরোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং নারীর অধিকারের দাবিতে সেটা এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে রূপ নেয়। হাজার হাজার নারী তাদের হেজাব পুড়িয়ে, চুল কেটে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সরকার এ আন্দোলন দমনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। আন্দোলনকারীদের উপর নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়, অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করে এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে এই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ৫৩৭ জন মানুষকে হত্যা করা হয়, ১৯,২৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। হতাহতের মধ্যে প্রচুর নারী ও শিশুও রয়েছে।

সৌদি আরব: ২০০২ সালের ১৪ মার্চ মক্কার মোহাম্মদিয়া গার্লস স্কুলে ঘটে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। সেদিন যে কোনোভাবেই হোক স্কুলে আগুন লাগে। তখন আতঙ্কিত হয়ে ছাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু সে জরুরি অবস্থাতেও আরবের নৈতিক পুলিশ (মাতাব) ছাত্রীদেরকে স্কুল থেকে বের হতে দেয়নি, কারণ সে সময় নাকি ছাত্রীদের হিজাব

সঠিকভাবে পরা ছিল না। ফলে ১৫ জন ছাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়, অনেকেই আহত হয়। এই ঘটনায় সৌদি আরবের প্রধান পত্রিকা আল ওয়াতান-এ খবর প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হল, এই অমানবিক ঘটনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ব্যাপক সমালোচনা করলেও সৌদি আরবে এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সমাবেশ হতে দেখা যায়নি।

আফগানিস্তান: ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানে দ্বিতীয়বার তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাদের নৈতিক পুলিশ (বাইরাত) জনগণকে শাস্তি দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। সেখানে নারীদেরকে বিশেষ এক প্রকার বোরখা দিয়ে তাদের পুরো শরীর এমনকি চোখ পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয়। কেউ যদি কোনো শিথিলতা দেখায় তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন তাদেরকে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার ঘটনা গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া মেয়েরা মেকআপ বা প্রসাধনী ব্যবহার করলেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কাউকে কাজ করতে দেখলে তাকে পেটানো হয়েছে। একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, পথচলায় শাস্তির মুখে পড়ে কিছু মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। যেমন একটি ঘটনায় জানা যায়, কাবুলের উত্তরে এক নারী সঠিকভাবে হিজাব না করে রাস্তায় বের হওয়ার কারণে নৈতিক পুলিশ তাকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেয়। শাস্তির পর সেই নারী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং পরবর্তীতে তার মৃত্যু হয়।

এভাবে পৃথিবীর যতগুলো জায়গায় 'শরিয়াহ আইন' চালু করা হয়েছে, সব জায়গায় জনগণের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতা জারি রাখার নাম করে এই নৈতিক পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর রসুল ও খলিফাদের যুগে এ জাতীয় কোনো নৈতিক পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। যেখানে আল্লাহর তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ইসলামের সকল নৈতিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ জনগণকে জানিয়ে দেওয়া হত। সমাজের সবাই যেন এই বিধি-বিধানগুলো জানতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য রসুলাল্লাহ মদিনায় 'হিসবা' নামে একটি সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের প্রত্যেক মানুষের উপর সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে (সুরা ইমরান ৩:১১০)। 'হিসবা' নামক প্রতিষ্ঠানটি এই দায়িত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ করত। কোনো পুলিশি নিপীড়নের দায়িত্ব তাদের ছিল না, তারা কেবল তদারকি করত। জনগণও তাদেরকে এ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য প্রদান করতে পারত।

ইসলামে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধাদান (তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানাহাউনা আনিল মুনকার) জীবনব্যবস্থার একটি মৌলিক দিক, যা সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমেই মূলত সমাজে নৈতিকতা, সততা এবং ইসলামী মূল্যবোধের অনুসরণ নিশ্চিত হয়, ফলে আলাদা করে নৈতিক পুলিশের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রত্যেক মো'মেন অন্যায়কে প্রতিহত করবে তারও তো একটা সঠিক নির্দেশনা বা রূপরেখা থাকতে হবে। বর্তমানে আমরা দেখি জনগণ মোরাল পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দুজন তরুণী চায়ের দোকানের সামনে ধূমপান করছে, অমনি শুরু হয়ে গেল মোরাল পুলিশিং। তাদেরকে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করা হলো, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হলো (বিডিনিউজ২৪. কম-২ মার্চ ২০২৫)। এই সংস্কৃতিকে বলা হচ্ছে মব জাস্টিস বা বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত জনতার বিচার। এই উত্তেজিত জনতা মার্চ ২০২৫ এর মাঝামাঝি সময়ে ১০/১১ বছরের একটি ছেলেকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করল যার মর্মান্তিক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি এরকম পিটিয়ে মানুষ মারা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মাজার ভাঙার শত শত ঘটনা ঘটে গেছে, প্রতিদিন ঘটে চলেছে। ৫ মার্চ ২০২৫ এর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সাত মাসে দেশে অন্তত ১১৪টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। এতে ১১৯ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হয়েছেন। এভাবে গত ১০ বছরে গণপিটুনিতে মারা গেছেন কমপক্ষে ৭৯২ জন। আহত হয়েছেন ৭৬৫ জন। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ইজাজুল ইসলাম বলেন, 'রাজনৈতিক ক্ষোভের কারণে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অনেকে গণপিটুনির ঘটনা ঘটাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখনো পুরোপুরি কার্যকর নয়। আবার চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে ক্ষোভের কারণে অনেকে সন্দেহ করে গণপিটুনির ঘটনা ঘটাচ্ছে। গণপিটুনি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু গণপিটুনির ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির নজির তেমন নেই, তাই অনেকেই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে।' উল্লেখ না করলেই নয়, গত ছয়মাসে (মার্চ ২০২৫) পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে মোট ২২৫টি। একই সময় সারাদেশে ৮০টি মাজার ও দরবারে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। একদল আরেক দলকে ভণ্ড, বাতিল আখ্যা দিয়ে 'তওহীদী জনতা' নামের আড়ালে ধর্মীয় শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার দাবিতে হামলা চালাচ্ছে।

একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার নাম করে এই 'মোরাল পুলিশিং' এর কাজ করে যাচ্ছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা জেহাদ করছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে যা প্রত্যেক মো'মেনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আসলেই কি তাই? তারা যা করছে তাকে কি ইসলামের পরিভাষায় 'অন্যায়ের প্রতিরোধ- তানাহাউনা আনিল মুনকার' বলা যাবে? অবশ্যই নয়। এটা ইসলামের আইন নয়, এটা জঙ্গলের আইন। ইসলাম একটি সভ্যতার নাম। ইসলামের সভ্যতা অনুসারে অন্যায়ের বাধাদান কীভাবে তার রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কোনো স্থানে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে মো'মেনদের করণীয় হবে অন্যায়কারীকে অন্যায় থেকে বিরত হওয়ার জন্য আদেশ করা। আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'আমর' যার অর্থ আদেশ। যদি সে অন্যায় থেকে বিরত না হয় তাহলে তাকে আটক করার অধিকারও জনগণের রয়েছে। কিন্তু আটক করে মারধোর করা, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো অধিকার জনগণের নেই, মো'মেনদেরও নেই। এমনকি তার অপরাধ সম্পর্কে প্রচার করারও কোনো অধিকার তাদের নেই। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা বা আটক ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করা। লোকটিকে তার অপরাধের দণ্ড দেওয়ার কাজ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের। এ বিষয়ে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'যখন তাদের কাছে কোনো শান্তি-সংক্রান্ত বা ভীতিকর সংবাদ পৌঁছে, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। বরং তারা যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসুল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের কাছে, তখন সেগুলো সম্পর্কে তদন্ত ও অনুসন্ধান করে দেখা যেত।' (সুরা নিসা ৪:৮৩)।

উত্তেজিত জনতার বিচার কখনও সঠিক হতে পারে না। উত্তেজিত অবস্থায় বিচার করাই ইসলামে নিষিদ্ধ (সুনান আত-তিরমিজিঃ ১৩৩১)। ন্যায়বিচার একমাত্র সম্ভব আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে বিচার করা হলে। জনগণ যখন নিজের হাতে বিচারের ভার তুলে নেয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অন্যায়ের তুলনায় বহুগুণ কঠোর শাস্তি দিয়ে দেয়। দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করে নৃশংসভাবে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে, অনেক সময় তাদের চোখ তুলে নেয়, জিহ্বা কেটে দেয়, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। এতে করে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের বা সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না। অনেক সময় নির্দোষ মানুষও সন্দেহ ও গুজবের শিকার হয়ে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতির কবলে পড়ে। এমন ঘটনা বাংলাদেশে অনেকবার ঘটেছে। ছেলেধরা সন্দেহে, ডাকাত সন্দেহে বহু নির্দোষ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীন লোকেরাও মব জাস্টিসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিনা বিচারে একজন মানুষের জীবন

কেড়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে অনেক সময় ভুলবশত নির্দোষ মানুষের মৃত্যুদণ্ড হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন প্রমাণিত হয় যে, সেটি মিথ্যা মামলা ছিল, তখন আর কিছু করার থাকে না। এমন ঘটনা ঘটার কারণে অনেক দেশেই এখন মৃত্যুদণ্ডের আইন রহিত করা হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব দেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশসহ প্রায় ১৪০টিরও বেশি দেশ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে। সেখানে যেখানে সেখানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ মেরে ফেলার মত বর্বরতা কোনো সভ্য সমাজে চলতে পারে না। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ধর্মের নামেই এই অধর্মের চর্চা হয় সবচেয়ে বেশি। তাই এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় ধর্মের। ধর্মবিদ্বেষী গোষ্ঠী খোদ ধর্মকেই সকল অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, যুক্তিহীনতা, কূপমণ্ডূকতা ও নিষ্ঠুরতার কারণ বলে প্রচার করার সুযোগ পায়, আল্লাহ-রসুলকে গালি দেওয়ার সুযোগ পায়। এতে ইসলামের তো কোনো লাভ হয়ই না, বরং মানুষ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

অপরাধীকে বিনা বিচারে ঘটনাস্থলে পিটিয়ে মেরে ফেলার মত ঘটনা আল্লাহর রসুলের সময় একটিও ঘটতে দেখা যায়নি। ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং প্রকাশ্যে মদ্যপানের জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। জানা যায়, রসুলাল্লাহ (সা.) মদ্যপানের কারণে ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। আবু বকর (রা.)-ও একইভাবে ৪০টি বেত্রাঘাত করতেন। কিন্তু উমর (রা.) যখন খলিফা হলেন, তখন তিনি জনগণের মধ্যে মদ্যপানের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে ৮০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন।' (আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে সহিহ মুসলিমঃ ১৭০৬, সহিহ বুখারিঃ ৬৭৭৯)। একদিন একজন লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। লোকজন তাকে ধরে মহানবীর (দ.) দরবারে নিয়ে যাবার জন্য রওয়ানা হল। পথে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়ি পড়ে। লোকজন ইবনে আব্বাসের বাড়ির কাছে আসতেই লোকটি হঠাৎ সবার হাত ছাড়িয়ে দৌঁড়ে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়িতে ঢুকে তাকে জড়িয়ে ধরল। লোকজন তাকে তাঁর কাছে থেকে ছাড়াতে না পেরে আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে যেয়ে ঘটনা বলল। রসুলাল্লাহ (দ.) ঘটনা শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন 'সে তাই করেছে নাকি?' বিশ্বনবী (দ.) কোনো শাস্তির কথা বললেন না। বোঝা গেল যে তিনি অপরাধীর প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। আবার দেখুন মাতাল লোকটিকে রাস্তায় গড়াগড়ি করতে দেখে লোকজন কিন্তু তাকে মারধোর করেনি। তারা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রসুল অর্থাৎ শাসকের কাছে। পথিমধ্যে লোকটি যখন ইবনে আব্বাসের (রা.) কাছে আশ্রয় নিল, তখনও লোকগুলো চাইলে জোর করে ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিতে

পারত। কিন্তু সেটাও তারা করেনি। তারা রসুলকে গিয়ে ঘটনাটি অবগত করেছে। আর রসুলও আর তাকে জোর করে ধরে আনার জন্য বলেননি। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় জনগণ কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিল। দীনের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অন্যতম অভিজ্ঞ সাহাবি ইবনে আব্বাস (রা.) স্বয়ং সেই অপরাধী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কারণ কৃত অপরাধের জন্য লোকটি ক্ষমা চেয়েছিল।

বনী আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) এর নিকট এসে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলো। রসুলাল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে পাগলামীতে পায়নি তো? সে জবাব দিলো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (সা.) এর নির্দেশে তাকে জানাযার স্থানে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। যখন পাথর নিক্ষেপের ফলে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে দৌড়ে পালাতে লাগলো, তখন তাকে ধরে এনে আবার পাথর নিক্ষেপ করা হলো, যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করলো। নবী করীম (সা.) ঘটনা শুনে বললেন, 'লোকটাকে তোমরা যেতে দিলে না কেন?' রসুলাল্লাহ তার সম্পর্কে ভালো কথা বললেন এবং তার নামাজে জানাযা পড়ালেন। আবু দাউদে অতিরিক্ত আছে, নবী করিম (সা.) বললেন 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, অবশ্যই সে এখন জান্নাতের ঝরনাধারায় অবগাহন করছে।' (বোখারি, মিশকাত, ইবনে মাজাহ-২৫৫৪ ও আবু দাউদ- ৪৪০৫ ও ৪৪০৬)।

লক্ষ করুন, লোকটিকে কেউ তার অপরাধের জন্য ধরে নিয়ে আসেনি। সে নিজে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রায়শ্চিত্য লাভের জন্য মৃতুদণ্ডগ্রহণ করতে এসেছে। কতটুকু আত্মিক পরিশুদ্ধি এলে একজন মানুষের পক্ষে এটা করা সম্ভব? এটা উপলব্ধি করে আল্লাহর রসুল তাকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য যতরকম উপায় সম্ভব অনুসন্ধান করেছেন। যখন বুঝতে পেরেছেন যে লোকটি চাওয়া অনেক উচ্চ তখন তাকে দণ্ড দিয়েছেন। সেখান থেকেও যখন লোকটি এক পর্যায়ে শাস্তি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে। লোকজনের এই হস্তক্ষেপ রসুল পছন্দ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন লোকটা যখন চলে যেতে চেয়েছে সে চলে যাক। সুতরাং জনগণের দ্বারা মোরাল পুলিশিং ইসলামে নেই। তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রে মো'মেনও একজন ব্যক্তি, সে কর্তৃপক্ষ নয়। তবে মো'মেনদের যে জাতি অর্থাৎ উম্মাহ, তার একটি কর্তৃপক্ষ আছে। উম্মাহর একটি সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো, বিচারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে। মো'মেনের কাজ কেবল কর্তৃপক্ষকে জানানো, সম্ভব হলে অপরাধীকে ধরে কর্তৃপক্ষের মুখোমুখী দাঁড় করানো।

মোট কথা হচ্ছে, শরিয়াহ আইন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ভীতি রয়েছে সেটা প্রকৃত ইসলামের যুগে ছিল না। বিগত ১৪০০ বছরে ইসলাম বহুভাবে বিকৃত হয়ে বর্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। বহুভাবে ইসলামের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, কোনো ব্যাখ্যা কট্টরপন্থী, কোনো ব্যাখ্যা উদারপন্থী। শরিয়াহ আইন যারা প্রতিষ্ঠা করেছে তারা সেসব জায়গায় জবরদস্তিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে যা ইসলামের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত (সুরা বাকারা ২:২৫৬)। প্রকৃত ইসলামকে মানুষ আলিঙ্গন করে নেয়, আর কট্টরপন্থী মোল্লাতান্ত্রিক ইসলামকে মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে হয়। কারণ তা অপ্রাকৃতিক ও কঠিন, তাতে দীনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করে মানুষের জন্য ভয়ানক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই তাদের চর্চিত শরিয়াহ আইন, মোরাল পুলিশিং ও বর্তমানে চলমান মব সংস্কৃতি দেখে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হবে অমূলক, কারণ প্রকৃত ইসলাম এমন নয়। রসুল ও তাঁর উম্মাহর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের সোনালি সভ্যতাই তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছেঃ

০১. **জনগণের সেবা ও সহযোগিতাঃ** পুলিশ বাহিনী মূলনীতি হতে হবে- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান। কেবল অপরাধীকে পাকড়াও করাই নয়, জনগণের সমস্যাগুলো সমাধান করা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দুঃখ-দুর্দশায় তাদের পাশে দাঁড়ানোও হবে পুলিশের দায়িত্ব। এর মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা হবে পুলিশ বাহিনীর অন্যতম প্রধান কাজ।

০২. **রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তিঃ** পুলিশ বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকবে এবং কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থে কাজ করতে পারবে না। যদি মিথ্যা মামলা গ্রহণ করা হয়, বানোয়াট তথ্য এজাহারে যুক্ত করা হয় বা তদন্ত প্রতিবেদনে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য প্রদান করা হয়, তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩. **পেশাদারিত্বঃ** কারো ধর্মীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে পুলিশ কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ধর্মের অনুশাসন কে কতটুকু পালন করবে কি করবে না সে ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন থাকবে। পুলিশ তার পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে কেবল ফৌজদারি অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতি দ্বারা তাড়িত হয়ে কারো সঙ্গে অপেশাদার আচরণ করবে না। যেমন তারা খুন বা খুনের চেষ্টা, কাউকে আঘাত করা, চাঁদাবাজি, ভুয়া তথ্য প্রচার, হুজুগ ও গুজব সৃষ্টি, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি, ডাকাতি, চুরি, ধর্ষণ, অপহরণ ও পাচার,

অগ্নি সংযোগ, প্রতারণা, ঘুষ ও দুর্নীতি, অর্থপাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন, অন্যের মানহানি, নাশকতা, আদালতের আদেশ অমান্য, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, আত্মহত্যার প্ররোচনা, অবৈধ অস্ত্র রাখা বা ব্যবহার, মাদকদ্রব্যের অপরাধ, সাইবার ক্রাইম, আতঙ্ক সৃষ্টি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, পরিচয় জালিয়াতি, বে-আইনী সমাবেশ ইত্যাদিসহ যে ফৌজদারি অপরাধগুলো অন্যের অধিকার লংঘন করে, মানুষের সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। তারা অপরাধীদের গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করবে।

০৪. **সন্দেহপ্রসূত হয়রানি:** আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক সন্দেহ পরিহার করো। কেননা, কিছু সন্দেহ তো পাপ।' (সুরা হুজরাত ৪৯:১২)। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) এর ৫ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক ও নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই পুলিশ বাহিনী কেবল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতার করবে এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো হয়রানি বা রিমান্ডের নামে নির্যাতন করবে না।

০৫. **নারী পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো:** পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্যদের সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে নারীদের প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন এবং নির্যাতন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সঠিকভাবে তদন্ত এবং প্রতিকার করা হবে। একইভাবে, নারী পুলিশ সদস্যদের দ্বারা নারী অপরাধীদের তদন্ত করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য সহায়তা প্রদান করা যাবে।

০৬. **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং স্বচ্ছতা:** পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। এতে করে পুলিশ বাহিনী তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে এবং দুর্নীতি বা অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। নির্দিষ্ট সময় পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন চালানো হবে।

০৭. **নৈতিক চরিত্র ও পেশাগত দক্ষতার প্রশিক্ষণ:** পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে আত্মিকভাবে উন্নত ও আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলার মতো চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি বছর আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে তারা পেশাগত দিক থেকে আরও উন্নত হতে পারে। এই প্রশিক্ষণে আইন, মানবাধিকার এবং জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে শেখানো হবে। বিশেষ করে, নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে আচরণ সংক্রান্ত আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য (Economy and Commerce)

পাশ্চাত্যের প্রবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনীতি হচ্ছে ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের নীতি হচ্ছে তা রাষ্ট্রের সম্পদকে সাপটে এনে গুটিকয় মানুষের হাতে জমা করে। আর অধিকাংশ মানুষ অর্থের জন্য তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, যাকে আধুনিক ভাষায় বলা হয় পুঁজির দাস (Wage slave)। অর্থই হচ্ছে বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থার রক্তপ্রবাহ। তাই অর্থের দাস না হয়ে মানুষের উপায় থাকে না। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা বিধি-বিধান আর নিবর্তনমূলক আইন-কানুনের বেড়াজালে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, তার সার্বিক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এভাবে তারা একদিকে পরিণত হচ্ছে আইনের দাসে, অপরদিকে পুঁজির দাসে। কিন্তু ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ হবে আল্লাহর দাস। আল্লাহর দাসত্বের মধ্যেই নিহিত আছে সকল মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতা। যখন প্রতিটি মানুষ আল্লাহর দাসত্বকে অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলে মনে করে, তখনই সে তার তুলনায় শক্তিমান কোনো মানুষ বা গোষ্ঠীর দাসে পরিণত হয়। তখন সে মানুষ হয়েও আরেক মানুষের দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারিতা তাকে পরাধীন করে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষ কখনোই মানবরচিত ব্যবস্থার দাসে পরিণত হবে না, তাহলেই সে হবে প্রকৃত স্বাধীন। মানুষকে স্বাধীনভাবে জীবনের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হয়েছে। তবে তার কল্যাণের জন্য কিছু নির্দিষ্ট আদেশ-নিষেধের সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর দীনে দণ্ডবিধি দিয়েছেন খুবই কম। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, অপবাদ আরোপ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি- মাত্র এই কয়টি অপরাধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তির বিধান তিনি দিয়েছেন। আর তিনি দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি, অতিবিশ্লেষণ, অতিব্যাখ্যা নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষ অল্প কিছু নীতিমালা ও বিধানের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবে। পদে পদে আদেশ নিষেধের বেড়াজালে মানুষের চিন্তা ও গতিকে রুদ্ধ করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আল্লাহর নীতিমালা অতি সহজ ও সরল।

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সংকট হলো নিরাপত্তা সংকট, এরপরেই হলো অর্থনৈতিক সংকট। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সমস্যাগুলো আসে। আমাদের

প্রস্তাবিত রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আমরা যে অর্থব্যবস্থার প্রস্তাব করছি তা হলো, বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। এটি একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা যা মানুষে মানুষে বিপুল আয়বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক অর্থনীতির কারণে গুটিকয় পুঁজিপতির কাছে জাতির অধিকাংশ সম্পদ জমা হয়ে যাচ্ছে আর অপরদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণেই বর্তমানে বিশ্বের ৬৩% সম্পদ মাত্র ১% ধনীর হাতে জমা হয়ে গেছে (১৭ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো)। এই ব্যবস্থায় ধনীদের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট তৈরি হচ্ছে, যা অধিক মুনাফার লোভে নিত্যপণ্যসহ সকল পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজারমূল্য বাড়িয়ে তুলছে। ধনতন্ত্রের চর্চার ফলে ব্যাংক, বিমা, স্টক মার্কেটসহ প্রচুর আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ জমা হয়ে যাচ্ছে। অর্থের এক জায়গায় জমা হয়ে যাওয়ার কারণে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জালিয়াতি সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্যই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন (সুরা বাকারা ২:২৭৫)। তাই ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো যুক্তিতেই সুদ চলবে না, এটি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

সুদ কী? কোর'আনে সুদ বোঝাতে রিবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'রিবা' শব্দটি এসেছে আরবি 'রাবা' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'বৃদ্ধি পাওয়া', 'বর্ধিত হওয়া' বা 'অতিরিক্ত বৃদ্ধি'। ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ হলো কোনো অতিরিক্ত অর্থ বা মূল্য, যা কোনো বিনিময় ছাড়াই নেওয়া হয়। এটি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কোর'আন নাজিল হওয়ার সময় আরব সমাজে মূলত দুই ধরনের সুদ প্রচলিত ছিল:

১. নগদ অর্থের সুদ (Riba al-Nasiah): আর্থিক ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল অর্থের ওপর অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ ধার্য করা হতো। যদি ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারতো, তবে সুদের হার আরো বাড়িয়ে দেওয়া হতো।

২. দ্রব্য সামগ্রীর সুদ (Riba al-Fadl): তখন আরবে মুদ্রার পাশাপাশি লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। একে 'বদল' (Commodity Exchange) বলা হতো। তবে একই ধরনের পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু পণ্য গ্রহণ করা হতো, যা সুদ হিসেবে গণ্য হত। যেমন কেউ যদি এক কেজি খেজুর ঋণ নিত, তাহলে নির্দিষ্ট সময় পর তাকে দেড় কেজি খেজুর প্রদান করতে হতো।

এই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য পরবর্তীতে আল্লাহর রসুল সুদমুক্ত কী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

একজন মুসলমান যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তখন তার নৈতিক ও ঈমানি বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর হুকুমসমূহ পালন করা। আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন এটা সবাই জানে (সুরা বাকারা ২:২৭৫-২৭৯, সুরা ইমরান ৩:১৩০, সুরা নিসা ৪:১৬১)। তারপর যদি দেশে সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু থাকে তখন তা মুসলমানদের মনে একটি ধর্মসংকট (Moral conflict) সৃষ্টি করে। আল্লাহ যাকে হারাম করেছেন, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রসুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন (সুরা বাকারা ২:২৭৯) সেই কাজটি যদি আবার রাষ্ট্র বৈধ ও বাধ্যতামূলক করে রাখে তখন তারা কোনদিকে যাবে? তাদেরকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুদের লেনদেনে জড়িয়ে যেতে হয়, তাদেরকে এসব এনজিও, ব্যাংক, ইনস্যুরেন্সসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয় যেখানে তাদেরকে সুদের হিসাব নিকাশ করতে হয়। তারা সকলেই এই নিষেধাজ্ঞাসমূহ জানে যে-

০১. যারা সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের সাক্ষী এবং সুদের হিসাব লেখক- এদের সবার উপর আল্লাহর রসুল লানত করেছেন এবং বলেছেন, তারা সকলেই সমানভাবে গুনাহগার। (সহিহ মুসলিম, সহিহ বোখারি ২০৮৬)।

০২. সুদখোর ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে, যেন তাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। (তিরমিজি-১২০৯, সুরা বাকারা ২:২৭৫)।

০৩. সুদের এক দিরহাম, যা মানুষ জেনে বুঝে গ্রহণ করে, তা আল্লাহর কাছে ৩৬ বার ব্যভিচার করার চেয়েও গুরুতর। (ইবনে মাজাহ: ২২৭৪)

০৪. সুদের ৭০ প্রকার গুনাহ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হলো নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা। (মুসনাদ আহমদ: ৩৮০৯)

এই হাদিসগুলো যে সহিহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ একই কথা কোর'আনেও আল্লাহ বলেছেন। তবু মুসলিমদেরকে সুদের হিসাব করতে হয়, সুদ দিতে হয়। এ কাজগুলো তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও জীবনের তাগিদে করে যেতে হয়। একই সাথে তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে, রাষ্ট্রের প্রতিও আনুগত্য ঘোষণা করে। দুইজন হুকুমদাতা (ইলাহ) তাদের, অথচ মুখে বলছে আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। রাষ্ট্রের প্রতি অবিমিশ্র আনুগত্যের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের কোনো নীতির উপর সন্দেহ থাকা যাবে না। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রে যে কোনো ফতোয়া, মাস'আলা, বাস্তবতার দোহাই দিয়ে সুদের অর্থনীতি চালু রাখা হলে তা মানুষের কাছে নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কোনো না কোনো সময়, কেউ না কেউ কোর'আনের

এই নীতিকে সামনে এনে ধর্মপ্রাণ জনগণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তাই কোনোভাবেই সুদের ব্যবসা, ব্যাংকিং, লেনদেন চালু রাখা যাবে না। পরিবর্তে সুদমুক্ত, ঝুঁকি ও মুনাফার অংশীদারত্বের (Risk and Profit Sharing - Mudarabah and Musharakah) ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করতে হবে। সুদ হবে না এমন যৌক্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট নিশ্চিহ্ন করতে হবে যেন বড় বড় শিল্পপতিদের দাপটে ছোট-মাঝারি বিনিয়োগকারীদের পুঁজি হারাতে না হয়। বিনিয়োগকারীদের পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র, সেই পুঁজি ছোট হোক আর বড় হোক। সেটার জন্য কয়েকটি স্তরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো সজ্জিত করতে হবে। বৃহৎ পুঁজির মালিকদের উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকবে যেন স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ীরা বাজারে টিকে থাকতে পারে। যেমন **ঔষধ উৎপাদনকারী বৃহৎ কোম্পানি হলুদ মরিচের ব্যবসা করতে যাবে না**। সেটা করবে মাঝারি বা ক্ষুদ্র পুঁজির উদ্যোক্তারা।

বর্তমানে বিশ্বে দুই রকমের অর্থব্যবস্থা চালু আছে- সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনীতি কেমন হবে তা তুলে ধরার জন্য এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলামের অর্থনীতির একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে সমাজতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাক:

১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা: প্রধান শিল্প, সম্পদ ও উৎপাদনের মাধ্যমগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২. ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাবদ্ধতা: ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ কম থাকে এবং মুনাফার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

৩. মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকার পণ্যের মূল্য, মান ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. ব্যবসা ও বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ: ব্যক্তিগত খাতের ভূমিকা সীমিত, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বড় অংশ সরকার পরিচালিত হয়।

এক কথায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. ব্যক্তিগত মালিকানা: উৎপাদন উপকরণ (কারখানা, জমি, মেশিন ইত্যাদি) ব্যক্তি বা কর্পোরেট মালিকদের হাতে থাকে।

২. মুনাফাকেন্দ্রিকতা: অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন।

৩. বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি: চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয়, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কর্পোরেট মালিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একদমই থাকে না।

৪. অসুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি: ব্যবসাগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। মিডিয়া ও সেলিব্রেটিদের মাধ্যমে পণ্য ও সেবার চটকদার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে। এর ফলে তাদের সম্পদ ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়।

৫. স্বাধীন উদ্যোগ ও বিনিয়োগ: ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বাধীনভাবে যেমন ইচ্ছা ব্যবসা শুরু করতে পারে ও বিনিয়োগ করতে পারে।

৬. শ্রমবাজার ও মজুরি ব্যবস্থা: শ্রমিকরা তাদের শ্রম বিক্রি করে কিন্তু তারা উৎপাদনের মালিকানা পায় না।

৭. নূন্যতম সরকারি হস্তক্ষেপ: মূলত বেসরকারি খাতই উৎপাদন ও বাণিজ্য পরিচালনা করে, সরকার শুধু নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তবে বাস্তবে ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও আধিপত্য এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, সরকারের পক্ষে 'ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট'-কে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৮. ভোক্তার স্বাধীনতা: পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোক্তাদের পছন্দমত পণ্য ও সেবা কেনার স্বাধীনতার কথা বলা হলেও ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত মূল্যের বাইরে তারা কিছুই কিনতে পারেন না।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভারী যন্ত্রপাতি ও বিপুল পুঁজি কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যাংকও সুদের লোভে এদেরকেই ঋণ প্রদান করে। ফলে তারা বিনিয়োগ বাড়িয়ে ক্রমশ ধনকুবের হয়ে ওঠে।

এবার আসুন দেখা যাক এই দুটো অর্থব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের অর্থব্যবস্থার বৈসাদৃশ্যগুলো কী কী?

১. সুদ নিষিদ্ধকরণ: ইসলামে সুদ (রিবা) গ্রহণ ও প্রদান নিষিদ্ধ। কারণ সুদ অর্থনৈতিক প্রবাহ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর পরিবর্তে ইসলাম পুঁজি ও ঝুঁকির অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সুদমুক্ত বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

২. সম্পদের গতিশীলতা: সম্পদ কোনো জায়গায় সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হতে না দিয়ে দ্রুত গতিতে জাতির মধ্যে সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা

নিশ্চিত করা হয়। সর্বত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজের বৃহৎ অংশ লাভবান হয়।

৩. ব্যক্তি মালিকানার অধিকারঃ ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার অধিকার পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবাইকে উৎসাহিত করে।

৪. যাকাত ও অন্যান্য কর ব্যবস্থাঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার সম্পদের একটি অংশ যাকাত, দান ও ওশর হিসেবে প্রদান করেন। এই অর্থ রাষ্ট্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাজে ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যবহার করে। এছাড়া জনগণের মাথা থেকে ট্যাক্সের বোঝা কমানোর জন্য সরকারি ব্যয় সরকারি সম্পদের আয় থেকেই নির্বাহ করা হয়।

৫. ভোগবাদ নিয়ন্ত্রণঃ ভোগবাদী সমাজে সম্পদের লোভ মানুষের অস্থিরতার মূল কারণ। ইসলাম মানুষের মধ্যে নির্লোভ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও ত্যাগের মানসিকতা প্রসারের মাধ্যমে ভোগের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৬. ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের অবসানঃ ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সঠিক প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন। ইসলাম মজুতদারি বন্ধ করে সিন্ডিকেটমুক্ত পরিবেশে নিরাপদে সকল ব্যবসায়ীকে ব্যবসার পরিবেশ দেয় এবং পুঁজি হারানোর ঝুঁকিকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসে।

৭. সম্পদ-নির্ভরতাঃ ইসলামের অর্থব্যবস্থা কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব আরোপ করে। এতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি নাগরিক ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

সুতরাং পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্রের নীতি হল জনসাধারণের সম্পদ সাপটে এনে কেন্দ্রীভূত করে এক বা একাধিক স্থানে জড়ো করা। সমাজতন্ত্রের নীতি হল জনসাধারণের সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নেওয়া। মূলে একই কথা, দু'টোই জনসাধারণকে বঞ্চিত করা। পুঁজিবাদে (Capitalism) দেশের, জাতির সম্পদ পুঞ্জীভূত করে সংখ্যালঘিষ্ট মানুষের হাতে ব্যাংক, বীমা, স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে। যার ফলভোগ করে অতি অল্পসংখ্যক লোক এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ট মানুষকে বঞ্চিত করে বিরাট ধনী হয়ে যায়। আর সমাজতন্ত্র দেশের, জাতির সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাষ্ট্রের হাতে। জনসাধারণকে দেয় শুধু খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক, মৌলিক প্রয়োজনগুলো, যদিও কার্যক্ষেত্রে তাও সুষ্ঠুভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রে পণ্যের উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, মাননিয়ন্ত্রণ, বণ্টন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে যা উপরে বলে এসেছি। ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্যক্তি উদ্যোগ

উৎসাহ হারিয়ে যাওয়ার মাসুল দিতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এত বড় দেশ হয়েও কখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি, একটা পর্যায়ে ভেঙে গেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করে হাতে গোনা কতকগুলি কোটিপতি সৃষ্টি হয়, বাকি জনসাধারণ জীবনের প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকেও বঞ্চিত হয়। আয়বৈষম্য ছাড়াও সম্পদের অসম বণ্টন, শ্রমিক শোষণ, সামাজিক অস্থিরতা, ঋণগ্রস্ত হওয়া ইত্যাদি সংকটও পুঁজিবাদের ফলে অবধারিতভাবে সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থা যতটুকু পরিধিতে প্রয়োগ করা হবে ততটুকু পরিধিতেই ঐ ফল হবে। একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে যেমন ঐ রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্রের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কোটিপতি সৃষ্টি হবে ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীময় প্রয়োগ করলে কয়েকটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র বিপুল ধনী হয়ে যাবে আর অধিকাংশ রাষ্ট্র চরম দারিদ্রের মধ্যে পতিত হবে- যেমন বর্তমানে হয়েছে। এর কারণ হল একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সম্পদ যেমন সীমিত- তেমনি পৃথিবীর সম্পদও সীমিত। সীমিত যে কোনো জিনিসকেই কোথাও একত্রিত করা, পুঞ্জীভূত করা মানেই অন্যস্থানে অভাব সৃষ্টি করা। একটি রাষ্ট্রের ভেতরই হোক, আর সমস্ত পৃথিবীতেই হোক, সেটার সম্পদ, যা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কথা, সেটাকে যদি কোথাও পুঞ্জীভূত করা হয় তবে অন্যত্র অভাব সৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সমাজবাদী, পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট (Socialist, Capitalist & Communist) এই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের তৈরি, গায়রুল্লাহর ব্যবস্থা। সুতরাং এর পরিণাম অবশ্যই অন্যায়-অবিচার।

অন্যদিকে শেষ জীবন-ব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রণেতা স্বয়ং স্রষ্টা, আল্লাহ। এই ব্যবস্থার ভিত্তি নীতি (Basic principle) হচ্ছে সম্পদকে মানুষের মধ্যে দ্রুত গতিতে চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ বলছে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় কর; সবার সঞ্চয় একত্র কর, পুঞ্জীভূত কর (ব্যাংকে), আল্লাহ কোর'আনে বলছেন দান কর, ব্যয় কর, সম্পদ জমা কোরো না, পুঞ্জীভূত কোরো না। অর্থাৎ **ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় সঞ্চয় কর অন্যটায় ব্যয় কর।** অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে জাতির সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জীভূত করে। এটাও ইসলামের বিপরীত। কারণ, ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে এবং সম্পদকে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করে না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ চাহিদা থাকে; সে শুধু রাষ্ট্রের জন্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতেই আগ্রহী হয় না, বরং নিজের ও পরিবারের

জন্যই সে কাজ করতে অধিক আগ্রহী থাকে। ব্যক্তির এই স্বতন্ত্র সত্তা (নফস) একটি বাস্তবতা ও প্রকৃতিগত সত্য। নফসের প্রেরণায় সে নিজের সন্তান-পরিজনের কল্যাণে কাজ করতে চায়, যা সম্পর্কে আল্লাহ কোর'আনে উল্লেখ করেছেন-
"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের প্রতি আসক্তিকে মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসবই দুনিয়ার জীবন উপভোগের বস্তু, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।" (সুরা ইমরান ৩:১৪)
এ আয়াতে ব্যবহৃত 'হুব্বুশ শাহ্হাওয়াত' কথাটির অর্থ হলো চিত্তাকর্ষণ, আসক্তি ও মহব্বত। আল্লাহর এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষের এই প্রবৃত্তি তার স্বাভাবিক স্বভাব বা ফিতরাতের অংশ। তাই এই স্বভাবকে উপেক্ষা করে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ কারণেই ইসলাম ব্যক্তি উদ্যোগকে অস্বীকার করেনি, যা সমাজতন্ত্র করেছিল। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যখন কোনো ব্যবসা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়, তখন মালিক সেটিকে নিজের সম্পদ হিসেবেই আন্তরিকতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে পরিচালনা করেন। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণত একই মাত্রার যত্ন ও দায়িত্ববোধ দেখা যায় না। ফলে অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে লাভজনক হওয়ার পরিবর্তে লোকসানের সম্মুখীন হয়।

পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের যেমন আলাদা নিজস্ব অর্থনীতি আছে তেমনি **ইসলামের নিজস্ব অর্থনীতি আছে।** এক কথায় বললে বলতে হয় সেটা হচ্ছে **সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব চালিত করা, কোথাও যেন সেটা স্থবির-অনড় না হতে পারে।** এই জন্যই কোর'আনে এই অর্থনীতির বিধাতা, বিধানদাতা বহুবার তাগিদ দিয়েছেন খরচ কর, ব্যয় কর, কিন্তু বোধহয় একবারও বলেন নি যে, সঞ্চয় কর। পুঁজি করার বিরুদ্ধে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যারাই স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও' (সুরা তওবা ৯:৩৪)। কোনোভাবে যেন সম্পদ পুঁজি করার মত গোনাহে জড়িয়ে না পড়েন এ বিষয়ে রসুলাল্লাহর (সা.) সাহাবিরা সদা-সতর্ক থাকতেন। উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমি স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রসুল! এতে কি পুঁজিকরণ হবে? তিনি বললেন, তুমি যদি যাকাত পরিমাণ হলে যাকাত দিয়ে দাও তাহলে পুঁজিকরণ হবে না। (বোখারি, আবু দাউদ)।

কেউ কেউ সুরা বনি ইসরাইলের ১৭:২৯ নম্বর আয়াতটি উল্লেখ করে এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আল্লাহ এখানে জমা করতে বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও খরচ সংক্রান্ত আয়াত, জমা করা সংক্রান্ত নয়। এখানে বলা হয়েছে, 'তোমার হাতকে তোমার গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আর তা একেবারে প্রসারিত করেও দিও না, তা করলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।' অর্থাৎ কেউ যেন কার্পণ্য না করে আবার ব্যয় করতে করতে একেবারে নিঃস্ব না হয়ে যায়, নিজের খরচের জন্য কিছু রাখে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ যাকাত দেয়া, খারাজ, খুমস ও ওশর দেয়া এবং তার উপর সাদকা দান ইত্যাদি খরচের কথা এতবার বলেছেন যে, বোধহয় শুধুমাত্র তওহীদ অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে প্রভু, ইলাহ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এতবার বলেননি। **কারণ, একটি জাতির এবং পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ যে কোনো পরিধিতে সম্পদ যথাযথ এবং বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঞ্চয় নয়- ব্যয়।** একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে হস্তান্তর, অর্থাৎ গতিশীলতা। প্রতিটি হস্তান্তর যত দ্রুত হতে থাকবে তত বেশি সংখ্যক লোক **ঐ একই সম্পদ** থেকে লাভবান হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধরুন একটি একশো টাকার নোট। এই নোটটা যার হাতেই পড়ল, সে যথা সম্ভব শীঘ্র সেটা খরচ করে ফেলল। সে খরচ যেমন করেই হোক, কোনো কিছু কিনেই হোক বা দান করেই হোক বা কাউকে ধার দিয়েই হোক বা কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেই হোক। ঐ নোটটা যদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দশজন লোকের হাত বদলায় তবে ঐ এক দিনে নোটটা দশজন লোককে লাভবান করবে। আর যদি একশো জনের হাত বদলায় তবে একশো জনকে লাভবান করবে। কারণ প্রতিবার হাত বদলাবার সময় দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই লাভবান হতেই হবে। অর্থাৎ **ঐ সীমিত সম্পদটা অর্থাৎ ঐ একশো টাকার নোটটা যত দ্রুত গতিতে হাত বদলাবে যত দ্রুত গতিতে সমাজের মধ্যে চালিত হবে তত বেশি সংখ্যক লোককে লাভবান করবে; তত বেশি সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক উন্নতি করবে এবং পরিণতিতে সমস্ত সমাজকে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত করবে, সম্পদশালী করবে।** ঐ গতিশীলতার জন্য যে কোনো পরিধির সীমিত সম্পদ সমাজে নিজে থেকেই সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়ে যাবে কোথাও পুঞ্জীভূত হতে পারবে না এবং হবার দরকারও নেই। সম্পদের এই গতিশীলতার জন্য নিজে থেকেই সুষম-সুষ্ঠু বণ্টন হয়ে যাবার কারণে একে রাষ্ট্রায়াত্ব করার কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যক্তির মালিকানাকে নিষেধ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। যা হোক, উদাহরণস্বরূপ যে একশো টাকার নোটের কথা বললাম, সেই নোটটা যদি সমস্ত দিনে কোনো হস্তান্তর না হয়ে

কোনো লোকের পকেটে বা কোনো ব্যাংকে পড়ে থাকে তবে ওটার আসল মূল্য এক টুকরো বাজে ছেঁড়া কাগজের সমান। কারণ সারাদিনে সেটা সমাজের মানুষের কোনো উপকার করতে পারলো না, কারো অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারলো না। আবার বলছি **আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অর্থনীতির বুনিয়াদ-ভিত্তি হল সম্পদের দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিশীলতা** (Fast and still faster circulation of wealth)।

কেউ বলতে পারেন- কেন? একশো টাকার নোটটা অর্থাৎ সম্পদ পকেটে থেকে গেলে, বাক্সে ভরে রাখলে না হয় বুঝলাম ওটা উৎপাদনহীন, নিষ্ফল হয়ে গেল কিন্তু ব্যাংকে জমা পুঁজি তো বিনিয়োগ করা হয় এবং তা উৎপাদনে লাগে। ঠিক কথা কিন্তু ব্যাংকে জমা করা ঐ পুঁজি বিনিয়োগের গতি স্বাধীন মুক্ত হস্তান্তরের চেয়ে বহু কম, কোনো তুলনাই হয় না। তাছাড়া ব্যাংকের সম্পদ বিনিয়োগ করতে বহু তদন্ত, আইন-কানুন, লাল ফিতার দৌরাত্ম, এবং তারপরও ঐ বিনিয়োগের সুফল ভোগ করে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ। শুধু ঐ শ্রেণিটি- যে শ্রেণিটি ইতিমধ্যেই সম্পদশালী, জনসাধারণের অনেক উর্ধ্বে। ব্যাংক কি যে চায় তাকেই পুঁজি ধার দেয়? অবশ্যই নয়। যে লোক দেখাতে পারবে যে, তার আগে থেকেই যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু আরো চাই, শুধু তাকেই ব্যাংক পুঁজি ধার দেয়, এটা সবারই জানা। **যার কিছু নেই, যে ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বন্ধক দিতে পারবে না তাকে ব্যাংক কখনো পুঁজি ধার দেয় না, দেবে না। এক কথায় তৈলাক্ত মাথায় আরও তেল দেয়া, ধনীকে আরো ধনী করা, গরিবকে আরও গরিব করা। সুতরাং ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন অসম্ভব।**

শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয়নি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। জনসাধারণকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকেও নিষিদ্ধ করতে হয়নি। **কারণ সম্পদের ঐ দ্রুত গতিই কোথাও সম্পদকে অস্বাভাবিকভাবে পুঞ্জীভূত হতে দেবে না**। পানির প্রবল স্রোত যেমন বালির বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, সম্পদের স্রোত তেমনি কোথাও সম্পদকে স্তূপীকৃত হতে দেবে না। অথচ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টার যে শক্তিশালী সুফল তারও ফল ভোগ করবে সমাজ। যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করার ফলে আজ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, আজ তারা বাধ্য হচ্ছে মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মালিকানার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। রাশিয়া, ভিয়েতনাম ও চিনে এমনকি কিউবায় ইতোমধ্যেই এ নীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপার পর সরকার ও অন্যান্য ব্যাংককে নির্দিষ্ট সুদে ঋণ দিচ্ছে। সেই অর্থ সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে নির্দিষ্ট সুদে। যারা ব্যাংকে টাকা রাখছে তারাও মূলত টাকা জমা রাখছে না, বরং ব্যাংককে ঋণ দিচ্ছে নির্দিষ্ট সুদে। অর্থাৎ পুরো সমাজ, রাষ্ট্র ঋণের জালে আর সুদের জালে জড়িয়ে পড়ছে। এই পদ্ধতির ফলেই কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক ঋণের জালে জর্জরিত, আবার বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নানামুখী ঋণের জালে বাঁধা। আমাদের দেশেও ঋণের সুদ বাবদ সরকারের ব্যয়ের বোঝা ক্রমেই স্ফীত হয়ে উঠছে। একসময় সরকারের পরিচালন ব্যয়ের ৩০ শতাংশেরও কম অর্থ ব্যয় হতো ঋণের সুদ পরিশোধে। কিন্তু চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পরিচালন ব্যয়ের ৫১% অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এ খাতে (৪ ডিসেম্বর ২০২৪, বণিকবার্তা)। এটাই হচ্ছে সুদের চোরাবালি। শুধু তা-ই নয়, সুদের বিনিময়ে রাষ্ট্র বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমাণ ঋণ করেছে সেই ঋণের পরিমাণ ১০৪ বিলিয়ন ডলার (সূত্র: বিডিনিউজ২৪.কম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪) যার বিপরীতে সুদ দিতে হচ্ছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা (সূত্র: প্রথম আলো, ১ জুন ২০২৪)। এভাবেই একটি দেশ একসময় দেউলিয়া হয়ে যায়। আমাদের দেশও দেউলিয়াত্বের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রমাণ ২০২৩ সালে আইএমএফ বাংলাদেশকে Extended Credit Facility (ECF), Extended Fund Facility (EFF), এবং Resilience and Sustainability Facility (RSF) এই তিনটি ক্যাটাগরির অধীনে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের Bailout Loan অনুমোদন করেছিল (সূত্র: ডেইলি স্টার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪)। এই ধরনের ঋণ মূলত কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক পতন এড়াতে সহায়তা করার জন্য দেওয়া হয়। বাস্তবে বাংলাদেশ যেভাবে ঋণের জালে আটকা পড়েছে তা দেউলিয়া হওয়ারই নামান্তর।

এখন সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী এই অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাদ দেওয়ার কথা বললেই একটি প্রশ্ন আসে- তাহলে পুঁজি সৃষ্টি হবে কীভাবে?

এর উত্তর হচ্ছে, ইসলামি অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় খরচের পরে মানুষের হাতে যে অর্থ থাকবে তা থেকে সে দান করবে, যাকাত দেবে, ওশর দেবে। এরপরে যে অর্থ থাকবে সেই অর্থ সে রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের কাছে বিনিয়োগ বা নিরাপদে রাখার জন্য জমা রাখতে পারে। এখানে কোনো সুদ থাকবে না। রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই অর্থ সুদমুক্ত, ঝুঁকি

ও মুনাফার অংশীদারত্বের (Risk and Profit Sharing - Mudarabah and Musharakah) ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হবে। এখানে বিনিয়োগকারীকে ঝুঁকি নিতে হবে। মুদারাবা পদ্ধতিতে এক পক্ষ বিনিয়োগ করবে ও অন্য পক্ষ মেধা ও শ্রম দেবে। বিনিয়োগকারী ও শ্রম-মেধা প্রদানকারী পক্ষের মধ্যে লভ্যাংশের শতকরা হার নিয়ে চুক্তি হবে। ব্যবসাতে যদি লোকসান হয় তাহলে বিনিয়োগকারী সেই লোকসান নেবে আর শ্রম ও মেধাদাতা কোনো পারিশ্রমিক পাবে না, এটাই তার লোকসান। এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের মালিক হবে বিনিয়োগকারী।

আর মুশারাকা পদ্ধতি হলো অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা। অর্থাৎ এখানে একাধিক বিনিয়োগকারী একটি ব্যবসায়ে যৌথভাবে বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগের শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকে লভ্যাংশের ভাগ পাবে। ব্যবসায়ের মালিকানা থাকবে সকলের। এর ফলে বড় বড় ব্যবসাতেও সাধারণ মানুষের বা অল্প পুঁজির মানুষের মালিকানা সৃষ্টি হবে, সুদের জাল থেকে মুক্ত হবে জাতি। বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাত্ত্বিকভাবে এই পদ্ধতির কথা বলা হলেও কার্যত সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই অনুসরণ করা হয়। সঠিকভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে সুদমুক্ত উপায়ে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে সরকারের অর্থবিভাগের মধ্যস্থতায় জনগণের কাছ থেকে পুঁজি নেবে। কেউ ঋণের জালে আবদ্ধ হবে না, কেউ সুদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে- বিপদগ্রস্ত হয়ে কারও যদি ঋণ প্রয়োজন হয় তখন সে ঋণ পাবে কোথা থেকে? বিনা সুদে, বিনা লাভে তাকে কে ঋণ দেবে? এরও সমাধান ইসলামে রয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রের অর্থবিভাগের একটি শাখা থাকবে কর্জে হাসানা-শাখা। জনগণের কাছে আহ্বান করা হবে জনকল্যাণে কর্জে হাসানা দেওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে পবিত্র কোর'আনে উল্লেখ রয়েছে, 'কে আছ যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (A gracious loan) দেবে, যাতে আল্লাহ তা তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন? আল্লাহ (জীবিকা) সংকুচিতও করেন আর বর্ধিতও করেন; আর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। (সুরা বাকারা ২:২৪৫)।' আল্লাহর এই আহ্বানের কারণে মো'মেনগণ কর্জে হাসানা দেওয়ার ব্যাপারে আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ থাকবে। এই খাতে যারা অর্থ রাখবে তারা যে কোনো সময় চাইলেই অর্থ উত্তোলন করে নিতে পারবে তবে কোনো মুনাফা পাবে না। আর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যথাযথ নিয়ম মেনে আবেদনের ভিত্তিতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এই তহবিল থেকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সহজ কিস্তিতে সেই ঋণ তাকে শোধ করতে হবে। বর্তমানের চরম বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়ার উপর অনেকেই আস্থা রাখতে চাইবেন

না, মনে করবেন যে ঋণ নিয়ে আর কেউ তা ফেরত দেবে না। ফলে একটা পর্যায়ে রাষ্ট্র আর ঋণ দিতে পারবে না বলে অনেকে আশঙ্কা করতে পারেন। অথচ এই ধারণা ইসলামের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান প্রয়োগের ফলে মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আসবে, যার অংশ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসও স্থাপিত হবে। মানুষ বিশ্বাস করবে যে রাষ্ট্র তার বিপদে-আপদে পাশে থাকবে, তাই সে ঋণ ফেরত দেওয়া থেকে বিরত থাকবে না। তাছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেভাবে রাঘব বোয়ালদের কবলে পড়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুঁজি গায়েব হয়ে যায়, সেই পরিস্থিতি যখন থাকবে না, তখন অবশ্যই ঋণ খেলাপির আশঙ্কা থাকবে না। এছাড়াও আল্লাহর তৈরি ঐশী জীবনব্যবস্থার অধীনে মানুষের নৈতিক গুণাবলি বিকশিত হবে। ওয়াদা, আমানতদারি, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলি তাদের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অন্যের টাকা বা রাষ্ট্রের টাকা মেরে খাওয়ার প্রবণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমরা জানি যে, রসুলাল্লাহ (সা.) স্বয়ং ছিলেন আমানতদারিতার প্রতীক। তিনি নবী হওয়ার পূর্বেই মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত বলে ডাকত, কারণ তিনি কখনো কোনো আমানতের খেয়ানত করতেন না। যখন তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখনও তাঁর কাছে অনেক লোকের আমানত রক্ষিত ছিল। এমনকি যারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদেরও অনেকের মূল্যবান আমানত তাঁর কাছে ছিল। হিজরতের সময় রসুলাল্লাহ (সা.) আলী (রা.)-কে মক্কায় রেখে যান, যাতে তিনি সকল আমানত যথাযথভাবে তাদের মালিকদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। পরবর্তীতে যখন আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা আরবসহ অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, রসুলাল্লাহ (সা.)-এর এই আমানতদারিতার শিক্ষা তাঁর জাতির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এরই একটি উদাহরণ খলিফা উমরের (রা.) শাসনামলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এক রাতে এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে একটি সোনার মুদ্রা (দিনার) পড়ে থাকতে দেখেন। এটি দেখে তিনি প্রথমে চিন্তায় পড়ে যান যে, এটি তিনি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন কি না। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ইসলামের শিক্ষা কাজ করে। সকালে তিনি সেই মুদ্রাটি খলিফা উমর (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন এবং স্বর্ণমুদ্রাটি রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেন। তাঁর এই নৈতিকতা দেখে উমর (রা.) অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন, 'আমাদের সমাজে ইসলামের সঠিক নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই মানুষ এত আমানতদার হয়ে উঠেছে।' ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ইসলামবিদ্বেষী ঐতিহাসিকরাও অনেকেই স্বীকার করেছেন

এবং তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ বাংলাদেশের বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থায় গত ডিসেম্বর শেষে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংগুলো ঋণ পাবে ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা। (সূত্রঃ প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)। কল্পনা করুন, যে পরিমাণ অর্থ কেবল ঋণ খেলাপি হয়েছে তা প্রায় আমাদের জাতীয় বাজেটের সমান, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকা কারা মেরে দিয়েছে? না, কোনো অশিক্ষিত কৃষক, শ্রমিক জনতা নয়, এই টাকা মেরে দিয়েছে গুটিকয় ধনকুবের ও রাঘব বোয়াল, যারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। পক্ষান্তরে দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বলে ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় তাদেরকে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেই সামান্য পাঁচ দশ হাজার টাকা ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য তাদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হালের বলদটি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, ঘরের চাল ও টিন খুলে নেওয়া হয়, এমনকি তাদেরকে ভিটেমাটি থেকেও উচ্ছেদ করা হয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনাও প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের নেটফল। এখানে যে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন করার কথা বলা হচ্ছে, প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় তাদেরকে আরো শোষণ করা হয়, আর যাদের প্রচুর আছে তাদের সম্পদ আরো ফুলেফেঁপে ওঠে। বস্তুত, যতই তত্ত্বকথা বলা হোক, দিনশেষে ফলাফলই বলে দেয় যে কোন অর্থব্যবস্থা ন্যায়পূর্ণ এবং কোনটা শোষণমূলক।

এখানে আমরা অর্থনীতির তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা সম্পদ, অর্থ ও মুদ্রা সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করব। আল্লাহর দীনের অর্থনীতি বোঝার ক্ষেত্রে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণভাবে সম্পদ হচ্ছে মূলত সেই জিনিস যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কাজে লাগে। অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী- "Wealth consists of all those things which satisfy human wants and have exchange value." অর্থাৎ, সম্পদ হলো সেই সমস্ত বস্তু যা মানুষের চাহিদা মেটায় এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে। আরেক অর্থনীতিবিদ জে.এফ. স্টিগলিটজ বলেন, "Wealth is not only material possessions but also human capital, knowledge, and resources that contribute to economic growth." অর্থাৎ, সম্পদ শুধু বস্তুগত নয়। এটি মানবসম্পদ, জ্ঞান এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়ক সকল উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং বোঝা গেল প্রকৃতির ভিত্তিতে সম্পদ দুই প্রকার- (ক) বস্তুগত সম্পদ (Tangible Wealth), যা দেখা ও স্পর্শ করা যায় এবং ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন- জমিজমা, বাড়িঘর, ক্ষেতখামার, যানবাহন, কারখানা, যন্ত্রপাতি,

স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। (খ) অবস্তুগত সম্পদ (Intangible Wealth)। এটি এমন সম্পদ, যা দৃশ্যমান নয় বা সরাসরি স্পর্শযোগ্য নয়, কিন্তু যার আর্থিক মূল্য রয়েছে। যেমন- জ্ঞান ও দক্ষতা, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ব্র্যান্ড ভ্যালু ও সুনাম ইত্যাদি।

ইসলামের অর্থনীতি বুঝতে হলে সম্পদ ছাড়াও অর্থ ও মুদ্রা সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। অর্থ এবং মুদ্রার প্রসঙ্গ তখনই আসে যখন সম্পদ থাকে। অর্থ হলো এমন একটি মূল্যবান সম্পদ যা দিয়ে মানুষ পণ্য ও সেবা কিনতে পারে। আর মুদ্রা হলো সরকার অনুমোদিত বিনিময়ের মাধ্যম। এটি ধাতব মুদ্রা (কয়েন), কাগজের নোট বা ডিজিটাল ফর্মে হতে পারে। মুদ্রার মাধ্যমে সহজে কেনাবেচা করা যায় এবং অর্থ লেনদেনের কাজটি সহজ হয়ে যায়। তাহলে সংক্ষেপে, অর্থ হলো সম্পদের মূল্য আর মুদ্রা হলো লেনদেনের মাধ্যম যেমন টাকা-পয়সা, ডলার, রিয়াল ইত্যাদি।

সম্পদ কেবল মানুষের তৈরি বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়; আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। তেল, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি মানুষ তার প্রযুক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করতেও সক্ষম। হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু লালন-পালন, কলকারখানা স্থাপন, কৃষিজাত দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

সুতরাং সম্পদ হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা দুনিয়ার জীবনে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ব্যক্তির জন্য যেমন তেমনি একটি জাতির জন্যও তার সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ কাগজের নোট বা স্বর্ণের টুকরা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। যদিও স্বর্ণের অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে, এটি অলঙ্কার বা বিনিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা জীবনধারণের মৌলিক চাহিদা নয়। প্রকৃত সম্পদ হলো খাদ্য, বাসস্থান, কৃষিজাত পণ্য, ওষুধ, যানবাহন, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। যে রাষ্ট্রে এসব সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, সেই রাষ্ট্র তত বেশি সমৃদ্ধ। একটি জাতি তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, যখন তারা এ সকল প্রকৃত সম্পদের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং রপ্তানিমুখী হবে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপরীত; আমরা রপ্তানির চেয়ে আমদানির ওপর বেশি নির্ভরশীল।

আমদানি নির্ভরতা কমাতে হলে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের যে পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে তা সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে হবে। শুধু জমি ব্যবহার করলেই হবে না, বরং জনসংখ্যাকে

প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে, যাতে তারা শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও সম্পদ উপার্জন করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র আমদানি নির্ভর থাকি, তাহলে আমাদের সম্পদ ক্রমাগত হ্রাস পাবে এবং আমরা আরও ঋণগ্রস্ত হবো। আমদানি করতে গেলে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে যখন ডলার ব্যবহার করা হবে তখন আমাদের মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন হবে, অতিরিক্ত ব্যয় হবে। এ কারণে বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্ত হতে ও জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে আমাদের অবশ্যই নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

১. জাতিকে দেশপ্রেমের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে দেশের নাগরিকরা বিদেশে সম্পদ উপার্জন করে দেশে পাঠায়।

২. যতটুকু সম্ভব আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৩. প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়ন করা, যাতে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

৪. কঠোর পরিশ্রমের মানসিকতা গড়ে তোলা, যাতে জনগণ স্বনির্ভর হতে পারে।

৫. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, কারণ দুর্নীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাধা।

৬. অপ্রয়োজনীয় বিলাসী দ্রব্যের আমদানি ও উৎপাদন বন্ধ করা, যাতে দেশের মুদ্রা অপচয় না হয়।

৭. পণ্যের অপচয় রোধ করা, যাতে উৎপাদিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

যদি আমরা এই নীতিগুলো অনুসরণ করতে পারি, তাহলে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা রপ্তানি সক্ষম জাতিতে পরিণত হবো। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষকের হয়তো ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা নেই বা পাঁচতলা বিল্ডিং নেই, কিন্তু তার একটি টিনের ঘর, একটি পুকুর, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও কৃষিজমি আছে। এই সম্পদ থেকেই তিনি সারা বছর খাদ্য ও পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারেন। অপরদিকে, এমন একজন ব্যক্তির কথা ভাবুন যার কোনো কৃষিজমি নেই, কোনো উৎপাদনক্ষম সম্পদ নেই, কিন্তু তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। বাস্তবিক অর্থে, তার সম্পদ নেই, বরং তিনি আমদানিকৃত বিলাসবহুল দ্রব্য ব্যবহার করে দেশের সম্পদ হ্রাস করছেন।

মানুষ যদি কেবল উদরপূর্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তবুও যদি দুবেলা দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য হিমশিম খায়, তাহলে এটি কোনো মানবিক সমাজ হতে পারে না। বর্তমান সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মানুষকে শুধুমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতায় পরিণত করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ রিজিকে একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; কিন্তু যাদেরকে অধিক দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিজিক তাদের অধীনস্থদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে না। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?' (সুরা আন-নাহল: ১৬:৭১) তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' (সুরা বনি ইসরাইল: ১৭:৩০)

সুতরাং, আমাদের উচিত আল্লাহর দেওয়া সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

কার্ল মার্কসের মতে, মানুষের প্রকৃত ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস (Class Struggle)। তার মতে, আবহমান কাল থেকে সমাজ মূলত দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত- শোষক ও শোষিত। যারা সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী, তারা সবসময় নিজেদের মুনাফার জন্য অন্যদের শোষণ করে।

প্রাচীন দাসপ্রথার যুগে দাস মালিকরা দাসদের দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাতো, কিন্তু তাদের কোনো মানবাধিকার দিত না। এরপর সামন্ত যুগে (Feudalism) জমির মালিকরা (Landlords) কৃষকদের দিয়ে চাষ করিয়ে ফসল নিত, কিন্তু কৃষকরা ন্যায্য ফসলের অংশ বা মজুরি পেত না। আধুনিক যুগে কলকারখানা ও ব্যবসা (Industrial Capitalism) অর্থনীতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে। এখানে ধনী মালিকরা (Capitalists) কলকারখানা চালায় এবং শ্রমিকরা (Proletariat) কম মজুরিতে কঠোর পরিশ্রম করে। মালিকরা অল্প মূল্যে শ্রম কিনে অধিক মুনাফা (Profit) অর্জন করে, কিন্তু শ্রমিকদের বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে যায়।

মার্কস দেখিয়েছেন যে এই শোষণমূলক পরিস্থিতি চিরদিন চলতে পারে না। শ্রমিকরা একসময় একজোট হয়ে বিপ্লব (Revolution) ঘটাবে এবং ধনী মালিকদের শাসনের অবসান ঘটাবে। তখন সমাজতন্ত্র (Socialism) প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে। একসময় এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলবে, যেখানে কোনো শ্রেণি বিভাজন (Classless Society) থাকবে না, সবাই সমানভাবে কাজ করবে,

এবং শোষণের অবসান ঘটবে। এটাকেই মার্কস বলেছিলেন কমিউনিজম (Communism) বা সাম্যবাদ।

শ্রেণি সংগ্রামের মূল ধারণা হলো যে সমাজে ধনী ও গরিবের মধ্যে দ্বন্দ্বটি চিরন্তন। ধনীরা চিরকাল গরিবদের শোষণ করে, আর গরিবরা কোনো একসময় এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে লড়াই করে। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং নতুন যুগের সূচনা ঘটে। তবে আমাদের মতে মার্কসের দেওয়া এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়; এটি আংশিক সত্য। বরং মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস হলো ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব এবং সত্য-মিথ্যার সংঘাতের ইতিহাস। এটা বুঝতে হলে মানুষের সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত পুরো সময়টাকে বিবেচনায় নিতে হবে। গোটা পৃথিবীটাকে পটভূমি হিসাবে নিয়ে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে যদি আরম্ভ করি তবে দেখতে পাই যে প্রথম মানব আদম (আ.) আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান, দীন ইসলাম অনুযায়ী চলতে লাগলেন তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে এবং ফলে শান্তিতে বাস করতে থাকলেন। ইবলিস তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চেষ্টা চালাতে লাগলো সেই জীবন ব্যবস্থা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করতে। মানুষেরই ভেতরে বসে তাকে প্ররোচনা দিয়ে আইন ভঙ্গ করাতে। হাবিলকে দিয়ে তার ভাই কাবিলকে হত্যা করালো। তারপর আরো আইন ভাঙ্গার ফলে যখন ওটা যথেষ্ট বিকৃত হয়ে গেল তখন আল্লাহ পাঠালেন দ্বিতীয় রসুল। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করল অনেকে রয়ে গেল সেই পুরোনো ব্যবস্থায়- যেটা ছিল আদমের (আ.) উপর দেয়া। সৃষ্টি হল দু'টো দীন, দু'টো ধর্ম, দু'টো জীবনব্যবস্থা। এদিকে মানুষের বংশ বৃদ্ধি চলছেই। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল আদম সন্তানরা পৃথিবীর চারিদিকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেখানেই তারা বসতি স্থাপন করল সেখানেই আসতে লাগলেন প্রেরিত নবীরা আল্লাহর দেয়া দীনুল কাইয়্যেমা অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতন, চিরন্তন, সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম নিয়ে। উদ্দেশ্য সেই একই- মানুষ যেন নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি না করে, রক্তপাত না করে শান্তি ও সুখে বাস করতে পারে। একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নবী উপস্থিত ছিলেন। কেউ হয়ত চীনের এক প্রান্তে, কেউ দক্ষিণ আমেরিকায়, কেউ ইউরোপে, কেউ মধ্য এশিয়ায়, কেউ ভারতের কোনো কোণে। আল্লাহ তাঁর দায়িত্ব এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যান নি। যুগ বয়ে চলেছে, নবীরা মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম দিয়ে চলে যাচ্ছেন, শয়তান মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে সেগুলো বিকৃত, অকেজো করে ফেলছে। তারা আবার আসছেন আবার নতুন করে জীবন পথ দিচ্ছেন, নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই অতীতে হারিয়ে গেছেন। তারাও হারিয়ে গেছেন, তাদের মাধ্যমে প্রেরিত জীবনব্যবস্থাগুলোও হারিয়ে গেছে। আমরা পেছন দিকে তাকিয়ে

তাদেরকে দেখতে পাই, তাদের আনা ইসলামকেও দেখতে পাই। পাই, কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে এবং মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃতভাবে।

এই হল মানুষের প্রকৃত অতীত। ইতিহাসকে বহুলোক বহুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সত্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, ন্যায় ও অন্যায়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব, সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মাকে একদিকে ইবলিস অন্যদিকে আল্লাহর আত্মা, রুহাল্লাহর টানাটানি- এই হল আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার অতীত। এবং এ শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতও নিঃসন্দেহে এই-ই। এর কোনো বিরতি, কোনো চ্যুতি হয় নি, হচ্ছে না, হবে না। কার্ল মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যা অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রাম থেকে শুরু করে বহু দার্শনিক বহু রকমের ব্যাখ্যা করেছেন। এর কোনোটাই গোটা সত্য নয়- খুব হলে আংশিক সত্য এবং অত্যন্ত ছোট আংশিক। শ্রেণি সংগ্রাম যদি শেষ হয়ে যায় (মার্কস যে শ্রেণিহীন সমাজ পৃথিবীতে দেখতে চান যদি বাস্তবায়িত হয়ও) সেদিন মার্কসের ইতিহাস ও তার ব্যাখ্যা দুইই স্তব্ধ, মুক হয়ে যাবে। অন্যান্য সব ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। যে ব্যাখ্যা মানুষের ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ অতীত, তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। ইতিহাসের মতই সে প্রকৃত ব্যাখ্যাও ইতিহাসের শেষ পর্যন্ত একই থাকতে হবে।

এই শ্রেণি সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটাতে ইসলাম এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করছে যেখানে অর্থনৈতিক সাম্যের চাইতে অর্থনৈতিক সুবিচার (Justice) ও ন্যায়কে (Fairness) বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে সমাজের সকলের সম্পদ সমপরিমাণ না হওয়া সত্ত্বেও ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো শ্রেণি বৈষম্য ছিল না, শ্রেণি সংগ্রামও ছিল না। ধনী-গরিব, শাসক-জনগণ সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি ছিল তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি সতর্কতা। খলিফা এবং সাধারণ জনগণ উভয়ই তাদের পরিবারের পোষ্যসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সমপরিমাণ হারে ভাতা পেতেন। তাদের মধ্যে কোনো আর্থিক বৈষম্য ছিল না, এবং সমাজে কেউ তার সম্পদের কারণে অতিরিক্ত সম্মান লাভ করত না। ইসলাম এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে সমাজের সব স্তরের মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়া হত। পূর্বে যারা ক্রীতদাস ছিলেন, তাদেরও সমাজে কোনো অবমূল্যায়ন করা হত না; বরং তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হত। আবার যে কেউ চাইলে হালাল উপায়ে যত ইচ্ছা ধন-সম্পদের মালিক হতে পারত, এতে রাষ্ট্র কোনো বাধা দিত না। কেবল সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত, উশর, খারাজ রাষ্ট্রকে দিতে হত। আবার ধনীদেরকে সামাজিকভাবে

দান করার জন্য ইসলাম ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এর মাধ্যমে ধনী ও গরিবের মধ্যে শ্রেণি দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের পরিবর্তে পারস্পরিক সম্মানবোধ, সমবেদনা ও প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এভাবে ইসলাম ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনে। আবার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ফলে দেখা যায় কজন হাজার হাজার একর জমির মালিক হয়ে বসে আছে, অন্যদিকে কেউ ফুটপাথে বাস করছে। এর চেয়ে বড় অর্থনৈতিক অবিচার ও মানবতার অমর্যাদা আর হতে পারে না।

আল্লাহর দেয়া শেষ জীবন-বিধান, দীনে যে অর্থনীতি দিয়েছেন সেটার নীতি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। **ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ,** পরিণাম হচ্ছে নিষ্ঠুর, অমানবিক অর্থনৈতিক অবিচার, একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ, তাদের পাশবিক ভোগ বিলাস; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণের কঠিন দারিদ্র, অর্ধাহার-অনাহার-মানবেতর জীবন যাপন। **সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করে** মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হরণ করে সম্পদ বণ্টন। এ বণ্টন শুধু মৌলিক প্রয়োজনের এবং তা-ও ঐ মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। পরিণাম হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র ও ক্ষুদ্র বাসস্থানের বিনিময়ে সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণের আত্মাহীন যন্ত্রে পরিণত হওয়া ও মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে ঐ বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক জনসাধারণের নেতৃত্ব করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ঐ দুই ব্যবস্থাই মানুষের-গায়রুল্লাহর সৃষ্টি এবং দুটোরই পরিণাম বৃহত্তর জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অবিচার, বঞ্চনা। **শেষ দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সমস্ত সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব গতিশীল করে দেওয়া এবং অর্থনীতিকে স্বাধীন-মুক্ত করে দেওয়া।** প্রত্যেক মানুষের সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা স্বীকার করা, প্রত্যেকের অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়া নয় উৎসাহিত করা (সুরা বাকারা ২:২৭৫)। একদিকে অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকে আল্লাহ উৎসাহিত করছেন অন্যদিকে ক্রমাগত বলে চলেছেন খরচ কর, ব্যয় কর। উদ্দেশ্য সেই গতিশীল সম্পদের নীতি। পরিণাম সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের সুষ্ঠু-সুষম বণ্টন, দারিদ্রের ইতি।

আল্লাহর দেওয়া এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল কী হয়েছিল সেটা মোটামুটি সকলেরই জানা। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যে আরবরা ছিল নিঃস্ব জাতি, সেই আরবরাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতার ধারকে পরিণত হল। মক্কা ও মদিনা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল যা সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করেছিল। মুসলিম বণিকরা ভারত, চিন এবং আফ্রিকার সাথে বাণিজ্য করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনীদের সম্পদে গরিবের অংশ ও অধিকার দেওয়া হয়, পাশাপাশি বহুভাবে দান করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়। এই নীতির ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হয় আর সম্পদের সুষম বণ্টন হয়ে যায়। ইসলামী যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো হয়। ইসলাম সেই দারিদ্র্যপীড়িত আরব সমাজকে এতটাই আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করেছিল যে, মানুষ দান করার জন্য ঘোড়া বা উটের পিঠে সম্পদ বোঝাই করে, খাবার বোঝাই করে দরিদ্র মানুষকে দেওয়ার জন্য সন্ধান করত। কিন্তু সেগুলো গ্রহণ করার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজের যুগেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরবর্তী কয়েকশ বছর তা স্থায়ী ছিল- যা বহু ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে (Islam the Misunderstood Religion- Muhammad Kutub)। এর কারণ কেবল এটাই নয় যে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এসেছিল। বরং পাশাপাশি **তারা ভোগবাদ থেকেও মুক্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে যতটুকু সম্পদ দিয়েছেন, তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকত। এর ফলে সমাজ থেকে চুরি ডাকাতি প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।** বর্তমান ভোগবাদী সভ্যতায় একজন মানুষ পাহাড় পরিমাণ সম্পদ পেলেও সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় তার আরো একটি সম্পদের পাহাড় থাকুক। তাদের এই অর্থ-শকুন হওয়ার প্রবণতাকেও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করবে। তাদের মধ্যে ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের মানসিকতা, নেওয়ার বদলে দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলবে। মানুষ যেমন তার প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজন, অভাবী লোকদের দান করবে তেমনি রাষ্ট্রীয় কয়েকটি খাতেও তাকে বাধ্যতামূলকভাবে কর বা খাজনা প্রদান করতে হবে। যেমন- ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি হল যাকাত। এটি হচ্ছে ব্যক্তির সম্পদ বা অর্থের একটি অংশ যা রাষ্ট্রকে প্রদান করতে হয়, সেটা কত অংশ তা সরকার বিজ্ঞ ফকিহদের সাথে ইজতেহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। এছাড়া আছে উশর (কৃষিকর), আছে খারাজ (ভূমিকর) ইত্যাদি। সুতরাং রাষ্ট্র বিত্তবানদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণ করবে, ফলে সম্পদ উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। একই সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরে দান, স্বতঃস্ফূর্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের আরেকটি স্বাভাবিক প্রবাহ সৃষ্টি হবে, যা দারিদ্র্য প্রায় নির্মূল করতে সহায়তা করবে। এটি অনেকটা সেই প্রক্রিয়ার মতো, যেখানে একটি বৃক্ষ উপর থেকে বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে শিকড়ের মাধ্যমে মাটির গভীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে। এভাবে উভয় উৎস থেকে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে বৃক্ষ যেমন

প্রাণশক্তিতে পূর্ণ হয়, তেমনি রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও অভ্যন্তরীণ অর্থপ্রবাহের সমন্বয়ে সমাজও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

খনিজ সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এসকল অর্থ সরকারি কোষাগারে (Public Treasury) জমা হবে, আরবি ভাষায় একে বলা হয় বায়তুল মাল। এই কোষাগার নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগ। রাষ্ট্রপ্রধানের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ কাজ করবে। বিভিন্ন খাত থেকে জনগণের সম্পদ এসে এখানে জমা হবে, এর প্রকৃত মালিক তাই জনগণ। রাষ্ট্রের কাছে এটা জনগণের পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত। এই অর্থ ব্যয় হবে জনকল্যাণমূলক কাজে। তাদের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধানকল্পে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আবাসন প্রকল্প, দরিদ্র সহায়তা কেন্দ্র, রেশন কেন্দ্র, সোশ্যাল ক্যান্টিন ইত্যাদি। আল্লাহপ্রদত্ত বিভিন্ন খাত ছাড়াও রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম তার পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করবেন, ইজতেহাদ করবেন এবং নতুন কোনো খাতে কর আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত মনে করলে সেটা করবেন।

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থ ও বাণিজ্যনীতি এক নজরে:

০১. **সুদ নিষিদ্ধকরণ:** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুদ গ্রহণ বা প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হবে।

০২. **সম্পদের গতিশীলতা:** সম্পদ পুঁজিভূত বা সঞ্চয় করার পরিবর্তে দ্রুত গতিতে সঞ্চালন ও বণ্টন নিশ্চিত করা হবে। ত সম্পদের গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের বৃহৎ অংশকে লাভবান করা হবে।

০৩. **ব্যক্তি মালিকানার অধিকার:** সম্পদের ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মতো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিষিদ্ধ করা হবে না বরং উৎসাহিত করা হবে।

০৪. **সুদমুক্ত বিনিয়োগ:** সুদমুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবে। বিনিয়োগকারী ও শ্রমদাতার মধ্যে ঝুঁকি ও মুনাফার ভাগাভাগি হবে।

০৫. **যাকাত ও অন্যান্য কর ব্যবস্থা:** প্রয়োজনীয় খরচের পর, ব্যক্তি তার হাতে থাকা অর্থ থেকে দান, যাকাত ও ওশর প্রদান করবে। এর পর যে অর্থ থাকবে তা রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগে জমা হবে এবং রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে সরকারি খাত থেকে সম্পদ ব্যয় করবে। জনগণের প্রয়োজনীয় খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন নিশ্চিত করতে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে কাজ করবে।

০৬. **সরকারি কোষাগার:** প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ জনগণের অর্থের সুষম ব্যবহারের তত্ত্বাবধান করবে। সরকারি কোষাগারে (বায়তুল মাল) জমাকৃত অর্থ আল্লাহর নির্দেশিত খাত অনুযায়ী জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। বিত্তবানদের দানের অর্থ মসজিদের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ উপকৃত হবে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

০৭. **ভোগবাদ নিয়ন্ত্রণ:** ভোগবাদী সমাজে সম্পদের লোভ মানুষের অস্থিরতার মূল কারণ। প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের মূল্যবোধ প্রচার করে ত্যাগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে ভোগের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করবে। সামাজিক সেবা ও দানের শিক্ষা সমাজের উন্নয়ন এবং মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করবে।

০৮. **প্রতিরক্ষা কর:** মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যারাই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষামূলক উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে প্রতিরক্ষা কর দিতে হবে।

০৯. **ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের অবসান:** ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট একটি বড় দুর্নীতি যার মাধ্যমে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানো হয়। এতে ব্যবসায়ীদের সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বৃহৎ শিল্পপতিদের আধিপত্যের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারে না। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সিন্ডিকেট ভেঙে ন্যায়সঙ্গত বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। সিন্ডিকেটমুক্ত পরিবেশে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে ব্যবসা করবে, তাদের পুঁজি হারানোর ঝুঁকি কমে আসবে।

১০. **পুঁজির সুরক্ষা:** ছোট বড় সকল বিনিয়োগকারী যেন নিশ্চিন্তে ব্যবসায় উদ্যোগ নিতে পারে, যেন বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে কাউকে পুঁজি হারাতে না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হবে।

১১. **বিনিয়োগ ক্ষেত্রের স্তরবিন্যাস:** বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক স্তরে বিনিয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে। বৃহৎ পুঁজির মালিকরা বৃহৎ প্রকল্প ও উৎপাদনশীল খাতে মনোযোগ দেবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক ক্ষেত্র নির্ধারণ করে তাদের ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। বৃহৎ পুঁজির মালিকদের ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ বন্ধ করা হবে।

১২. **কাগুজে মুদ্রা-নির্ভরতার পরিবর্তে সম্পদ-নির্ভরতা:** অর্থনীতিকে সম্পদনির্ভর করা হবে, কাগুজে মুদ্রানির্ভর নয়। প্রত্যেক সক্ষম নাগরিক তাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন কৃষিজমি, খাদ্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, শাক-সবজি, ওষধি ও ফলজ বৃক্ষ ও অন্যান্য সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করবে। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে স্বনির্ভরতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন

এবং জিডিপি বাড়বে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাদের টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া লাগবে না। কোনো কারণে হাতে টাকা না থাকলেও তারা বেঁচে থাকতে পারবেন, ঋণগ্রস্ত হতে হবে না।

১৩. সম্পদ পাচার রোধ ও দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি: দেশীয় সম্পদকে ডলারে রূপান্তরিত করে বিদেশে পাচার করার অশুভ চক্রান্ত কঠোর হস্তে দমন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কঠোর নীতি প্রণয়ন করবে। বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। এতে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে। অর্থনীতি হবে রপ্তানি নির্ভর, আমদানি নির্ভর নয়।

১৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাগুজে মুদ্রার বিকল্প: আমাদের দেশে সম্পদের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও টাকার মূল্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। তাই কাগুজে মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল না থেকে নাগরিকদেরকে সম্পদের মালিক হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববাজারে ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির ফলে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুদ্রা বিনিময়ের ফলে সম্পদের ক্ষতি রোধে আমাদের এমন একটি নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষা দেবে এবং সম্পদের প্রকৃত মূল্য বজায় রাখবে। এজন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, কাগজের মুদ্রার উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল না থেকে ধাতব মুদ্রা চালু করা, যা মুদ্রার স্থায়িত্ব ও মান নিশ্চিত করবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। এতে কাগুজে মুদ্রার মূল্যমান কমলেও ধাতব মুদ্রার মূল্যমান সেই অনুপাতে হ্রাস পাবে না। পাশাপাশি ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবহারের সুবিধাও নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. 'অতিপুঁজি সংরক্ষণকারী ব্যাংক'-বিহীন অর্থনীতি: 'অতি পুঁজি জমাকারী ব্যাংকের' (High Reserve Bank) উপর নির্ভরশীলতা কমানো হবে। এই ধরনের ব্যাংকগুলোর কারণে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বৃহৎ অর্থনৈতিক দানবে পরিণত হয়, যা অর্থের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের হাতে বিপুল অর্থ পুঁঞ্জিভূত হয়ে যাওয়ায় সেটি দ্বারা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপকৃত হতে পারে না। সেই অর্থ কেবল তাদেরকেই লাভবান করে। এজন্য, 'অতিপুঁজি জমাকারী ব্যাংকের' পরিবর্তে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। সরকার অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করবে, যা অর্থনীতির উন্নয়ন এবং নাগরিকদের আর্থিক সমতার জন্য সহায়ক হবে।

১৬. বিলাসপণ্যের ব্যবহার কমানো: চটকদার বিজ্ঞাপন ও প্রলুব্ধকারী প্রচারণার মাধ্যমে অগণিত বিলাসপণ্যের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে বহুজাতিক পুঁজিপতি

কোম্পানি ও গণমাধ্যমগুলো। এর ফলে বাড়িতে বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্তুপ জমে ওঠে যেগুলো জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু এরই মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাত থেকে অর্থ গুটিকয়েক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে। এটি এক ধরনের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষকে কেবল ক্রেতা ও ভোক্তা (Consumer) হিসাবে দেখতে শেখায়। এই বাণিজ্যব্যবস্থা মানুষকে শ্রমবিমুখ ও ভোগবাদী করে, অন্যদিকে সম্পদের বিপুল বৈষম্য সৃষ্টি করা। আমরা জনগণকে সচেতন করব যে কোনো পণ্য প্রকৃত অর্থে তাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আর কোনগুলো কেবল তাদের অর্থ শোষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এইভাবে, বিলাসপণ্যের ব্যবহার সীমিত করে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের প্রতি গুরুত্ব নিশ্চিত করব।

১৭. **ট্যাক্সের খাত কমানো:** ট্যাক্সের বোঝা থেকে জনগণকে যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া হবে। সরকারি ব্যয় সরকারি সম্পদের আয় থেকেই নির্বাহ করা হবে।

ধর্মীয় অধিকার ও সম্প্রীতি
(Religious Rights and Harmony)

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে। রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বলে কিছু থাকবে না। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তসূত্র হচ্ছে- সকল মানুষ এক স্রষ্টার সৃষ্টি। আর স্রষ্টার বিধানই হচ্ছে ন্যায় ও অন্যায়ের মাপকাঠি। রাষ্ট্র সেই মাপকাঠি মোতাবেক পরিচালিত হবে; এ ন্যায়ধর্মই হবে রাষ্ট্রের একমাত্র ধর্ম, অন্য কোনো রাষ্ট্রধর্ম থাকবে না। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন দল-উপদলের নাগরিককে রাষ্ট্র স্রষ্টাপ্রদত্ত ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করবে, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর থাকবে। কেবল ধর্মপরিচয়ের কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনোপ্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না।

আল্লাহ বলেন, 'হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকি।' (সুরা হুজরাত ৪৯:১৩)। মুত্তাকি অর্থ যে জীবন চলার পথে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের (ন্যায়-অন্যায়) ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকে। রসুলাল্লাহ মক্কা বিজয়ের পর কাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বলেন, 'সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি। তাহলে অহঙ্কারের হেতু কী? মনে রাখবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার উর্ধ্বে কোনো মর্যাদা নেই এবং মনিব-গোলাম, উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব সবাই সমান। ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে তা হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ড সম্পর্কে সতর্কতা) ও আমলে সালেহ (সৎকাজ)।' আল্লাহর রসুলের এই স্পষ্ট ঘোষণার পর বংশীয় বা ধর্মীয় কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতার লেশ ইসলামে থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি নিকৃষ্ট মনোভাব। এর আরবি হচ্ছে আসাবিয়াত। আসাবিয়াত মানে কী এই প্রশ্ন করলে রসুলাল্লাহ বলেন, 'অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৭৮)। তদানীন্তন আরবে গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিভিন্ন

ধর্ম সম্প্রদায়ও ছিল। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একটি গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুগের পর যুগ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেত, যেমনটা আধুনিক যুগে রাজনৈতিক দলগুলো করে থাকে। মদিনায় বসবাসকারী আউস ও খাজরাজ এই দুটো গোত্রের মধ্যে একশ বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ বিবাদ চলে আসছিল। আল্লাহর রসুল মদিনায় এসে উভয় গোত্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৬২২ সালে মদিনার সকল গোত্রকে একটি চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করেন যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। তাঁর করা এই ঐতিহাসিক মদিনা সনদকে অনেকে মদিনার সংবিধান বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি মৈত্রী ও নিরাপত্তা চুক্তি (Peace and security agreement), যা মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদি, পৌত্তলিক সকলকে তিনি এক জাতি, এক উম্মাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেখানে গোত্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বা আসাবিয়াতের কোনো জায়গা ছিল না।

রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে আসাবিয়াতের দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ অন্যায় কাজে নিজ দেশ, দল, গোত্র, জাতিকে সাহায্য করতে বলবে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে এমন সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় (মুসলিম নয়) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫০৮০)। অন্ধ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, অন্ধ দলপূজা ও সাম্প্রদায়িকতা একই অর্থ বহন করে। যত অন্যায়ই করুক নিজের গোত্র, রাজনৈতিক দল, দেশ, জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায়ই ঠিক- এমন ধারণাই হচ্ছে আসাবিয়াত। ইসলামে এ ধরনের মানসিকতা হারাম।

কাজেই আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারি চাকরি ও যে কোনো দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধর্ম বর্ণ বিবেচনা না করে তার কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন করা হবে। পাশাপাশি তার সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও রাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রত্যেকে যার যার ধর্মবিশ্বাস সংরক্ষণ, প্রকাশ, প্রচার ও ধর্মীয় রীতি পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু কেউ অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচার করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান থাকবে। একজন হিন্দু অপরাধ করলে যে শাস্তি হবে, একজন মুসলমান অন্যায় করলেও একই শাস্তি হবে। তবে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে যার যার ধর্মবিশ্বাসের অনুকূলে বিকল্প দণ্ডবিধিও রাখতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা পাই, আল্লাহর রসুল যুদ্ধাপরাধী ইহুদি গোত্র বনি কোরায়জাকে তাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতের বিধান দিয়ে বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উমর ফারুক (রা.) এর খেলাফত থেকে শুরু করে আব্বাসি ও উসমানীয়

খেলাফতের সময়ও ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের জন্য বিশেষ আদালত ছিল, যেখানে তারা তাদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার চেয়ে মামলা করতে পারতেন। এখনও বিশ্বের অনেক সেক্যুলার দেশে মুসলমানদের জন্য পৃথক শরিয়াহ আদালতের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধীর শাস্তি হওয়াই হল আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে- যেমন সর্বধর্মীয় সংলাপ, সম্প্রীতি মেলা, পাঠ্যপুস্তকে ভিন্নধর্ম সম্পর্কে শিক্ষাদান, পরস্পরের উৎসবে সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, সংবাদমাধ্যমে প্রচার, ধর্মীয় বক্তা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, সর্বোপরি কেউ নিপীড়িত হলে তাকে আইনি সহায়তা প্রদান করা। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নামে যাবতীয় উগ্রতা, অশ্লীলতা, অন্যের মানহানিকর কোনো কিছুই বৈধতা পাবে না।

ইসলামিক রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর আরোপিত জিজিয়া কর নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে এবং একে সংখ্যালঘুদের প্রতি ইসলামের বৈষম্যমূলক আচরণ হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। ইসলামের সাম্যনীতি ও উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের কর প্রশাসনের (Taxation system) নীতিমালা নিয়ে একটি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে যেন অমুসলিমরা কখনোই ইসলামকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে সমর্থন না দেয়।

যাহোক জিজিয়া বিষয়ে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে জিজিয়া করের উল্লেখ করেছেন (সুরা তওবা ৯:২৯)। 'জিজিয়া' শব্দটি আরবি 'জিজ' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'প্রদান করা' বা 'পরিশোধ করা'। আর জিজিয়া অর্থ পরিশোধিত কর বা ট্যাক্স। ইসলামের পরিভাষায় এটি একটি অর্থনৈতিক চুক্তির প্রতীক, যেখানে অমুসলিম নাগরিকরা তাদের সুরক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রকে এই কর প্রদান করে। ইতিহাসে পাওয়া যায় আল্লাহর রসুল (সা.) ও নাজরানের খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল, যেখানে তাদের জিজিয়া করের বিনিময়ে নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যারা জিজিয়া দেবে তাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করা লাগবে না।

আল্লাহর রসুলও বিভিন্ন দেশের শাসকদের উদ্দেশে যে তিনটি বিকল্প পেশ করতেন সেসব চিঠিতেও জিজিয়ার উল্লেখ থাকত। সেই শর্ত তিনটি ছিল, (১) হয় ইসলাম কবুল করে আমাদের ভাই হয়ে যাও, (২) অথবা তোমাদের ধর্মেই বহাল থাকো, কিন্তু আমাদের বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শনস্বরূপ নামমাত্র একটি কর (জিজিয়া) প্রদান কর, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। এটাই ছিল

আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রসুলাল্লাহর কূটনৈতিক প্রস্তাব। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগে ও অন্যান্য খেলাফতের যুগেও অমুসলিমদের থেকে সুরক্ষা কর হিসাবে জিজিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে করের হ্রাস-বৃদ্ধি ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অনেক সুলতান জিজিয়া স্থগিত করেছেন, শিথিল করেছেন এমনকি বাতিলও করেছেন যেমন মুঘল সম্রাট আকবর।

জিজিয়ার মূল ধারণাটা আসলে কী? ইসলামের সামরিক নীতি মোতাবেক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ রাষ্ট্র তার নাগরিককে বেশ কিছু মৌলিক সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করে। যেমন রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাস্তাঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ইত্যাদি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক এসব সুবিধা ভোগ করে থাকে, তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রত্যেক যুদ্ধক্ষম নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর ইসলামি রাষ্ট্রের মুসলিমরা আল্লাহর হুকুমের কারণে যুদ্ধ করতে বাধ্য। আধুনিক যুগেও জাতির সংকটকালে নাগরিকরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। যেমনটা '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার আপামর জনতা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সময়ও যারা সরাসরি যুদ্ধে যাবে না তাদেরকে যুদ্ধের ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা অন্তত উচিত। জিজিয়া হচ্ছে সেই যুদ্ধকর যা প্রদান করলে অমুসলিম নাগরিকদেরকে আর যুদ্ধের মত শ্রমসাধ্য, জীবন-সম্পদের ঝুঁকিপূর্ণ, অনিরাপদ কাজে অংশ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এরপরও যদি কোনো অমুসলিম ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়, তাকে জিজিয়া দিতে হবে না। উল্টো যুদ্ধের মাধ্যমে যে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে তার অংশ লাভ করবে। উমর (রা.) এর শাসনকালে শাম (বর্তমান সিরিয়া) অঞ্চলের কিছু খ্রিষ্টান গোষ্ঠীকে জিজিয়া কর দিতে হয়নি, কারণ তারা ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে মিলে নিজেদের এলাকা রক্ষা করেছিল। বিভিন্ন ইতিহাস এবং ইসলামী ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, জিজিয়া কর শুধুমাত্র সেই অমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যারা সামরিক সুরক্ষা ও দায়িত্বে অংশগ্রহণ না করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করত। পক্ষান্তরে মিশরের কৃষকদেরকে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল, কারণ নীলনদের আশীর্বাদপুষ্ট মিশরের কৃষি অগণিত মানুষের খাদ্যের যোগান দিত। কিন্তু যেহেতু মিশরের কৃষকরা সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না তাই তাদের উপরও জিজিয়া কর আরোপ করা হয়েছিল। (সূত্রঃ When the Egyptian peasants, although Muslim in faith, were made exempt from military service, a tax was imposed

upon them as on the Christians in lieu thereof. -The preaching of Islam : a history of the propagation of the Muslim faith by Sir Thomas Walker Arnold)

তাহলে বোঝা গেল, জিজিয়া হচ্ছে একটি যুদ্ধকর (War Levy) যা সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়ার কারণে দিতে হত। এখানে অমুসলিম হলেই তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিত, আর কর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা মুসলমান হয়ে যেতে বাধ্য হত এমন ধারণা নিতান্তই অমূলক। অমূলক হওয়ার আরেকটি কারণ বলছি। সেটা হল, জিজিয়ার পরিমাণ কেমন ছিল? ঐতিহাসিকদের মতে জিজিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হত ব্যক্তির সামর্থ্যের উপর, আর সেটাও ছিল একটি নামমাত্র অর্থ যা টোকেন মানি ছাড়া কিছুই না। যেমন ইসলামের প্রাথমিক খেলাফতের যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলেও বছরে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে মাত্র ১ থেকে ৪ দিনার জিজিয়া দিতে হত। সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য জিজিয়া বাড়ানো হতো, আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের জন্য কম রাখা হতো। তার উপর নারী, বৃদ্ধ (ষাটোর্ধ), শিশু (১৫ বছরের কম), অক্ষম, ধর্মগুরু, সামাজিকভাবে গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে এই কর থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হত।

সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের থেকে কর আদায় যে ইসলামের উদ্দেশ্য নয় তা বোঝার জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করছি। ওমরের (রা.) সময়ে মিশরের শাসনকর্তা হাইয়ান ইবনে শারিহ খলিফাকে লিখলেন- আমীরুল মো'মেনীন! অমুসলিমরা স্বেচ্ছায় এত সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করছে যে, জিজিয়া আদায় অনেক কমে গেছে। এখন কী করা? উমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে জবাব দিলেন- জিজিয়া আদায় কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করতে তোমার একজন মুসলিম হিসাবে লজ্জা করলো না? তোমার মনে রাখা উচিত যে, রসুলাল্লাহ (সা.) কর আদায় করার জন্য প্রেরিত হননি (সয়ুতি, ইদ্রীস আহমদ এবং Decisive Moments in the History of Islam- Muhammad Abdullah Enan)।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত নির্দিষ্ট বাহিনী থাকত না। তেমনি সাধারণ নাগরিকদের উপর আধুনিক যুগের মতো বহু প্রকারের ট্যাক্স ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্র বহু নামে বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিক থেকে কর বা শুল্ক আদায় করে যেমন- আয়কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট, সম্পত্তি কর, সামাজিক নিরাপত্তা কর, মদ্যপান ও তামাক কর, শ্রমিক কল্যাণ কর, বাণিজ্য কর, কাস্টম কর ইত্যাদি। এসব ট্যাক্সের একটি বড় অংশ সেনাবাহিনীর বেতন, ভাতাসহ ও অন্যান্য সামরিক খাতে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

রাষ্ট্রের আলাদা করে জিজিয়া নেওয়া প্রয়োজন পড়বে কিনা তা রাষ্ট্রনায়ক বা ইমাম আইন বিশারদদের সাথে পরামর্শ ও ইজতেহাদ করতে পারেন।

ইসলামকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে নেওয়ার প্রসঙ্গ আসলে আরেকটি প্রশ্ন খুব তোলা হয়। সেটা হল- যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাসী না বা আগ্রহী না, তাদের মত প্রকাশের অধিকার ইসলাম স্বীকার করে কিনা? নাকি কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে বা নাস্তিক হয়ে গেলে তাকে শাস্তি দিতে হবে? এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবিত ধারণা হচ্ছে, আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ আসলে দুই প্রকার, মো'মেন ও কাফের (সুরা তাগাবুন ৬৪:২)। সুতরাং জীবনের পথও দুইটি, যারা মো'মেন তাদের পথ হচ্ছে সহজ সরল পথ (সিরাতুল মুস্তাকিম) আর যারা কাফের ও পথভ্রষ্ট (দোয়াল্লিন) তাদের পথ হচ্ছে দালালাহ (সুরা ফাতিহা ১:৭)। যারা মো'মেন তারা লড়াই করে আল্লাহর পক্ষে, আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে (সুরা আনফাল ৮:৭৪)। তাহলে এখানে স্পষ্ট যে দুটো দিক আছে, দুটো পক্ষ আছে- ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবসমাজ থেকে সকল অন্যায়কে দূরীভূত করে ন্যায় স্থাপন করা, মানবতা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এজন্য প্রয়োজনে মো'মেনদেরকে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম কাউকে জবরদস্তি করার পক্ষে নয়। সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহর এই নীতি পবিত্র কোর'আনের কয়েকটি আয়াত থেকে জানা যায়।

০১. দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে অবশ্যই ধারণ করে এক সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। (সুরা বাকারা ২:২৫৬)

০২. বলুন, হে কাফের সম্প্রদায়! তোমরা যার এবাদত কর, আমি তার এবাদত করি না। আমি যাঁর এবাদত করি তোমরা তাঁর এবাদত করো না। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে (সুরা কাফেরুন ১০৯:১-৭)।

০৩. যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাকে তাদের জন্য দারোগা করে পাঠাইনি (সুরা নিসা ৪:৮০)।

০৪. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনত, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে? (সুরা ইউনুস ১০:৯৯)।

০৫. বল, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। (সুরা কাহাফ ১৮:২৯)

সুতরাং তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে কোন নাগরিক কোন ধর্ম বিশ্বাস করল, কার উপাসনা করল, অথবা কোনো ধর্মই বিশ্বাস করল না এমনটা হতেই পারে। নিধর্মী, অজ্ঞেয়বাদী, প্রকৃতিবাদী, নাস্তিকও থাকতেই পারে। সবাইকে জোর করে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী বানানো আল্লাহর উদ্দেশ্যই নয়। আল্লাহ তো চাইলে এক মুহূর্তেই সবাই তাঁর উপর ঈমান আনত। কিন্তু আল্লাহ চান মানুষ তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করুক। তাই ইসলামিক রাষ্ট্র কারো বিশ্বাস নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, মাথাও ঘামাবে না। রাষ্ট্র দেখবে কারো দ্বারা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা লংঘিত হচ্ছে কিনা। কেউ একবার ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আজীবন সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকতে হবে এমন দাবিও আল্লাহ করেন না। মানুষ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। কোনো ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করলেই তাকে মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে পুড়িয়ে মারতে হবে বা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এমন কোনো বিধান ইসলামে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। ইসলামের নীতি হচ্ছে, যার যার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্ম, আচার-আচরণ তার তার ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম চলবে, এই ব্যাপারে রাষ্ট্র অনমনীয় অবস্থানে থাকবে। এ ব্যাপারে কেউ বিদ্রোহ করলে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। যেমনটা আবু বকর (রা.) করেছিলেন রিদ্দার যুদ্ধে। রসুলাল্লাহর ইন্তেকালের পর পরই বেশ কিছু গোত্র ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

রসুলাল্লাহ যখন আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন সেখানে বহু ধর্মের মানুষ, বহু দেবদেবীর পূজারি, বিভিন্ন মতবাদের ইহুদি, খ্রিষ্টান ও একত্ববাদী দীনে হানিফের অনুসারীরা বাস করত। আবার বহু মানুষ ছিল যাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহা ছিল। রসুলাল্লাহর চলে যাওয়ার পর প্রায় কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম কোর'আনের বিধান দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। ইসলামের সোনালি যুগে (৮ম থেকে ১৩শ শতাব্দী) মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন শহরে চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের অনেকেই যুক্তিবাদ, দর্শন এবং ধর্মীয় রীতির প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। আল-

রাযি, ইবনে আল-রাওয়ান্দি, ইবনে সিনার মতো দার্শনিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের অনেক দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। তাদের চিন্তাধারা সে সময়ের কট্টরপন্থী মুসলমানদের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু তাদের এই ভিন্নমত প্রচারের ফলে তাদেরকে রাষ্ট্র কোনো শাস্তি দেয়নি, যদিও তারা বিভিন্ন কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর রোষাণলে পড়ে বিদ্রূপ, সামাজিকভাবে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

মোদ্দা কথা, ইসলামি রাষ্ট্র তার প্রতিটি আইনমান্যকারী নাগরিকের যাবতীয় মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন কেউ যদি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে তাহলে আল্লাহ পরকালে কঠিন শাস্তি দিবেন। কিন্তু তার মানবাধিকারও ইসলাম নিশ্চিত করবে। তারা রাষ্ট্রের সমস্ত সেবা পরিষেবা লাভ করবে। তারা আর সকলের মতোই মত প্রকাশ করতে পারবেন, ভিন্নমতের সমালোচনাও করতে পারবেন। কিন্তু কখনও অপরের জন্য মানহানিকর কিছু বলতে পারবেন না, ধর্মবিদ্বেষ প্রচার করতে পারবেন না। সমাজে দাঙ্গা সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা বলতে বা কাজ করতে সরকার দিবে না। মনে রাখতে হবে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারো মনের উপর জবরদস্তি না করা, মহানুভবতা, উদারতা, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, ইত্যাদি সৌন্দর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী, নাস্তিক সকলের মন জয় করেছিল ইসলাম। সেজন্য 'আদর্শ' হিসাবে এখনও ইসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের নামে যারা উগ্রবাদের চর্চা করে তাদের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যমূলক এবং কোর'আনের নিরিখে গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে 'জঙ্গিবাদ সংকট - সমাধানের উপায়' পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং সর্বধর্মীয় সম্প্রীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, একাত্মতা ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধারাগুলো তুলে ধরছি:

০১. **ধর্মীয় বৈষম্যহীনতাঃ** রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, চাকরি, অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেউ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে প্রাধান্য পাবে না বা বৈষম্যের শিকার হবে না। রাষ্ট্র মানুষকে তার কর্মদক্ষতা, সততা, যোগ্যতা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবে, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়।

০২. **ধর্মীয় সংলাপঃ** রাষ্ট্র জনগণের মধ্যে ধর্মীয় শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর মধ্যে ধর্মীয় সংলাপ, সম্প্রীতি মেলা, পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধর্মের পরিচিতি, আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক তুলে ধরে পারস্পরিক বিভেদ ও শত্রুতা দূর করা হবে। সরকারের লক্ষ্য হবে ধর্মীয় বিভেদ দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, যাতে কোনো সম্প্রদায় সামাজিকভাবে তাদের প্রতিবেশীদের

দ্বারা অবিচারের শিকার না হয়। এছাড়া, সকল ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষকদেরকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সকল ধর্মের ইতিহাস, সকল ধর্মগ্রন্থের মূল শিক্ষা এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যাতে তারা সমাজে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

০৩. **জিজিয়া কর:** মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে, যারা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষামূলক উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদেরকে প্রতিরক্ষা কর দিতে হবে।

০৪. **বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্বাধীনতা:** রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে না। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে তার ধর্ম বা বিশ্বাস চয়ন করার বা না করার অধিকার থাকবে। কারো ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর জবরদস্তি করতে দেওয়া হবে না এবং কোনো ব্যক্তি যদি ধর্ম ত্যাগ, পরিবর্তন বা অবিশ্বাস করে, তাকে সেজন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। রাষ্ট্র শুধুমাত্র অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন করলে শাস্তি প্রদান করবে। সকল নাগরিককে অন্যের ধর্মীয় আচরণ বা বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখাতে উৎসাহিত করবে। কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো যাবে না।

০৫. **আইন ও ন্যায়:** আইন সকল ধর্মের মানুষের জন্য সমান থাকবে এবং অপরাধী যে ধর্মেরই হোক তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে রাষ্ট্র চাইলে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখে বিকল্প দণ্ডবিধি প্রবর্তন করতে পারে। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে রাষ্ট্রের আইনের পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। ধর্মীয় অধিকার বা মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্ট্র কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সহ্য করবে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology)

মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হচ্ছে মানুষও সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণেই মানুষ বহু সভ্যতার নির্মাতা। মানুষের মধ্যে কারো কারো সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি। মানুষের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনুপ্রেরণা ও পরিবেশ তৈরি করে দেবে। রাষ্ট্রগঠনের পর এটাই রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এর উপরই রাষ্ট্রের উন্নতি প্রগতি নির্ভর করে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বহু প্রাকৃতিক সত্যের উল্লেখ করেছেন এবং এসব নিদর্শন নিয়ে মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করনি। (সুরা ইমরান ৩:১৯০-১৯১)। এমন আরো বহু আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে নব নব আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। (দেখুন- সুরা নহল ১৬:১১, ৭৮, সুরা বাকারা ২:২১৯, সুরা নাহল ১৬:১১, সুরা রূম ৩০:২১, সুরা নুর ২৪:৪৪, সুরা আনআম ৬:৫০, সুরা ইউনুস ১০:২৪, সুরা যুমার ৩৯:৪২, সুরা গাশিয়া ৮৮:১৭।)

ইসলামের সোনালি যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় গবেষণা ও উন্নতির জন্য ইসলামি রাষ্ট্র নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করত। আবিষ্কার, অনুসন্ধান, সৃষ্টিশীলতা মানুষের মধ্যে থাকবে। এই কাজে বিনিয়োগ করেছে রাষ্ট্র। তাদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। কোনো অন্ধত্ব, গোড়ামি, পশ্চাৎপদতা আরোপ করা হয়নি। যেমনটা মধ্যযুগের ইউরোপে হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবিত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত সংক্রান্ত আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

০১. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গুরুত্ব:** আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিজ্ঞান গবেষণার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে।

০২. **উদ্ভাবকদের প্রণোদনা ও সম্মান:** নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির জন্য গ্রাম থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়া হবে। উদ্ভাবকদের গবেষণায় উৎসাহিত

করতে মর্যাদা, পুরস্কার, বিনিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষণ করা হবে। তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব ও রয়ালিটি দিয়ে সঠিক মূল্যায়ন করা হবে।

০৩. **নতুন প্রযুক্তিতে গুরুত্ব:** তথ্য প্রযুক্তি, রোবটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, টেলিমেডিসিন ও অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তিখাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পরিবেশ ও জলবায়ুর জন্য ক্ষতিকর প্রযুক্তি ব্যবহার বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

০৪. **নৈতিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ:** প্রযুক্তিবিদ, উদ্ভাবক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের দ্বারা যেন মানবতার ক্ষতি না হয়, সেজন্য বিজ্ঞান স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। তাদের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের পাশাপাশি আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার আধ্যাত্মিক শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে তারা ঘোর জড়বাদী না হয়ে দেহ, আত্মা, ইহকাল ও পরকালের জ্ঞানে ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।

০৫. **প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন:** প্রযুক্তি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণাগার ও শিক্ষা উপকরণসমৃদ্ধ অবকাঠামো তৈরি করা হবে। পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা পদ্ধতি বিশ্বমানের হবে এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতের (STEM) ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে, ছাত্রদের মতামত প্রকাশের জন্য ছাত্রসংসদ থাকতে পারে।

০৬. **কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ:** শিক্ষা শেষে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে তাদের হতাশা দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রথমত, দেশের প্রযুক্তি ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে, যাতে তরুণরা উচ্চমানের চাকরি পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্টার্টআপ (নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) এবং উদ্ভাবনী (Innovative) উদ্যোগগুলোকে প্রণোদনা দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, বিদেশে অভিজ্ঞতা অর্জন করা তরুণদের দেশে ফিরে উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তহবিল ব্যবস্থা করা হবে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে তরুণরা দেশে থেকে নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান পাবে এবং দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা (Art and Culture)

সংস্কৃতি যে কোনো সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানব ইতিহাসে কখনও এমন কোনো সভ্যতার বিকাশ হয়নি যেখানে শিল্পচর্চা ছিল না। কারণ এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা বা চাহিদা। তাই আল্লাহর দীনও এগুলোকে পরিহার করতে বলে না, বরং একে তার প্রাপ্য স্থানটি প্রদান করে। সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংস্কৃতি বলতে সেই সকল পন্থাকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে মানব জাতি তাদের প্রকৃতিগত বর্বরতাকে কাটিয়ে উঠে মানবিকতার বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ণরূপে মানুষে পরিণত হয়। কোনো এলাকার মানুষের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যকলা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। গান, নাটক, সিনেমা, অভিনয়, চিত্রকলা, সাহিত্য - এগুলো হলো সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি মাধ্যম।

ইসলাম একটি সভ্যতার নাম। ইসলাম সংস্কৃতিচর্চাকে উৎসাহিত করেছে। আরবের জাহেলি সমাজে যখন রসুল (সা.) আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তিনি আরবের সংস্কৃতিকে বাদ দেননি। সে যুগে আরবে খুব কাব্যচর্চা হত, বড় বড় কবিতা মানুষ মুখস্থ করে রাখতে পারত। আল্লাহ সেই সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কবিতার ছন্দে কোর'আন নাজিল করলেন যা আরবদের অভিভূত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের কবিতাগুলো ছিল অশ্লীল, আদিরসাত্মক। আর আল্লাহর পাক কালামের ভাষা ছিল পবিত্র, স্বর্গীয় মাধুর্যে পূর্ণ। এখানেই কবিতায় কবিতায় তফাত হয়ে গেল। সুতরাং বোঝাই গেল কাব্যচর্চাকে আল্লাহ হারাম করেননি। বরং অনেক সাহাবিকে রসুলাল্লাহ ভালো কবিতা লেখার জন্য প্রশংসা করেছেন। একইভাবে আল্লাহ গানও হারাম করেননি। আরবের নর্তকী দাসীদের নাচ-গানে, জীবনাচরণে অশ্লীলতা মিলে মিশে একাকার ছিল। ইসলাম এই অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু গান হারাম করেনি।

হালাল ও হারাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হলো, আল্লাহ যা হারাম করেন নি তা হালাল। আল্লাহ কোর'আনে গুটিকয় কাজ, খাদ্য ও বিষয় হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, হারাম করেছেন আল্লাহর

নাফরমানি, অন্যায়-অত্যাচার চালানো, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না (সুরা আরাফ ৭:৩৩)।

এখানে তিনটি বিষয়কে হারাম করা হচ্ছে। এক- অশ্লীলতা। দুই- আল্লাহর নাফরমানি অর্থ আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধানের লংঘন করা, তিন- আল্লাহর সঙ্গে শেরক করা। এই তিনটি কাজ না করে যে কোনো কাজ, সেটা শিল্পচর্চা হোক কি দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো কাজ তা ইসলাম পরিপন্থী বা নাজায়েজ কাজ হতে পারে না। রসুলাল্লাহর উপস্থিতিতেও মদীনায় সাহাবীদের বিয়ে শাদি বা অন্য যে কোনো উৎসবে দফ বাজিয়ে গান গাওয়া হতো। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও। এটা মসজিদে সম্পন্ন করো এবং বিবাহ উপলক্ষে দফ বাজাও।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।) একটি হাদিসে এমন কি এও বলা হয়েছে যে, 'হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো- বিয়ের সময় দফ বাজানো এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।)

রসুলাল্লাহর নারী সাহাবি রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনু আফরা (রা.) বলেন, 'আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী (সা.) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময়ে মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন গাইছিল- আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি ভবিষ্যৎ জানেন। তখন রসুলাল্লাহ বললেন, এ কথাটি বাদ দাও, আগে যা গাইছিলে তাই গাও (সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৫১৪৭)।' লক্ষ্য করুন, এখানে রসুলাল্লাহ (সা.) মেয়েদেরকে গান গাইতে বারণ করলেন না, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে একটি মিথ্যা ধারণা তিনি সংশোধন করে দিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, এসব হাদিস থেকে বোঝা যায় কেবল দফ বাজানো জায়েজ, বাকি সব বাদ্যযন্ত্র হারাম। বস্তুত সে যুগে আজকের মতো এত সব বাদ্যযন্ত্রই ছিল না, ছিল কেবল দফ, তাম্বুরা ইত্যাদি। সেগুলোই তারা বাজাতেন।

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যদি হারামই হতো তাহলে পবিত্র কোর'আনে একটি আয়াতেও কি আল্লাহ সেটা উল্লেখ করতে পারতেন না? না। তিনি কোথাও এ জাতীয় কোনো কথাই বলেন নি। কিন্তু দীনের অতিবিশ্লেষণ করে সুরা লোকমানের ৩১:৬ নম্বর আয়াতকে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় যেখানে আল্লাহ সঙ্গীত শব্দটিই বলেন নি, বলেছেন অসার কথাবার্তা। আল্লাহ বলেন, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।' অসার (Meaningless), অনর্থক (Futile), অবান্তর (Irrelevant), অশ্লীল (Obscene) ইত্যাদি কথাগুলোকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- লাগওয়া (সুরা মুমিনুন ২৩:৩), লাহওয়াল হাদিস (সুরা লোকমান ৩১:৬), ফাহেশা (সুরা নুর ২৪:১৯)। অসার কথা, অহেতুক কথা সব সময়ই নিষেধ।

সঙ্গীত আর অসার বা অবান্তর কথা কি এক বিষয়? সঙ্গীতের বাণী তো শিক্ষামূলকও হতে পারে, সুন্দর সমাজ ও মানবতাবোধের বাণীও সঙ্গীতে ধ্বনিত হতে পারে। নয়তো আজান কেন সুর করে দেওয়া হয়? কোর'আন কেন সুর করে পড়া হয়? তাছাড়া আসমানি কেতাববাহী প্রধান চার রসুলের অন্যতম দাউদ (আ.) এর মো'জেজাই ছিল তাঁর সুরেলা কণ্ঠ। তিনি হার্প (Harp) নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, যার ছবি ঐ সময়ের মুদ্রাতেও অঙ্কিত ছিল। তিনি বলতেন, On the harp I will praise you o God (Old Testament – Psalm 43.4)

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রসুল ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম পুরুষ, যিনি মাত্র ৯ বছরে ১০৭ টি ছোট বড় যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করেছেন, যিনি মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য এক মহান বিপ্লব সম্পাদন করেছেন। **এমন এক মহা বিপ্লবীর গান নিয়ে পড়ে থাকার অবসর ছিল না। তবু অবসরে নিজ গৃহে অথবা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে গান শোনানো হয়েছে।** তিনি নিষেধ করেননি, শুনেছেন। তিনি যখন হিজরত করে মদিনায় এসে পৌঁছান তখন তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আনসার নারী পুরুষ শিশু কিশোর নির্বিশেষে দফ বাজিয়ে 'তালা-আল বাদরু আলাইনা' গানটি গাইতে থাকেন। এই গানটি ১৪০০ বছরেরও বেশি পুরনো সঙ্গীত যা আজও মিলাদের সময় গাওয়া হয়। মদিনায় এসে মসজিদে নববী নির্মাণের সময় আল্লাহর রসুল (সা.) তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে কর্মসঙ্গীত গেয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও গান গেয়েছিলেন। - (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।)

জাহেলিয়াতের যুগে আরবে গান আর অশ্লীলতা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই অনেক সাহাবি গানকেই ফাহেশা কাজ বা মন্দ কাজ বলে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁদের এই ভুল ধারণা ভাঙিয়ে দিলেন। আম্মা আয়েশা (রা.) গান পছন্দ করতেন। তাঁর গৃহে রসুলাল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেই গান গাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(ক) একদিন দুটো মেয়ে রসুলাল্লাহর ঘরে দফ ও তাম্বুরা বাজিয়ে গান গাইছিল। রসুলাল্লাহ শুয়ে ছিলেন। আম্মা আয়েশাও (রা.) গান শুনছিলেন। এমন সময় তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) আসেন এবং আম্মা আয়েশাকে (রা.) তিরস্কার

করেন। তখন আল্লাহর নবী আবু বকরের (রা.) দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আবু বকর! তাদেরকে তাদের কাজ করতে দাও। আজ তাদের ঈদের দিন।’ (সহিহ বোখারী, হাদিস নং ৯৮৭)।

(খ) আয়েশা (রা.) একটি মেয়েকে লালন পালন করতেন। অতঃপর তাকে এক আনসারের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থল থেকে আয়েশা (রা.) এর প্রত্যাবর্তনের পর রসুলাল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি গীত গাইতে পারে এমন কাউকে সেখানে পাঠিয়েছ?’ আয়েশা (রা.) বললেন, ‘না’। রসুলাল্লাহ বললেন, ‘তুমি তো জান আনসাররা অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়’ (মিশকাতুল মাসহাবি)।

(গ) আবু বোরায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (স.) কোনো একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী সাহাবী মহানবী (স.) এর সামনে এসে বললেন যে- ‘ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি মানত করেছিলাম যে, আপনাকে নিরাপদে আল্লাহ ফিরিয়ে আনলে আমি আপনার সামনে দফ বাজিয়ে গান গাইব।’ মহানবী (স.) বললেন, ‘যদি তুমি মানত করে থাক তাহলে বাজাও। মানত পূর্ণ কর। তারপর মেয়েটি দফ বাজিয়ে গান গাইতে লাগল।’ [তিরমিজি ২য় খণ্ডের ২০৯-২১০ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরিফের ৫৫৫ পৃষ্ঠা ও আবু দাউদ শরিফ]।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কৃতি চর্চার প্রতিটি দ্বার থাকবে উন্মুক্ত। সকল মানুষের অধিকার রয়েছে তার নিজেকে প্রকাশ করার, বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে তার জ্ঞানকে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ছড়িয়ে দেওয়ার। সে হিসেবে গান, নাটক, কবিতা, শিল্পচর্চা, অভিনয়, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা নারী-পুরুষ সকলের থাকবে। তবে সেই সাথে একটি কথাও সবাইকে মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবনে আনন্দ-বিনোদনের প্রয়োজন আছে বটে, তবে এগুলোই জীবনের মূল কাজ নয়। সে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাই তার জীবন মহা মূল্যবান। আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আসমান, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা অনর্থক ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।’ (সুরা আম্বিয়া ২১:১৬)। তাই নাগরিকদের জীবনকে পরিকল্পিতভাবে আনন্দফুর্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করার প্ররোচনা দেওয়া রাষ্ট্রের জন্য আত্মঘাতী হবে। আমরা শুধু প্রস্তাব করবো,

০১. **মূলনীতির আনুগত্য:** যে আদর্শের ভিত্তির উপর আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেই আদর্শের বিরুদ্ধে কোনো কিছুর চর্চা করা যাবে না। তাহলে রাষ্ট্রই থাকবে না।

০২. **কী করা যাবে না:** সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা করা যাবে না, ঐক্যবিনষ্ট হয়, বৈষম্য সৃষ্টি হয় এমন কথা গানে কবিতায় বলা যাবে না। সংস্কৃতি চর্চার নামে ঘৃণা ও হিংসার বিস্তার ঘটাতে দেওয়া হবে না।

০৩. **রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা:** দেশ, মানুষ, আল্লাহ, রসুল ও সত্যদীনের আদর্শ তুলে ধরার জন্য যত ইচ্ছা গান, সিনেমা, নাটক, চিত্র প্রদর্শনী হোক এতে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা বিশেষ সৃজনশীল মেধার স্বাক্ষর রাখবে তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগে স্বীকৃতি ও পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

◇◇

সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে তুমি তাদের উপর কোমল হৃদয় হয়েছ এবং যদি তুমি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় হতে তবে অবশ্যই তারা তোমার নিকট হতে সরে যেত। সুতরাং তাদের দোষ ক্ষমা কর এবং আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও এবং কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন (কোনো ব্যাপারে) সংকল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহরই প্রতি ভরসা কর; নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।

সুরা ইমরান ৩:১৫৯

◇◇

যুবশক্তি ও ক্রীড়া (Youth Power and Sports)

জাতির প্রাণশক্তি হলো যুব সমাজ। যুবসমাজকে গতিশীল, আদর্শবান, সুস্থ দেহমনের অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য এবং তাদেরকে মাদক, স্বার্থপরতা, অসুস্থ বিনোদন, অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে পারে খেলাধুলা। খেলাধুলার মাধ্যমে একজন মানুষ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভের পাশাপাশি ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও নেতৃত্বের গুণও অর্জন করে। তার মধ্যে তৈরি হয় সংকট মোকাবেলার শারীরিক সক্ষমতা। এটা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রয়োজন। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেকেই খেলাধুলাকে সময় নষ্ট ও হারাম কাজ বলে ফতোয়া দেন। কিন্তু ইসলাম শরীরচর্চামূলক খেলাধুলাকে উৎসাহিত করে। অলস, অকর্মণ্য ব্যক্তিদের ইসলাম পছন্দ করে না। হাদিসে আছে, আল্লাহ পছন্দ করেন কর্মচঞ্চল, সজীব, প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ মো'মেনকে। (সহীহ মুসলিম)।

রসুল (সা.) নিজে মদীনার মসজিদে নববীর সামনে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। কুস্তি, তীর বা বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তিনি পুরস্কৃতও করতেন। নিজেও অংশগ্রহণ করতেন এসব প্রতিযোগিতায়। তবে যেসব খেলা মানুষকে অন্তর্মুখী ও স্থবির করে সেগুলোকে এবং যে খেলার মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অর্থের লেনদেন, জুয়া বা বাজি ধরা হয়, এ ধরনের খেলাগুলো খেলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন (সুরা বাকারা ২:২১৯, সুরা মায়েদা ৫:৯০)। তাই আমাদের প্রস্তাবিত ক্রীড়ানীতি হল:

০১. **ক্রীড়ার মাধ্যমে সমাজ গঠন:** ক্রীড়ানুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যগঠন ও সমাজে ঐক্য, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, নেতৃত্বগুণ, পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করা হবে।

০২. **ক্রীড়াঙ্গনে শৃঙ্খলা:** ক্রীড়াঙ্গনে অশ্লীলতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অর্থের লেনদেন, জুয়া বা বাজি ধরা নিষিদ্ধ করা হবে। গ্রামে বা শহরে সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে নির্ভয়ে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। খেলা নিয়ে মারামারির কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না।

০৩. **আউটডোর গেমস:** আউটডোর গেমস যেমন হাডুডু, ফুটবল, ম্যারাথন দৌড়, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, সাইক্লিং, ভলিবল, হকি ইত্যাদি খেলা উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও যে সকল গ্রামীণ জনপ্রিয় খেলা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সেগুলোতে যেন শিশু কিশোররা স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

হবে। দেশীয় খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলা ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৪. **অন্তর্মুখী খেলা:** অন্তর্মুখী বিনোদন বা ক্রীড়াকে (তাস, ডিজিটাল গেমস, লুডো, কেরামবোর্ড ইত্যাদি) নিরুৎসাহিত করা হবে।

০৫. **আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলা:** আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলা যেমন জুডো, বক্সিং, কারাতে, কুংফু, কুস্তি ইত্যাদি উৎসাহিত করা হবে।

০৬. **খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম প্রাণবন্ত রাখা:** গ্রাম থেকে শহর প্রতিটা অঞ্চলে খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারি উদ্যোগে খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে, দখলমুক্ত করা হবে এবং খেলার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। স্টেডিয়ামগুলোকে সব সময় প্রাণবন্ত রাখার জন্য বিভিন্ন খেলার টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে।

০৭. **ক্রীড়াঙ্গনে বাজেট:** দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে অংশ নিতে তারুণ্যশক্তিকে সদা-সর্বদা প্রস্তুত, উজ্জীবিত, গতিশীল, স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে ক্রীড়াঙ্গনেও বৃহৎ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

০৮. **ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা:** ক্রীড়াঙ্গনে যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবেন তাদেরকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হবে।

০৯. **মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ:** সকল খেলায় মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হবে।

১০. **স্কুলে খেলাধুলা:** স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কেবল বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান নয়, বছর জুড়েই নিয়মিত শরীরচর্চা, স্কাউটিং ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা হবে।

১১. **আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা:** অন্যান্য দেশের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক উন্নয়নকল্পে যথাসম্ভব সকল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের চেষ্টা করা হবে।

১২. **জনগণের অংশগ্রহণ:** ক্রীড়া কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ এবং ক্রীড়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন, ইভেন্ট এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

১৩. **স্পোর্টিং ক্লাব গঠন:** প্রতিটা অঞ্চলে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি প্রণোদনায় ক্রীড়া-ক্লাব গঠন করা হবে, বেসরকারি উদ্যোগেও ক্রীড়া-ক্লাব গঠনের ব্যাপারেও উৎসাহিত করা হবে।

১৪. **জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা:** খেলাধুলার পাশাপাশি নারী-পুরুষের শরীর গঠনের জন্য সরকারি উদ্যোগে জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হবে যেখানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা (Status and Role of Women)

নারী আল্লাহর সৃষ্টি, পুরুষও আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।' (সুরা আরাফ ৭:১৮৯)। 'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।' (সুরা বাকারা ২:১৮৭)। 'আর তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হল, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।' (সুরা রুম ৩০:২১)।

কাজেই নারী আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি ও নিদর্শন। তাদের সৃজনশীলতা, কর্মকুশলতা, দায়িত্বজ্ঞান, নেতৃত্বের গুণাবলি, সাহসিকতা, জ্ঞান ও যোগ্যতা মোতাবেক তারা রাষ্ট্রে পুরুষের পাশাপাশি ভূমিকা রাখবে এটাই ইসলামের অভিপ্রায়। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের দোহাই দিয়ে বা কোনো প্রকার হুমকি দিয়ে তাদেরকে পিছিয়ে রাখার বা অবরুদ্ধ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে বিকৃত করে নারীদের উপর অবমাননাকর লোকাচার ও দেশাচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে ধর্মীয় বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ, নবী-রাসূলগণ যুগে যুগে নারীদের প্রতি এই অন্যায্য লোকাচার, দেশাচার ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং তাদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নিরলস সংগ্রাম করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত আরবের ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে নারীদের প্রতি অবমাননা, বৈষম্য এবং নিপীড়ন সীমা অতিক্রম করেছিল। নারীদের অনেক সময় ডাইনি, পাপের উৎস, আত্মাহীন বা নরকের দ্বার হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। ইসলামপূর্ব আরব সমাজে নারীদেরকে এতটাই বোঝা মনে করা হতো এবং অবমূল্যায়ন করা হত যে মেয়ে শিশুদেরকে তাদের বাবারা জীবন্তই কবর দিয়ে দিত। নারীদেরকে সমাজে দাসী বা ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো। মুসা (আ.)-এর সময়ে যেমন মিশরীয় সমাজে নারীরা দাসী হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তেমনি প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে নারীশিক্ষা, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রায় ছিল না। রোমান সভ্যতাতেও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না এবং তাদের সম্পত্তি

দাবি করার অধিকারও ছিল না। ইসলাম আগমন করার পর নারীদের অবস্থান এবং অধিকারকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। ইসলাম নারীদেরকে শুধু পূর্ণ মানবাধিকারই দেয়নি, বরং নারী হিসাবে তাদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মানও প্রদান করেছে। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যদি আল্লাহর পথে কাজ করতে চাও, তবে নারীদেরকে সম্মানিত করবে।' (মুসলিম-১৪৬৮)।

আমাদের প্রস্তাবিত ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীরা তাদের শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, পোশাক নির্বাচনের অধিকার, বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার, বিবাহ ও পারিবারিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার, অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার লাভ করবে। এসব অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনোরকম বৈষম্যমূলক শর্ত আরোপ করা হবে না। তাই এই স্বাধীনতাগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে আলাদা করে বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু যেসব বিষয় নিয়ে আমাদের সমাজে দ্বিধা, পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলছি।

০১. **নারীর পোশাকঃ** পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীদেরকে সম্বোধন করে তাদের পোশাক সংক্রান্ত নীতিমালা প্রদান করেছেন। সুতরাং এই পোশাকরীতি মো'মেনরা মান্য করবেন। সেই নীতিমালা হচ্ছে, (ক) নারী পুরুষ উভয়েই শালীন পোশাক পরিধান করবে যেন তাদের লজ্জাস্থান আবৃত থাকে। (খ) পুরুষের জন্য নাভির নিচ থেকে শুরু করে যৌনাঙ্গ পর্যন্ত ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক, কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর জন্য হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক ইত্যাদি যা সাধারণত প্রকাশমান অর্থাৎ বিভিন্ন কাজে যা প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়ে তা ব্যতিত বাকি শরীর হলো নারীর জন্য সতর। **অর্থাৎ নারীদের জন্য অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা হচ্ছে তাদের বক্ষদেশ আবৃত রাখা।** এ হচ্ছে কোর'আনের বিধান মোতাবেক মো'মেন নারী ও পুরুষের পোশাকের সর্বনিম্ন সীমা। অথচ এখন কোনো নারী যদি ধার্মিক হতে চায়, তাকে পর্দার নামে মুখমণ্ডল, হাত ও পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো দেশে বাধ্যতামূলক হিজাব আইন করা হয়েছে যে মেয়েদের মুখসহ পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে। কোনো কোনো দেশে মুখ খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও চুল ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। ইরান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও পাকিস্তানের কিছু অঞ্চল, সৌদি আরবে কঠোরভাবে নারীদের পোশাক শরিয়াহ পুলিশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ২০২২ সালে মাথা পুরোপুরি না ঢাকায় পরিপূর্ণ হিজাব করা হয়নি এই অভিযোগে ইরানে মাহসা আমিনি নামে একজন নারীকে গ্রেফতার করা হয় যিনি শরিয়াহ পুলিশের হেফাজতে মারা

যান। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে মারা গেছে আরো পাঁচ শতাধিক মানুষ এবং গ্রেফতার হয়েছে ২০ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ির পরিণাম কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে তার উদাহরণ এই ঘটনা। অথচ সুরা নূরের ২৪:৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, 'তারা (মো'মেন নারীরা) যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে (মা জাহারা মিনহা) তা ব্যতিত তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।' অর্থাৎ মুখমণ্ডল, হাত, পা, মাথাসহ পুরো শরীর ঢেকে রাখার বিধানটা বাড়াবাড়ি। কিছু অঙ্গ যেগুলো সাধারণত প্রকাশমান, যেগুলো দৈনন্দিন কাজকর্মে কাজে লাগে, সেগুলো খোলা রাখাই আল্লাহর নির্দেশনা। যেমন দেখার জন্য চোখ, খাওয়া ও কথা বলার জন্য মুখ, শ্বাস নেওয়ার জন্য নাক, কাজকর্ম করার হাত, চলার জন্য পা ইত্যাদি খোলা থাকা প্রয়োজন। এটাই আল্লাহ বলেছেন, They shall not reveal any parts of their bodies, except that which is necessary. এটা কেবল আমাদের মতামত নয়, বরং সেই 'সাধারণ প্রকাশমান অঙ্গ' কোনগুলো সেটা হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফিকাহ গ্রন্থ আল হেদায়াহ-তে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, মুখমণ্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত খোলা রাখার যৌক্তিক কারণ হলো এই যে, পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের লেনদেন তথা দেওয়া নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখারও বিশেষ জরুরত রয়েছে। [আল হেদায়াহ (৪র্থ খণ্ড), পৃষ্ঠা ১৬৯ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)]। এই বিধান মো'মেন নারীদের জন্য এবং তারা সেটা স্বেচ্ছায় পালন করবে। শরিয়াহ পুলিশ দিয়ে বাধ্য করা হবে না। পোশাক আশাক মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে, সামাজিক সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আঞ্চলিক বা ধর্মীয় সংস্কৃতি মানুষ নিজে থেকেই পালন করে, জোর করার প্রয়োজন পড়ে না। যেসব নারীরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে না অর্থাৎ মো'মেন হবে না, পোশাকের কারণে তাদের সঙ্গে কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করার সুযোগ থাকবে না, তাদের সকল কাজে অংশগ্রহণের সম-অধিকার থাকবে। কেউ যদি ধার্মিকতার (পরহেজগারি) নিদর্শনস্বরূপ অতিরিক্ত পোশাক পরতে চায়, সেটা তার পোশাক নির্বাচনের স্বাধীনতার আওতায় পড়বে। তবে জনসম্মুখে, সামষ্টিক কাজে অংশগ্রহণের সময় সবাইকে অবশ্যই শালীন ও পরিমিত পোশাক পরতে হবে। যেসব পোশাক বিশ্বের সকল সমাজ, সভ্যতায় ও ধর্মীয় মানদণ্ডে অশ্লীল বলে গণ্য করা হয়, সেগুলো পরিধানের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হবে এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পোশাক পরার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। সোজা কথায় জনসম্মুখে পোশাকবিহীনভাবে চলাফেরা করাকে বৈধতা দেওয়া হবে

না, যেটা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলোতে আইনীভাবে বৈধ।

০২. **সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে নারীঃ** ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী করিম (সা.) ও সাহাবিদের যুগে নারীরা খুবই মুক্ত পরিবেশে সকল সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা ও অধিকার পেয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অসামান্য সফলতার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে পর্দা সংক্রান্ত বিধানের অতিব্যাখ্যা, সূক্ষ্মব্যাখ্যা করে বাড়াবাড়ি করে পর্দার নামে নারীদেরকে কার্যত গৃহবন্দী করে ফেলা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা অন্তর্মুখী, অবলা, জড়, নিষ্প্রাণ ও কূপমণ্ডূক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। **আমরা পর্দার নামে নারীদের এভাবে পশ্চাৎপদ করে ফেলার ঘোর বিরোধী, কারণ রসুলাল্লাহ এটা করেননি।** তিনিই ইসলামের মানদণ্ড, তিনিই কোর'আনের ব্যাখ্যাতা। তাঁর সময় নারীরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়েছেন, তারা জুমায় অংশ নিয়েছেন, একই জামাতে দাঁড়িয়ে নারী ও পুরুষ নামাজ পড়েছেন, একত্রে বসে খোতবা শুনেছেন, কোনো প্রশ্ন থাকলে সরাসরি রসুলাল্লাহকে প্রশ্ন করেছেন, ঈদের ময়দানে তারা গিয়েছেন, যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন, সেনাবাহিনীতে রসদ প্রস্তুত ও সরবরাহের কাজ করেছেন, আহতদের বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছেন, তাদের সেবা করেছেন, শহীদদের দাফন করেছেন, এমনকি অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা এখানে ইসলামের ইতিহাসের এমন কয়েকজন মহিয়সী নারীর অবদান তুলে ধরছি।

উম্মে আম্মারা (রা.): ওহুদের যুদ্ধে রসুলাল্লাহ (সা.) যখন শত্রুদের তীরের আঘাতে মারাত্মক আহত হন, লোহার হেলমেট ভেঙে তার মাথার ভিতরে প্রবেশ করে, তিনি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। গুজব রটে যায় যে তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। যুদ্ধের এই চরম মুহূর্তে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রসুলাল্লাহকে রক্ষা করেছিলেন নুসায়বা বিনতে ক্বাব (রা.) যিনি উম্মে আম্মারা নামে পরিচিত। তাঁর পরাক্রম দেখে বহু পুরুষ সাহাবি যাঁরা বিপর্যয়ের মুখে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তারা সাহস পেয়ে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি উল্টে যায়।

রুফায়দাহ (রা.): মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য। এই হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন রুফায়দাহ আল আসলামিয়া (রা.) এবং তাঁর টিমে অনেক নারী ও পুরুষ সাহাবি কাজ করতেন। এ হাসপাতালকে তিনি একটি মেডিকেল স্কুলের রূপ দিয়েছিলেন।

আশ-শিফা (রা.): রসুলাল্লাহর (সা.) নারী সাহাবী শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) যিনি আশ-শিফা নামে পরিচিত, তিনি তৎকালীন চিকিৎসাপদ্ধতি ভালো জানতেন বিশেষ করে চর্মরোগের চিকিৎসা। খলিফা উমর (রা.) তাঁকে মদিনার বাজার নিয়ন্ত্রক

(মুহতাসিব) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। মুহতাসিবের দায়িত্ব ছিল ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করা, ওজনে প্রতারণা রোধ করা এবং বাজারের নিয়মকানুন বজায় রাখা।

আম্মা আয়েশা (রা.): উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা (রা.) রসুলাল্লাহর কাছ থেকে দীনের প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি রসুলাল্লাহর সঙ্গে বহু যুদ্ধের সঙ্গী ছিলেন এবং নারী অংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি প্রচুর হাদিস (প্রায় ২,২১০ টি) বর্ণনা করেন এবং নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞান প্রচার করতেন।

ফাতেমা আল ফিহরি: ফাতেমা আল ফিহরি (৮৩০-৮৭০) ছিলেন একজন নারী শিক্ষাবিদ যিনি ৮৫০ সালে মরোক্কোর ফেজ শহরে কারাউয়াইন মাদ্রাসা (University of al-Qarawiyyin) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বের প্রথম সনদপ্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত। প্রতিষ্ঠানটি আজও উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এভাবেই নারীদের প্রতিভা, জ্ঞান ও যোগ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

০৩. **পেশাজীবী নারী:** আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অনেক চ্যালেঞ্জিং কর্মক্ষেত্র যেমন মিডিয়া, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আদালত, পোশাক শিল্প, কলকারখানা ইত্যাদি অঙ্গনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাদের যোগ্যতা মোতাবেক অংশগ্রহণের সমান সুযোগ পাবে।

০৪. **নারী নেতৃত্ব:** নারী নেতৃত্ব হালাল না হারাম এ নিয়ে আমাদের ধর্মীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ও আধুনিকমনস্ক ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে কোর'আনের একটি আয়াত সকলেই উল্লেখ করে থাকেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন, পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বকারী কারণ তারা ব্যয় করে (সুরা নিসা ৪:৩৪)। পূর্বের আয়াতের ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে এটা বোঝাই যায় যে, এটি একটি পারিবারিক শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধান। এখানে পুরুষকে পরিবারের কর্তা হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার স্ত্রী ও অন্যান্যদের ভরণপোষণ করার জন্য। সেই অধিকারবলে পুরুষ তার পরিবারে কর্তৃত্ব করার অধিক হকদার। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে নারী কোনো নেতৃত্বপূর্ণ পদ পাবে না এটা বলা এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। কেননা পরবর্তীতে আম্মা আয়েশার (রা.) নেতৃত্বেই উটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে খাওলা বিনতে আজওয়ারের (রা.) নেতৃত্বে নারীদের একটি বাহিনী রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন সুলতানের শাসনামলে অনেক নারী রাজ্য পরিচালনা করেছেন ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। একজন নারী হয়েও ফাতেমীয় খেলাফতের সময় মিশরের শাসক হয়েছিলেন সিত্ত উল-মুলক (১২১০-১২১৫ সন), দিল্লির 'সুলতান'

হয়েছিলেন সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০), শাজার আল-দুর (১২৪০-১২৪৩) ছিলেন মিসরের প্রথম মহিলা 'সুলতান হিসাবে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার শাসনামলে অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাঁরা তাদের নিজ যোগ্যতায় রাজ্যশাসন ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্বপালন করেছেন এবং নিজেদের যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। সুতরাং নারী রাষ্ট্রের যে কোনো পদ লাভ করতে পারে যদি তার সে যোগ্যতা থাকে। তাঁরা যখন দায়িত্ব পালন করেছেন তখন সেসব অঞ্চল ইসলাম দিয়েই শাসিত হত, সেখানে অনেক খ্যাতনামা ফকিহ, আলেম, ইমাম, মুজতাহিদ ছিলেন। তারা নারীদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর আপত্তি করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমাদের আকিদা হল, যেহেতু সারা বিশ্বের মুসলিম একটি উম্মাহ। এই বিশ্বজনীন উম্মাহর একটি মাত্র পদ কোনো নারী পাবে না; সেটা হল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইমামের পদ। এর অনেক যৌক্তিক কারণ আছে। যেমন আল্লাহ লক্ষ লক্ষ নবী প্রেরণ করেছেন কিন্তু একজন নারীকেও নবী হিসাবে পাঠাননি। [আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিলেন জনপদবাসীদের মধ্য থেকে (সুরা ইউসুফ ১২:১০৯)]। খোলাফায়ে রাশেদার সময় কোনো নারী খলিফা হননি। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, নারীদের কিছু শারীরিক সীমাবদ্ধতা। যেমন তাদেরকে সন্তানধারণ করতে হয়, সন্তান লালনপালন করতে হয় যা তাদের জীবনের একটি অনিবার্য ব্যস্ততা। এছাড়া নারী পারিবারিকভাবে তার স্বামীর অধীনে থাকে, কিন্তু উম্মাহর ইমাম তো কারো অধীনে থাকতে পারে না। সমগ্র বিশ্বময় একটি উম্মাহকে পরিচালনা করার মত শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক স্থিরতা, চাপ নেওয়ার ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ এগিয়ে থাকে। আবার বলছি- এই বিধান সমগ্র বিশ্বময় একটি উম্মাহ পরিচালনার ক্ষেত্রে। এছাড়া যে কোনো নেতৃস্থানীয় পদে, পরিচালকের আসনে এমনকি কোনো একটি প্রদেশের গভর্নর বা প্রধান নির্বাহী পদেও নারী অধিষ্ঠিত হতে বাধা নেই।

০৫. **বিয়ের বয়স:** ইসলাম এমন একটি বাস্তবমুখী দীন (Pragmatic System) যা জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি ও চির পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ এমনভাবে মানব প্রকৃতি বা ফিতরাতের সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য এই দীনের বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন যেন সেগুলো যে কোনো ভূখণ্ডে, যে কোনো যুগে সমানভাবে চর্চা করা সম্ভব হয়, যেন সেগুলো কোনো স্থান-কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে পড়ে। তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে- এটাই শাশ্বত নিয়ম। নতুন পরিস্থিতিতে এবং নতুন সমস্যার সমাধানে ইসলাম ইমামের সিদ্ধান্ত

(সুরা নিসা ৪:৫৯), শুরা পরিষদের পরামর্শ ও ইজতেহাদ (সুরা শুরা ৪২:৩৮), এবং উম্মাহর ঐকমত্য বা ইজমা (সুরা নিসা ৪:১১৫; সুরা লোকমান ৩১:১৫)-এর মাধ্যমে সময়োপযোগী উপবিধান ও প্রবিধান প্রণয়নের সুযোগ দিয়েছে। তবে সেগুলোকে কোর'আনের মতো চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ইসলামের নারী ও পুরুষের বিয়ের বয়স কত হওয়া উচিত এটা নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কার প্রস্তাবে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। তথাপি রসুলাল্লাহ ও আম্মা আয়েশার (রা.) বিবাহের সূত্র ধরে এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক জারি রয়েছে। যেহেতু আমরা ইসলামকে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরছি, তাই এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। বিয়ের বয়স বিভিন্ন দেশের সামাজিক বাস্তবতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মূলনীতি হচ্ছে কোর'আন, যেখানে আল্লাহ বিয়েকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটি 'মজবুত চুক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। (সুরা নিসা ৪:২১)। পৃথিবীর সকল ধর্মে ও আইনে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) লোকদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চুক্তিপত্র, আদালতে সাক্ষী/ভোট/মতামতের বয়স ১৮ বছর আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা আছে। অতীতের সকল সভ্যতায় চুক্তি করার বয়স মোটামুটি এমনই ছিল। তাই সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে নয় দশ বছরের শিশুকে আল্লাহ কোনো 'মজবুত চুক্তি' করার অনুমতি দিবেন না। এছাড়া কোর'আনে নারীর বিবাহের উপযুক্ততা হিসেবে ৩ টি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। (১) বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক (আশুদ্ধা) হওয়া, (২) জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ (রুশদান) হওয়া এবং (৩) সম্পদ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জন করা। আল্লাহ বলেন, 'এতিমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার (সুরা নিসা ৪:৬)। এখানে বোঝাই যাচ্ছে বিয়ের বয়সের সঙ্গে বুদ্ধিবিবেচনার উন্মেষের (Sound judgment) একটি সম্পর্ক আছে। এতটুকু বুদ্ধি হওয়া জরুরি যতটুকু বুদ্ধি থাকলে একটি মেয়ে তার নিজের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব নিকাশ করতে পারে, বিয়ের উদ্দেশ্য কী তা যেন বুঝতে পারে। বালেগা হওয়া অর্থ সন্তান ধারণের উপযুক্ততা, আর বালেগ হওয়ার অর্থ পিতা হওয়ার শারীরিক উপযুক্ততা। শৈশব ও বাল্যকাল পার হওয়ার পরই বয়োঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই শারীরিক এই উপযুক্ততা তৈরি হয়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও এ দেশের মেয়েদেরকে ১২-১৫ বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিত। তারা অনেক সন্তানের মা হয়েছেন ও দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন। শরিয়তে এটা হলো বিয়ের বয়স হওয়ার প্রথম শর্ত। তবে পরবর্তী শর্তদুটো বিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এখানে ঢালাওভাবে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে ইসলাম অমানবিক ও অযৌক্তিকভাবে বাল্যবিবাহকে

অনুমোদন দেয়। এটি একটি অভিযোগমাত্র যার কোনো ঐতিহাসিক বা শরিয়াহগত ভিত্তি নেই। পৃথিবীর অনেক দেশেই আদালতের অনুমতি নিয়ে বাবা-মায়েরা ১৫-১৬ বছরেই তাদের সন্তানদের বিয়ে দিতে পারেন। আবার চিনে ২০ বছর মেয়েদের আর ২২ বছর ছেলেদের বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে আর্থ-সামাজিক বৈচিত্রের বিবেচনায় একেক দেশে একেক বয়স নির্ধারণ করার সুযোগ ইসলামেও রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর নীতিকে রক্ষা করে সেটা নির্ধারণ করতে হবে।

০৬. **বহুবিবাহ:** পুরুষদের জন্য শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে একসঙ্গে একাধিক স্বামী থাকা নিষিদ্ধ। এ বিধানের নিরিখে ইসলামে নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন। মনে রাখতে হবে, ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার (জেহাদ) একটা পর্যায়ে যুদ্ধও (কেতাল) করতে হয়। এ কথাটি অন্য যে কোনো জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের যুদ্ধনীতির এই মূল সত্যটি যারা উপলব্ধি করবেন তারা এও বুঝবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষ মানুষ বেশি নিহত হয়, ফলে উভয়পক্ষেরই অনেক নারী বিধবা হয়, সন্তানেরা পিতৃহীন হয়। এমন একটি পরিস্থিতিতে ঐ **অভিভাবকহীন নারীদের পুনর্বাসনের জন্য ইসলাম পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।** সংশ্লিষ্ট আয়াতের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার। আল্লাহ্ বলেছেন, 'যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে সেসব নারী থেকে বিয়ে কর যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে- দুই, তিন অথবা চারজন পর্যন্ত। তবে যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজনই যথেষ্ট।' (সুরা নিসা ৪:৩)। সুতরাং এই বিধানের উদ্দেশ্য পুরুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা নয়, বরং সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করা, নারীদেরকে পারিবারিক নিরাপত্তা প্রদান করা। কেননা এই আয়াতে স্পষ্টতই অভিভাবকহীন নারীদেরকে বিয়ে করে পরিবারভিত্তিক সমাজকাঠামো রক্ষার জন্য পুরুষদেরকে তাদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করতে না পারলে একটি বিয়ে করারই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখানে ন্যায়বিচারের অর্থ হলো স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা, তাদের জীবনমান ও ভরণপোষণের মৌলিক ব্যাপারগুলো সমভাবে নিশ্চিত করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই স্ত্রী রাখে এবং তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের একপাশ কাত হয়ে থাকবে।' (আবু হোরায়রা রা. থেকে সহিহ মুসলিম-২৭৭০, তিরমিজি শরিফ-১১৪১)। অপর এক হাদিসে আছে যে তার গালে গোশত থাকবে না। এখানে

স্পষ্টত মনে রাখতে হবে, যার যত খুশি বিয়ে করার লাইসেন্স ইসলামে দেওয়া হয়নি বরং এক্ষেত্রে কঠোর শর্ত ও নীতিমালা মেনে একাধিক বিয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এরপরও রয়েছে বিচারক (কাজী) বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতা। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের ক্ষেত্রে শারীরিক, আর্থিক এবং মানসিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (আইয়্যিম), তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং যারা বিবাহে সক্ষম নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করেন' (সুরা নুর ২৪:৩২-৩৩)। অন্যদিকে, নারীদের একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর প্রধান কারণ হলো, একাধিক স্বামী থাকলে সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া একাধিক স্বামীর ভিন্ন ভিন্ন আদেশ পালনেও সমস্যা হতে পারে। যদি নারীদের একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেওয়া হতো, তাহলে পারিবারিক দায়িত্ববণ্টন ও দায়িত্ব পালন জটিল হয়ে যেত, যার ফলে শিশুদের সঠিক পরিচর্যা, শিক্ষা এবং পারিবারিক সুরক্ষা হুমকির মুখে পড়ত। একটি স্থিতিশীল পারিবারিক কাঠামো শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর এই বিধানের পেছনে আরো বেশকিছু সামাজিক এবং মানবিক উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে স্বামীকে আরেকটি বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে সাংসারিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় এবং অবৈধ সম্পর্কের পথ বন্ধ থাকে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের প্রতিটি বিধান সমগ্র বিশ্বের মানবতার কল্যাণার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষের সম্মান ও জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

০৭. **নারী সাক্ষী:** ইসলামের বিরুদ্ধে পুরুষ ও নারীর বৈষম্য সংক্রান্ত যে অভিযোগ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হল নারীদের সাক্ষী হিসেবে পুরুষদের অর্ধেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সুরা বাকারা ২:২৮২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি একজন পুরুষ উপস্থিত না থাকে, তাহলে দুজন নারী সাক্ষী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, 'যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে মনে করিয়ে দিতে পারে'। এটি তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই প্রযোজ্য ছিল, যখন নারীরা সাধারণত আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন না এবং তাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল। তাই তাদের একজন ভুলে গেলে আরেকজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন। এখনকার সমাজে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন এবং সমাজের বিভিন্ন

ক্ষেত্রেও সক্রিয় হচ্ছেন, তারপরও অধিকাংশ নারীর প্রধান দায়িত্ব আজও ঘরকন্না এবং সন্তান পালন। তাদের অনেকের ক্ষেত্রে এখনও এই বিধান প্রয়োগযোগ্য। তবে দুইজন নারী সাক্ষী রাখার নিয়ম কিন্তু সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; এটি কেবল নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেমন অর্থনৈতিক চুক্তি, ঋণ সংক্রান্ত বিষয়, বা অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামি আদালত পরিস্থিতি অনুসারে সাক্ষীর সংখ্যা কমাতে বা বাড়াতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, বিয়ে, হত্যা বা অন্যান্য অপরাধে সাক্ষীর নিয়ম ভিন্ন। ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্সে (ফিকহ) এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাযহাব বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করে।

এমন আরো বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা নিয়ে ইসলামের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানারকম মত রয়েছে। প্রকৃত সত্য হল, ইসলামের নারী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রচুর বাড়াবাড়ি হয়েছে যে বাড়াবাড়ি করাকে, বিধানের অতিবিশ্লেষণ করে কাঠিন্য (তাশাদ্দুদ) আরোপ করাকে আল্লাহ হারাম করেছেন (সুরা মায়েদা ৫:৭৭, সুরা নিসা ৪:১৭১)। আর রসুল বলেছেন 'তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি (গুলু ফিদ্-দীন) করা থেকে সাবধান থাকো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস করা হয়েছে।' (সুনান ইবনে মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ ও সুনান আন-নাসায়ী)। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, নারী ও পুরুষ একে অপরের সহযোগী, বন্ধু হিসাবে (সুরা তওবা ৯:৭১) সকল অঙ্গনে কাজ করবে, নারী বলে কাউকে কোনো ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হবে না। এটাই আল্লাহর দেওয়া নীতি। তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মো'মেনকে ভালোকাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিহত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন (সুরা ইমরান ৩:১১০)। তাই কোনো অজুহাতে নারীদেরকে স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার কারো নেই। তাই আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক নজরে নারীনীতি হবে নিম্নরূপ:

০১. **নারীর অবস্থান:** সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে নারী শালীনতার সঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করার অবারিত সুযোগ পাবে। রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়া নারীদের সৃজনশীলতা, কর্মক্ষমতা, নেতৃত্ব গুণ, সাহসিকতা, জ্ঞান ও যোগ্যতার বিকাশ সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। কোনো ফতোয়া বা সামাজিক বিধিনিষেধ দিয়ে কেউ নারীদেরকে পশ্চাৎপদ বা গৃহবন্দী করে রাখতে পারবে না।

০২. **নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা:** নারীরা পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার ভোগ করবে এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পোশাক পরিধান, চলাফেরা সহ সব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখবে। তারা পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে এবং কোনো

ধরনের লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হবে না। সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

০৩. **পোশাক নির্বাচন:** ইসলামে মো'মেন নারীদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা এমন পোশাক পরবে যাতে তাদের শরীরের সাধারণ প্রকাশমান অংশসমূহ যথা মুখ, হাত এবং পা ছাড়া বাকি শরীর আবৃত থাকে এবং যেন তাদেরকে চেনা যায়। অপরদিকে, যারা মো'মেন নয় তাদেরকেও জনসম্মুখে শালীন পোশাক পরিধান করতে হবে, অশ্লীল পোশাক পরিহার করতে হবে। নারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরতে পারবে, তবে পোশাক নির্বাচনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

০৪. **ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নারী:** নবী করিম (সা.) এবং সাহাবিদের সময়ে নারীরা সমাজ, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তারা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন, জুমা ও ঈদের নামাজে অংশ নিয়েছেন, যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন এবং সাহসিকতার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও নারীরা এসব অঙ্গনে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

০৫. **পর্দার নামে বাড়াবাড়ি:** বর্তমানে পর্দার বিধানের অতিব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করে নারীকে কার্যত গৃহবন্দী করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে পর্দার উদ্দেশ্য হল নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাকে নিষ্প্রাণ ও গৃহবন্দী করা নয়। সুতরাং, পর্দার বিষয়ে আল্লাহ যা বলেছেন তার বেশি করার ফতোয়া কেউ দিতে পারবে না।

০৬. **নারী নেতৃত্বের ভূমিকা:** ইসলাম নারী নেতৃত্বের বিরোধী নয়। ইতিহাসে বহু মুসলিম নারী তাদের সহজাত নেতৃত্বের গুণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের উপরও নেতৃত্ব করেছেন। তবে পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাংসারিক ক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতাবলে নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ণ অধিকারী। তবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইমামের পদটি কেবল পুরুষদের জন্য নির্ধারিত।

০৭. **বিয়ের বয়স এবং বহুবিবাহ:** ইসলামে বিয়ের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া এবং পূর্ণাঙ্গ মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। তাই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে কোনো নারী বিবাহে সম্মতি দিতে পারবে না। বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবারের সম্মতিতে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। পুরুষদের জন্য শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি রয়েছে, তবে নারীদের একত্রে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান
(Manpower and Employment)

শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোর করে তাদের থেকে শ্রম আদায় করা তথা দাসত্বপ্রথার ইতিহাস মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অন্যায়। এই নির্যাতিত শ্রমজীবী মানুষগুলো তখনই মুক্তি পেয়েছে যখন আল্লাহর কোনো নবী-রসুলের দ্বারা ঐ সমাজে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। অতীতকালে শ্রমদানে বাধ্য এই শ্রমিকদেরকে বলা হতো দাস, গোলাম। এখন দাসের বদলে শ্রমিক, কর্মী এবং এমন আরও সুন্দর সুন্দর সুশীল শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুন্দর শব্দের অন্তরালে এখনও সেই ক্রীতদাসের বেদনার্ত অভিব্যক্তিই দেখা যায়। এমনকি বর্তমানের অবস্থা আরও ভয়াবহ, কারণ **দাসপ্রথায় মনিব ক্রীতদাসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করত আর বর্তমানে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিক ভাড়া করে তার শ্রম ক্রয় করা হয়, কিন্তু আর কোনো দায় দায়িত্বই নেওয়া হয় না**। দাসত্বব্যবস্থা যদিও কাগজে কলমে নেই, তবু মানুষের আচার আচরণ জাহেলি যুগের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ গৃহকর্মী প্রতিদিন নির্দয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু সকল নবী-রসুল এই নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আল্লাহ বলেছেন 'আর আমি চেয়েছি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে।' (সুরা কাসাস ২৮:৫)। তাই আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাই হচ্ছে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও মর্যাদালাভের একমাত্র পথ। আল্লাহর রসুল কোরায়েশদের আভিজাত্যকে পদদলিত করে ক্রীতদাস বেলালকে কাবার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে মানবতার বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, মো'মেনের সম্মান কাবার ঊর্ধ্বে। (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে তাবারানি)। শ্রমিকদের ব্যাপারে রসুলাল্লাহর (সা.) হুকুম হচ্ছে:

» শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও (ইবনে মাজাহ ২৪৪৩)।

» আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হবো, যে একজন শ্রমিক নিয়োগ করল এবং তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও তার পারিশ্রমিক দিল না।' (বুখারি ২২৭০)।

» তোমাদের ভৃত্য তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের অধীন হয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিত, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় না করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০৫০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৬১)। এ হাদিসে ভৃত্য বোঝাতে 'মামলুক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে অপর কোনো ব্যক্তির অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

এগুলো রসুলাল্লাহর কেবল উপদেশবাণী নয়, এটা ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম, নির্দেশ যা উম্মাহ কীভাবে বাস্তবায়ন করেছে তা ইতিহাস। পৃথিবীতে সকল মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কখনও এক রকম হয় না এবং এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ কোর'আনে বলেছেন, 'আমি কিছু মানুষের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় ঊর্ধ্বে রেখেছি যাতে তারা একে অপরের কাছ থেকে শ্রম ও সেবা গ্রহণ করে।' (সুরা যুখরুফ ৪৩:৩২)। তার মানে এটা নয় যে, যারা সেবা প্রদান করবে তারা বৈষম্যের শিকার হবে। বরং, তারা মানুষ হিসাবে সমান মর্যাদার হকদার। আল্লাহর রসুল (সা.) দাসত্বব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি যায়েদ বিন হারিসাকে (রা.) আযাদ করে তাঁকে নিজের পুত্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর সাহাবিদের বলেছিলেন, **'তোমরা তাদের দাস বলো না, বরং আমার ছেলে অথবা আমার মেয়ে বলে সম্বোধন করো।'** (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৭৯)।

রসুলাল্লাহর শিক্ষা তাঁর উম্মাহর উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, দাসত্ব প্রথা সেই সামজে পুরোদমে চালু থাকলেও মুসলিমরা দাসদেরকে তাদের ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং তাদের সঙ্গে ভাইয়ের মতই আচরণ করতে আরম্ভ করতে থাকেন। তারা এক সঙ্গে বসে খাবার খেতেন, একই মানের জীবনযাপন করতেন। প্রত্যেক মুসলিম তাই তার অধীনস্থ ব্যক্তিকে নিজের ভাই জ্ঞান করতেন। রসুলাল্লাহর একজন একনিষ্ঠ সাহাবা হুজায়ফা ইবনে উতবা (রা.) তাঁর কৃতদাস সালিমকে (রা.) মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। একই পাত্রে তাঁরা খাবার গ্রহণ করতেন, একইসাথে সালাত আদায় করেছেন আর একই সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। কোনো ভেদাভেদ ছিল না তাঁদের মাঝে। উমর (রা.) নিজে যেরুযালেম যাওয়ার সময় অর্ধেক পথ নিজে উটে আরোহণ

করেছেন, বাকি অর্ধেক পথ নিজের দাসকে উটে আরোহণ করিয়ে নিজে উটের রশি টেনে নিয়ে গেছেন। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে খলিফার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রয়োজন পড়েনি। এমন একটি অবস্থা কি আজ কল্পনা করা যায়? সেই সমাজ দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্যদীন।

আমাদের এই সময়ে শ্রমিক ও মালিকদের জীবনমানের মধ্যে যে বৈষম্য, তা ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগকেও হার মানায়। মালিকরা শ্রমিকদের ঘাম শুকানোর আগেই মজুরি দেওয়া দূরে থাক, মাসের পর মাস তাদেরকে অর্ধেক বেতনে, কখনও বিনা বেতনে শ্রম দিতে বাধ্য করে। মৌলিক চাহিদা মেটানোর ন্যূনতম অর্থও হাতে না থাকায় শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তারা ট্রেড ইউনিয়ন করেন, শ্রমিক আন্দোলন করেন। দুনিয়ার মজদুর এক হও এই শ্লোগান দিয়ে, শ্রমিকদের স্বর্গ (Workers' paradise) প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে বিশ্বের বহু দেশে মার্কসবাদের চর্চা করা হয়েছে। কিন্তু এসব করে তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন আসে নি। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও শ্রমিকদের অবস্থা দিনকেদিন আরো খারাপ হয়েছে। এর কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি শোষণের অর্থনীতি। এই অর্থনীতি পুঁজিপতি তৈরি করে; তারা মানুষকে শোষণ করে, বঞ্চিত করেই তারা ধনকুবেরে পরিণত হয়। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ৪ জন শ্রমিক নিহত হন। এই ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের সংগ্রাম ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীকী হয়ে ওঠে এবং প্রতিবছর ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত আরো হাজার হাজার শ্রমিকের নির্দয় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি এবং হবেও না; কারণ জীবনব্যবস্থা ভুল। আজও নিজেদের ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করার জন্য তাদেরকে সড়ক অবরোধ, আন্দোলন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতে হয়। শ্রমিকদের এসব আন্দোলনকে মোকাবেলা করতে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ, এমনকি গুলি পর্যন্ত করে। পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। কাজেই আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই পারে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে।

শ্রমিকদের বঞ্চিত করে মালিকরাও যে খুব সুখে আছে তেমন কিন্তু নয়। এটা সত্য যে তারা তাদের পরিবার নিয়ে সীমাহীন ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেন। কিন্তু সুখ, শান্তি (Peace and happiness) আর ভোগবিলাস, আরাম আয়েশ (Comfort and enjoyment) কখনও এক জিনিস নয়। সুখ হচ্ছে মানুষের দুঃশ্চিন্তাহীন, আতঙ্কহীন, হতাশাহীন একটি অবস্থা। মালিকপক্ষের যে কাউকে

জিজ্ঞেস করে দেখুন তারাও শ্রমিকদের চেয়ে খুব একটা সুখে নেই। কারণ ব্যাংকের ঋণ, চাঁদাবাজি, আমদানি-রফতানির সীমাহীন জটিলতা, সরকারি কর্মকর্তাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘুষ দিয়ে খুশি রাখা, শ্রমিক বিক্ষোভ, বাজারদরের অনিয়ন্ত্রিত উত্থান-পতন বহুকিছু নিয়ে তারা মারাত্মক অসুখী জীবনযাপন করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমানের সিস্টেমগুলো কাউকেই সুখী করতে পারছে না, মালিককেও না, শ্রমিককেও না। তাই এই ক্ষতিকর সিস্টেমকে এখনই বর্জন করা সময়ের দাবি।

আমাদের প্রস্তাবিত তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শ্রমিকদের প্রতি জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম আদায়ের সব পথ বন্ধ করবে। প্রতিটি শ্রমিক তার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক পাবেন, যা তার কর্মস্পৃহা ও কর্মসন্তুষ্টি (Job Satisfaction) নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যাতে তারা একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। মালিকদের নিয়োজিত পুলিশের গুলি খেয়ে আর কোনো শ্রমিককে প্রাণ হারাতে হবে না। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করা হবে সেগুলো হচ্ছে:

০১. **ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা:** শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেশের সকল শ্রমিককে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শ্রমিকরা তাদের সুবিধা বা অসুবিধা সম্পর্কে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে পারবেন। আমাদের প্রস্তাবিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'শ্রমিক হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি নিয়োগকর্তার নির্দেশনায় শারীরিক বা মানসিক শ্রম প্রদান করেন এবং যার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম আইন ও বিধিমালা দ্বারা অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।'

০২. **শ্রমিকদের পারিবারিক সহায়তা:** শ্রমিকের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এতে তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বেড়ে যাবে এবং শ্রমিকের উপর অতিরিক্ত চাপ কমবে।

০৩. **গৃহকর্মীদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা:** ইসলামের শ্রমব্যবস্থার অধীনে গৃহকর্মীরাও পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা (Liberty, right and dignity) পাবে। তাদের উপর কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার সুযোগ থাকবে না। এমন ঘটনা ঘটলে নির্যাতনকারী বিচারের আওতায় আসবে।

০৪. **মজুরি ও পারিশ্রমিকের স্বচ্ছতা:** শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। মজুরি নির্ধারণের সময় বৈষম্য পরিহার করতে হবে এবং একই ধরনের কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করতে হবে। মজুরি সময়মতো দেওয়া এবং কোনো ধরনের মজুরি কমানো যাবে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে বেতন-ভাতার

যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সেটা কমিয়ে আনা হবে। শ্রমিকের বেতন কাঠামো এমন হতে হবে যেন তারা স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে।

০৫. **শ্রমিকদের কর্মের নিরাপত্তা:** কর্মস্থলে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, যেখানে তাদের মধ্যে সবসময় চাকরিচ্যুত হওয়ার আতঙ্ক থাকবে না। ঊর্ধ্বতনের দুর্ব্যবহার, মালিকপক্ষের শোষণ ও অত্যাচার প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

০৬. **নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা:** নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা, সমান সুযোগ এবং একই শ্রমের সমান বেতন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে গৃহকর্মী এবং অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে শোষণ, যৌন হয়রানি বা বৈষম্য রোধে কঠোর আইন এবং পলিসি গঠন করা হবে। গৃহকর্মীসহ সকল নারী শ্রমিকের সন্তান পালন ও মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

০৭. **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:** শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে করে তারা আধুনিক শিল্পের চাহিদা পূরণের উপযোগী হয়ে উঠবে এবং তাদের উপার্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

০৮. **শ্রমিকের কাজের সময়ের সীমা:** শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘণ্টা ও ছুটি নির্ধারণ করা হবে এবং অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হবে। কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য কর্মঘণ্টার মধ্যে পর্যাপ্ত বিরতি বা বিশ্রামের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

০৯. **শ্রম আদালত:** শ্রমিকদের আইনী সহায়তা প্রদান করতে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে দ্রুত শ্রমিকদের অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। কোনো শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সমাধান করা হবে।

১০. **জীবনধারণ ভাতা:** প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম জীবনধারণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। যারা উপার্জনে অক্ষম, তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদের অক্ষমতার বিষয়টি রাষ্ট্রকে অবহিত করবে। তার কথার সত্যতা যাচাই করে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। যদি প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য জীবনধারণ ভাতা, বয়স্কভাতা, বেকারভাতা ইত্যাদি বরাদ্দ করা হবে, যাতে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূর্ণ হয় এবং তারা সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনাগুলো হল:

০১. **বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুতি:** অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হবে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি কাজ, ভাষাগত দক্ষতা, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সেবা খাতে দক্ষতা, কম্পিউটার ও ডিজিটাল দক্ষতা, নির্মাণ, মেশিন পরিচালনা, কৃষি

প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রমিকদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা হবে। বিদেশে যেতে আগ্রহী শ্রমিকদের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

০২. **অভিবাসন প্রক্রিয়ার সহজীকরণ:** অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজ ও নিরাপদ করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের অযৌক্তিক হয়রানি, অতিরিক্ত চার্জ, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, ভিসা ও কাজের অনুমতির জটিলতা, মেডিকেল পরীক্ষা এবং অন্যান্য সরকারি প্রক্রিয়ায় সমস্যা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি দূর করা হবে। পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে। দক্ষ ও দরিদ্র শ্রমিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিনা খরচে বিদেশে পাঠানো ও সেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

০৩. **রেমিটেন্স প্রেরণ সুবিধা:** প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ নির্বিঘ্নে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের সাধারণত যে সমস্যাগুলো হয়, যেমন: ব্যাংক ট্রান্সফারের জটিলতা, অতিরিক্ত ব্যাংক চার্জ, আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা হবে।

০৪. **প্রবাসী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান:** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের যেকোনো সমস্যার দ্রুত সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যেমন: সামাজিক সুরক্ষা, চুক্তি লঙ্ঘন, কর্মস্থলে নির্যাতন, বেতন ও অন্যান্য সুবিধার সমস্যা, স্থানীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার জটিলতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতারণা ইত্যাদি।

০৫. **নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান:** মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করা হবে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দাসপ্রথা: একটি বিভ্রান্তির অপনোদন

(Slavery: Dispelling a Misconception)

ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামের উপর যে অপবাদগুলো আরোপ করে থাকে তার মধ্যে একটি বড় অপবাদ হচ্ছে, ইসলামে নাকি দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, এখানে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে এবং যুদ্ধবন্দিনীদের গনিমত হিসাবে যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করা যায়। এই ধারণাটি এত সর্বব্যাপী যে ইসলামের আলেমরাও এই ধারণাকেই অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন। তারা বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না কারণ ইসলাম-বিদ্বেষীরা পবিত্র কোর'আনের বেশ কিছু আয়াত তাদের বক্তব্যের পক্ষে উল্লেখ করেন এবং দেখিয়ে দেন যে, সত্যিই ইসলামে দাসপ্রথা আছে এবং 'গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত দাসীদেরকে' উপপত্নীরূপে ব্যবহার করার অনুমতিও রয়েছে। তাদের এইসব যুক্তির উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ ধর্মীয় পণ্ডিতরা ইসলামের অবমাননায় ক্ষুণ্ন হয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেন যে, হ্যাঁ, দাসপ্রথা আছে বটে, কিন্তু তাদেরকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলো আইয়ামে জাহেলিয়াতের চেয়ে অনেক বেশি।

আসলে কিন্তু বিষয়টি তা নয়, প্রকৃত সত্য হলো, ইসলামে জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থা বা দাস ব্যবস্থাই নেই, তাই দাসদের অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গও আসে না। অধিকার দেওয়ার কথা সেবকদের, দাসদের তো মুক্ত করেই দিতে বলা হয়েছে। আমরা এই ভুল ধারণাটি ভেঙ্গে দিয়ে এ প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরতে চাই। কোর'আনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আরবি-বাংলা অভিধান মোতাবেক সেই পরিভাষাগুলোর সঠিক অর্থগুলি এখানে দেয়া হলো।

০১. **রাকাবাত**: ক্রীতদাস, ঘাড়ে দড়ি বাঁধা (১০৪৭ পৃ: ১ম খণ্ড) সুতরাং সরল অর্থে রাকাবাত হচ্ছে ক্রীতদাস যার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। তাকে জোরপূর্ব কাজে লাগানো হয়, বা এমন ব্যবস্থা কায়েম করা হয় যে, সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে বাধ্য হয়। দাসমুক্তির প্রসঙ্গে সর্বত্র আল্লাহ 'রাকাবাত' শব্দের ব্যবহার করেছেন। (দেখুন: সুরা বাকারা ২:১৭৭, সুরা মুজাদালা ৫৮:৩, সুরা বালাদ ৯০:১৩, ১৪, সুরা নেসা ৪:৯২, সুরা মায়েদা ৫:৮৯)

০২. **মালাকাত আয়মান**: মালাকাত অর্থ মানুষের ভিতরগত গুণ বা যোগ্যতা, প্রতিভা, আমি তার পূর্ণ মালিক (৮৪২ পৃ: ২য় খণ্ড), আর আয়মান অর্থ: ডানদিক,

সৌভাগ্য, শক্তি, সামর্থ্য (১১০১ পৃ: ২য় খণ্ড)। সুতরাং মালাকাত আয়মান অর্থ যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের ভিতরকার গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা সবকিছু সহকারে সামর্থ্যবানের অধিকারভুক্ত হয়। অনুবাদকরা কেউ কেউ একে অনুবাদ করেছেন, 'তোমাদের ডান হস্ত যাদেরকে অধিকার করিয়াছে'। এই অনুবাদ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকারের ধারণাটি এতে অনুপস্থিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ সুরা নিসা ৪:৩৬-এর প্রচলিত অনুবাদ এভাবে করা হয়, 'তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।' আল্লাহ এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার করেছেন 'মালাকাত আয়মান' যার অর্থ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মন প্রাণ মো'মেনের সেবায় সমর্পিত করেছেন। এই ব্যক্তি আর ক্রীতদাস কি এক তাৎপর্য বহন করে? মালাকাত আয়মান তার এই সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন।

০৩. **আব্দ:** দাস, ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক, বান্দা, চাকর, দাসত্বে নিষ্ঠাবান দাস, যার পিতামাতাও দাস, বংশগত চাকর, নির্ভেজাল চাকর। এই শব্দটি আল্লাহ মানুষের ক্ষেত্রে বহুবার ব্যবহার করেছেন।

আমাতু: দাসী, বাঁদি, পরিচারিকা। আল্লাহ বলেন, 'মোশরেক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে কোরো না। মোশরেক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মো'মেন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মোশরেক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, মোশরেক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ করলেও, মো'মেন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম (সুরা বাকারা ২:২২১)। এ আয়াতে আল্লাহ 'আমাতু মো'মেনাতুন', 'আবদে মো'মেন' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ মো'মেন কৃতদাসী এবং মো'মেন কৃতদাস। অনেক সাহাবি তখনও রসুলাল্লাহর প্রতি ঈমান এনে মো'মেন মো'মেনা হয়েছিলেন কিন্তু কাফেরদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হন নি। এই সব বন্দীদের সম্মান ও মর্যাদা মোশরেকদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। এমন কি মো'মেনদের সমাজেও যারা পরিচারক-পরিচারিকা বা সেবকের কাজ করে থাকে মোশরেক বিয়ে করা থেকে তাদেরকে বিয়ে করা উত্তম। উপরন্তু, এ আয়াতে আল্লাহ উক্ত পরিচারিকাদেরকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, উপপত্নি হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন নি। বিস্ময়কর বিষয় হলো, কোর'আনের অনুবাদকরা আল্লাহর ব্যবহৃত এই সবগুলি শব্দেরই প্রায় একই অনুবাদ করেছেন শুধুমাত্র 'দাস-দাসী'। এটা নিঃসন্দেহে ভুল অনুবাদ, কারণ সবগুলি শব্দের যদি একই অর্থ হতো, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার না করে একটি শব্দই ব্যবহার করতেন। কাজেই আমাদের প্রস্তাবিত ইসলামি রাষ্ট্রে দাসত্বের কোনো জায়গা নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেছি আমার লেখা 'জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব' পুস্তিকায়।

যুদ্ধবন্দীর অধিকার (Rights of Prisoners of War)

ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উদারতা, মানবিকতা, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদানের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা মানুষের ইতিহাসে একটি বিরল উদাহরণ। ইসলামের মূলনীতিতে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা না করার এবং তাদেরকে কোনো বন্দীশালায় অবরুদ্ধ না রেখে পারিবারিক পরিবেশে অতিথির মর্যাদায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বদর যুদ্ধে পরাজিত কোরায়েশদের মধ্যে যারা বন্দী হন তাদের অনেকেই ছিলেন মক্কার প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরা তাদের এসব বন্দীদেরকে ভালো খাবার দিয়ে নিজেরা ক্ষুধায় কষ্ট করতেন। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, 'মুহাম্মদ (সা.) বন্দীদের প্রতি এত সদয় ছিলেন যে, কিছু লোক নিজেরা না খেয়ে তাদের খাওয়াতে পছন্দ করেছেন।' (সহীহ মুসলিম) কিছু বন্দী সাহাবিদের এই আচরণ দেখে অভিভূত হয়ে বলেন, 'আমি এমন সম্মান ও দয়া কোনো শত্রুপক্ষের কাছ থেকে আশা করিনি।' এই শত্রুরাই তাদেরকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু আজকে তারা মেহমান। মুসলিমদের এই মানবিক আচরণে মুগ্ধ হয়ে বহু যুদ্ধবন্দী নিজে এমনকি তার গোত্রসহ ইসলামে দাখিল হন।

সে যুগে যুদ্ধবন্দীদের দাস বানিয়ে রাখা ছিল সর্বজন স্বীকৃত প্রথা। অথচ আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে সকল যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় শত্রুদের বন্দী করা যেতে পারে, কিন্তু পরে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে, হয় সেটা মুক্তিপণ নিয়ে কিংবা বিনা শর্তে। (সুরা মোহাম্মদ ৪৭:৪)। সুতরাং যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসাবে গ্রহণ করার কোনো পদ্ধতি ইসলামে নেই। যাদের সামর্থ্য নেই তাদেরকে বিনা মুক্তিপণেও মুসলিমরা মুক্তি দিয়েছেন। বদর যুদ্ধের কিছু বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বন্দীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিলেন তাদেরকে মদিনার কিছু বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়। (সহীহ বুখারি, হাদিস ৪০৬০)।

মক্কা বিজয়ের পর, যখন মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করেন এবং শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করে, মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘোষণা করেন, 'আজ তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশোধ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা

করেছেন।' এটি এমন এক নজির যা ইসলামের ইতিহাসেই সম্ভব। এই ঘটনার সাড়ে পাঁচশ বছর পর সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম বিজয়ের পর সব সৈন্য ও অধিবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

অথচ বর্তমান উন্নত বিশ্বের কিছু দেশ, যারা নিজেদের মানবাধিকার ও মানবতার রক্ষক হিসেবে দাবি করে, তারা দুনিয়াজুড়ে এমন বন্দীশিবির স্থাপন করেছে, যেখানে বন্দীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে মার্কিন সরকারের গুয়ানতানামো বে (কিউবা) এবং আবু গারিব (ইরাক) কারাগার। এসব বন্দীশিবিরে বিশেষ করে ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধবন্দীদের অবর্ণনীয় শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। তাদেরকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা, ক্ষুধার্ত রাখা, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, পিটিয়ে আহত করা, চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতন চালানো এবং এমনকি ধর্ষণের শিকার করানোর মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। এসব নির্যাতনের ফলে বহু বন্দী মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে এবং অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়াও, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়াসহ কিছু বিভিন্ন পরাশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে তাদের বন্দীশিবিরগুলিতে অত্যাচার এবং দমনমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও তাদের দেশের সংবিধানেরও বিপরীত।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জেনেভা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত, যুদ্ধবন্দী এবং রোগাক্রান্ত সৈন্যদের নিরাপত্তা এবং শারীরিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা। জেনেভা কনভেনশনের ধারা-৩-এ বলা হয়েছে, 'যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। তার জীবনের প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করা যাবে না। শারীরিক নির্যাতন, অমানবিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নির্যাতন, জিম্মি করে রাখা, ব্যক্তি মর্যাদার প্রতি অমানবিক আচরণ, বিচারবহির্ভূত শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।' কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রথম কনভেনশন গৃহীত হওয়ার পর থেকে, কোনও পক্ষই এই নীতি পুরোপুরি পালন করেনি এবং বহু জায়গায় কনভেনশন লঙ্ঘিত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ এবং ইরাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দীদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়া, বসনিয়া যুদ্ধের সময় মুসলিম বন্দীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং কঙ্গো যুদ্ধে আফ্রিকার জনগণও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বসনিয়ায় দুই লক্ষ বন্দী মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে দশ মাস আটকে রাখা হয়েছিল যেন তারা বাধ্য হয় সার্ব খ্রিষ্টানদের সন্তান জন্ম দিতে। এমনকি বাংলাদেশের মত দেশগুলোতেও যুদ্ধ নয়, শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের

কর্মীদেরকে যেভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হয় তা ইসলামের বন্দীনীতিতে কল্পনাও করা যায় না। যুদ্ধের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশিত নীতি মো'মেনরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাঁরা বন্দীদের সাথে নজিরবিহীন মানবিক আচরণ করেছেন যার জন্য কোনো কনভেনশনের প্রয়োজন হয়নি। এখানেই আল্লাহর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য।

গত একশো বছরে বিশ্বের সবচেয়ে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রটি বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার রক্ষা, বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নাম করে অন্তত ১৭টি যুদ্ধে ও বহুসংখ্যক ছায়াযুদ্ধে জড়িয়েছে যার মধ্যে ভিয়েতনাম, পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তানের যুদ্ধ, বসনিয়া, কসোভোর যুদ্ধগুলোতে তারা লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোক হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯৪৫ সালে জার্মানির পরাজয়ের পর, সোভিয়েত, আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং ফরাসি যৌথবাহিনী কর্তৃক বিপুলসংখ্যক জার্মান নারী যৌন সহিংসতা ও ধর্ষণের শিকার হয়। বিশেষ করে সোভিয়েত বাহিনীর সহিংসতা ছিল ভয়াবহ। গবেষকদের মতে, এই ঘটনাটি ছিল মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং মানব ইতিহাসের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। কিন্তু **এসব বিধবা ও নির্যাতিত নারীদেরকে কোনো শত্রুবাহিনীর সৈন্য নিজের পরিবারে জায়গা দিয়েছে এমন একটি রেকর্ড কেউ দেখাতে পারবেন না।** আন্তর্জাতিক অনেক গণমাধ্যমে আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকের নারীদের উপরে বহু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে যুদ্ধে পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্যদের মৃত্যুর পর নারীরা দারিদ্র্যের কারণে সামান্য চালের বিনিময়ে সন্তানদের বিক্রি করে দিচ্ছে, বেঁচে থাকার জন্য অবস্থাপন্ন পরিবারের নারীরাও ভিক্ষা ও দেহব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছে। মার্কিন সৈন্যরা তাদের কারো দায়িত্ব নেয়নি।

কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে কতখানি মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে যে, বিজিত রাষ্ট্রের নারীদেরকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে তাদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নিজেদের পরিবারের সাথে একাত্ম করে নিয়েছে, তাদের দায়িত্ব নিয়েছে। আর **শত্রুপক্ষের নারীদের ধর্ষণ করার কোনো নজির উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাসে নেই।** কারণ যৌন সহিংসতা বা ধর্ষণ ইসলামের মৌলিক নীতিমালার একেবারে পরিপন্থী। আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, 'মুসলিমদের জন্য নারীদের ক্ষতি করা বা তাদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ।' (সহীহ মুসলিম, ১৭৪৪)। বরং মুসলমানদের দায়িত্ব ছিল বেসামরিক নারী ও শিশুদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা। একটা বিষয় বুঝতে হবে, তখন সমাজব্যবস্থা ছিল গোত্রভিত্তিক, কাজেই নারীদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ সেভাবে ছিল না। নারীদের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক সুরক্ষা দিত তার পরিবার। যুদ্ধে উভয়পক্ষের নারীরা বিধবা হয়েছে, ভাই ও পিতৃহারা হয়েছে অর্থাৎ পরিবার হারিয়েছে। তখন এই অসহায় নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য মুসলিম সৈন্যরা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিবারভুক্ত করেছে। এর চেয়ে উত্তম সমাধান যদি কেউ দেখাতে পারেন তাহলে তা দেখানো হোক। কিন্তু আমরা বলতে পারি, ইসলামের চেয়ে উত্তম সমাধান কেউ দেখাতে পারবে না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীদের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে, কাজেই বর্তমানে একই নীতি কার্যকর করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

আমরা যে জীবনব্যবস্থা প্রস্তাব করছি তা আল্লাহর দেওয়া। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে সেনাবাহিনীতে, যুদ্ধনীতিতে, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে এটা অমোঘ সত্য; যার প্রমাণ ইতিহাস।

◇◇

ইসলামকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টায় অভিযোগ করা হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীর সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা। এ অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ হল এই যে, যে বিরাট এলাকায় এই শেষ জীবন ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে এলাকা তারা একচ্ছত্রভাবে শাসন করেছেন বহু শতাব্দী ধরে। জোর করে ধর্মান্তরিত করলে মরক্কো থেকে বোর্নিও পর্যন্ত এই ভূভাগে আজ ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকতো না।

এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

◇◇

গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা
(Press and Freedom of Speech)

আল্লাহ্ পবিত্র কোর'আনে যেসব নীতিমালা দিয়েছেন সেগুলোই গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন: যে কোনো তথ্য প্রচারের আগে সেটা যাচাই করা (সুরা হুজরাত ৪৯:৬), সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ না করা (সুরা বাকারা ২:৪২), কারো বিরুদ্ধে মানহানিকর ও উপহাসমূলক উক্তি না করা (সুরা হুজরাত ৪৯:১১), পরনিন্দা না করা (সুরা হুজরাত ৪৯:১২), কারো উপর মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া (সুরা তোয়াহা ২০:৫৫), অনুমান প্রসূত কথা না বলা (সুরা হুজরাত ৪৯:১২), অন্যের ত্রুটি সন্ধানের জন্য গোয়েন্দাগিরি না করা (সুরা হুজরাত ৪৯:১২), ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা না বলা, পাশ কাটিয়ে না যাওয়া (সুরা নিসা ৪:১৩৫)।

এগুলোই একাধারে জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বুনিয়াদি নীতি। লক্ষ করলে দেখা যায়, এ নীতিগুলো দেশ কাল পাত্র নির্বিশেষে চিরন্তন শাশ্বত বিধানরূপে পরিগণিত হওয়ার উপযোগী। আল্লাহ্ পবিত্র কোর'আনে কথাবার্তার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো মেনে চলতে আদেশ দিয়েছেন এবং এগুলোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির ঘোষণাও দিয়েছেন। যেমন তিনি গুজব রটনাকারীর জন্য যে শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক। বর্তমানে কিছু কিছু গণমাধ্যম গুজব রটনা করে গোলযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ্ বলেছেন, মোনাফেকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব, এরপর তারা এ নগরীতে অল্প দিনই তোমার প্রতিবেশীরূপে থাকবে। অভিশপ্ত (লানতপ্রাপ্ত) অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি (সুন্নাত)। আপনি আল্লাহর রীতিতে (সুন্নাতে) কখনও পরিবর্তন পাবেন না (সুরা আহযাব: ৩৩:৬০-৬২)।

সুতরাং কেউ আল্লাহর ঘোষিত নীতিমালা লংঘন করলে জাতির ইমাম অথবা বিচার বিভাগ আল্লাহর বিধান অনুসারে এবং পরিস্থিতির আলোকে ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যার যা করার অবাধ স্বাধীনতা

ইসলাম দেয় না। কারণ তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং নিশ্চিতরূপে তা জনশৃঙ্খলা নষ্টের কারণ হবে। জাহেলি যুগে আরবের কবিরা মূলত কবিতার মাধ্যমে আজকের গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করতেন, কারণ তাদের কবিতা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত এবং ব্যাপক প্রভাব ফেলত। এসব কবিরা ইসলামের শত্রুদের প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হতো, যেমন মহানবী (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো, অপপ্রচার চালানো এবং জনগণকে উস্কানি দেয়া। আহযাবের যুদ্ধের আগে, কিছু কবি মদিনা থেকে মক্কা ও অন্যান্য গোত্রের কাছে গিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য উস্কানি দিয়েছিল, যা ছিল মদিনা সনদের লঙ্ঘন। এসব রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.) কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পবিত্র কোর'আনে সন্ত্রাসবাদ, দাঙ্গা, লুটতরাজ, তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, সামাজিক অরাজকতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, গণহিংস্রতা (Mob Lynching), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি প্রদান সবকিছুকে 'ফাসাদ ফিল আরদ'- এর আওতাভুক্ত করে এর বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলেতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সুরা মায়েদা ৫:৩৩)। বর্তমান সময়ে এই আয়াতটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেয়, গুপ্তচরবৃত্তি করে, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে এবং চরমপন্থী কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা করে। যারা গুজব রটিয়ে, সামাজিক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে **মব** সৃষ্টি করে মানুষের জীবন ও সম্পদের হানি করে তারাও এ আয়াতের আওতাভুক্ত।

মানুষকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি ও ভাষা দিয়েছেন, তাকে সৃজনশীলতা দিয়েছেন। এগুলোর ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করার স্বাধীনতা সে জন্মগতভাবে লাভ করেছে। এই স্বাধীনতা ও অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না, করলে সেটা হবে স্বৈরাচারিতা। এই স্বাধীনতা ব্যবহার করে সে সকল জুলুম, অবিচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার জন্মসূত্রে লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার করা, যা খুশি তা বলা, অন্যের মানহানি করা, মিথ্যা প্রচারণা করা, গুজব ও হুজুগ সৃষ্টি করা, অসঙ্গত বিরোধিতা করা, সত্য মিথ্যা মিশ্রিত আজগুবি সংবাদ, তথ্য প্রমাণ দলিল ছাড়া সংবাদ প্রচার করা, অন্যকে ব্লাকমেইল বা মানহানি করার উদ্দেশ্যে সংবাদ পরিবেশন করা ইত্যাদি

কোনোভাবেই বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়বে না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে গণমাধ্যম এতটা স্বাধীনতা পাবে যাকে বলে অবাধ স্বাধীনতা। কেবল আল্লাহর দেওয়া উপর্যুক্ত নীতিমালা তাকে মানতে হবে যার মূল কথা একটাই- কেউ কোনো মিথ্যা তথ্য প্রচার করতে পারবে না। এক নজরে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণমাধ্যমের নীতিমালা হবে নিম্নরূপঃ

০১. **তথ্য যাচাই:** গণমাধ্যম যেকোনো তথ্য প্রচারের আগে সেটি যাচাই-বাছাই করবে। ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে এবং প্রচারকারীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ গণমাধ্যমকে দেওয়া হবে না।

০২. **মানহানি ও উপহাসমূলক তথ্য নিষিদ্ধঃ** কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপমানজনক বা উপহাসমূলক বক্তব্য বা তথ্য প্রচার নিষিদ্ধ থাকবে। গণমাধ্যমে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত পরনিন্দা এবং অযৌক্তিক বা ভিত্তিহীন সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারো ব্যক্তিগত ত্রুটি বা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা বা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ থাকবে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ, সংবাদ হবে সরল ও বস্তুনিষ্ঠ।

০৩. **গুজব রটনা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থাঃ** গণমাধ্যম গুজব ছড়াতে পারবে না। গুজব রটনার মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা বিনষ্টের প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। তথ্য-প্রমাণ ছাড়া অনুমাননির্ভর সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ থাকবে।

০৪. **গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সীমারেখাঃ** মানুষের স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার অধিকার থাকবে, তবে তা সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। সরকারি বা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ, নীতি, প্রকল্প বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো অনিয়ম হলে, দুর্নীতি হলে সে বিষয়ে গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে সংবাদ তুলে ধরতে পারবে, তার কলমকে কেউ রুখতে পারবে না। যৌক্তিকভাবে সরকারের কোনো নীতি বা কর্মকাণ্ডের সমালোচনা, পর্যালোচনা, মতামত তুলে ধরতে পারবে। সরকারের কোনো দপ্তর থেকে গণমাধ্যমের উপর কোনো চাপ থাকবে না। গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে সরকার। তবে বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে অরাজকতা বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৫. **সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষাঃ** গণমাধ্যম এমন ভূমিকা পালন করবে যা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গণমাধ্যম সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অধিকার বঞ্চিতদের পক্ষে কথা বলবে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

শাসকের সমালোচনা ও জবাবদিহিতা

(Criticism and Accountability of the Ruler)

যে কারো সমালোচনার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে তার আড়ালে কিছু না বলে তার সামনে বলা। আড়ালে সমালোচনা করা হচ্ছে গিবত আর গিবতকে আল্লাহ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য বলেছেন (সুরা হুজরাত ৪৯:১২)। গিবতের পরিচয় সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রসুলাল্লাহ বলেন, গিবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার অভিমত কী?' তিনি বলেন, তুমি তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলে তুমি তার গিবত করলে। আর যদি সেই ত্রুটি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ (তোহমত) করলে। (আবু দাউদ-৪৮৭৪; তিরমিজি-১৯৩৪) আর মো'মেনদের উপর যারা অপবাদ আরোপ করে তাদের উপর ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর অভিশাপ এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন (সুরা নুর ২৪:২৩, সুরা আহযাব ৩৩:৫৮)। তিনি বলেছেন, 'তোমরা ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছ; অথচ তা আল্লাহর কাছে খুবই গুরুতর অপরাধ (সুরা নুর ২৪:১৫)।

কিন্তু আমাদের চলমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগামহীন বিদ্বেষ প্রচার করে থাকে, অবান্তরভাবে কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে থাকে, শাসককে গদি থেকে নামানোর জন্য দেশ ধ্বংস করে দেয় আবার ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা, জুলুম, গুম, খুন কোনো কিছুই বাদ রাখে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই দলগুলো প্রয়োজনে বৈদেশিক শক্তির সাথে হাত মেলাতেও দ্বিধা করে না, এতে দেশের যত ক্ষতিই হোক। তারা হরতাল অবরোধের নামে নাশকতা ঘটিয়ে দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অবকাঠামো ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বয়ে আনে। এগুলোই হচ্ছে শাসকের বিরোধিতা ও সমালোচনার প্রচলিত পদ্ধতি।

একটি কথা প্রসঙ্গত বলে রাখি। 'শাসক' (Ruler) শব্দটি আমরা ব্যবহার করলেও এটি কিন্তু ইসলামের পরিভাষা নয়। ইসলামে যিনি জাতির সর্বোচ্চ

নেতা তাঁকে বলা হয় ইমাম অর্থাৎ নেতা। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁকে 'খলিফা' বলা হয়েছে, যার অর্থ 'প্রতিনিধি'। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা (Vicegerent)। যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুসলিম জাতিকে পরিচালনা করবেন, তিনি হলেন 'খলিফাতুল মুসলিমিন' বা মুসলিমদের প্রতিনিধি। 'প্রতিনিধি' এবং 'শাসক' এই দুটি ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একইভাবে, 'আমির উল মো'মেনিন' কথাটির অর্থ হল মো'মেনদের আদেশদাতা, যা সরাসরি শাসক বোঝায় না। প্রকৃত ইসলামের পর যখন রাজতন্ত্র চালু হয়, তখন খলিফাদেরকে 'মালিক' বা রাজা বলে ডাকা হত, যা আসলে আল্লাহরই একটি গুণবাচক নাম। বস্তুত, 'শাসক' শব্দটি আধুনিক সমাজে সাধারণত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়। তবুও, বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে 'শাসক' শব্দটি ব্যবহার করছি।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের ক্ষতিসাধন ও জনগণের মানবাধিকার লংঘন করে এমন কোনো অসভ্য কর্মসূচির সুযোগ নেই। শাসকের সমালোচনার জন্য সুশৃঙ্খল পন্থা ইসলামে রাখা হয়েছে। শাসকের দ্বারা কোনো অন্যায় হতে দেখলে সে বিষয়ে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করার অবারিত সুযোগ ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থায় থাকবে। চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন জনগণের সঙ্গে শাসকের দূরত্ব অবধারিত, ইসলামে তেমনটি নয়। শাসক প্রতি জুমায় মসজিদে প্রকাশ্যে খোতবা দিবেন এবং জুমার ইমামতি করবেন। সেখানে যে কেউ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন। এছাড়া দেশের সকল মসজিদেই ইমামের নিয়োজিত প্রতিনিধি (আমির) জুমার দিন উপস্থিত থাকবেন। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শুরা পরিষদের সদস্যরা শাসকের সামনে তার ভুল-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করতে পারবেন। যে কেউ গণমাধ্যমে তাদের মতামত অবাধে প্রকাশ করতে পারবে এবং তার আপত্তির বিষয়গুলো ইমামের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু কেউ আইনভঙ্গ করতে পারবে না, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারবে না। নেতা একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে তার থেকে বায়াত প্রত্যাহার করা যাবে না। কারণ আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ইমামের আনুগত্য থেকে হাত সরিয়ে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে, যখন তার পক্ষে কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (ইমামের প্রতি) আনুগত্যের (বায়াত) শপথ ছাড়াই মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বরঃ ১৮৫১)।

তবে রাষ্ট্রপ্রধান যদি আল্লাহর হুকুমের সুস্পষ্ট বিরোধিতায় লিপ্ত হয় তখন তাকে সতর্ক করার অধিকার যে কোনো নাগরিকের রয়েছে। আল্লাহর রসুল

বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ (সুনান নাসায়ি, হাদিস নং ৪২০৯)।

এবার ইতিহাস থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের সমালোচনার দু একটি উদাহরণ দেখি। মহানবী (সা.) যখন রাষ্ট্রপ্রধান। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে হাওয়াজিন নামক একটি বড় গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বিপুল পরিমাণ সম্পদ, গবাদি পশু গনিমত হিসাবে মুসলিমদের হস্তগত হয়। রসুলাল্লাহ সেসব সম্পদের অধিকাংশ মক্কা ও বিভিন্ন গোত্রের নওমুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতে মদিনা থেকে আসা আনসারদের মধ্যে একটি গুঞ্জন শোনা যায় যে রসুলাল্লাহ তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজনদের বেশি দিচ্ছেন, আর তিনিও এখন থেকে মক্কায় তাঁর নিজ জন্মভূমিতেই থেকে যাবেন। তাহলে আনসাররা কী পেল? মহানবীর কাছে যখন এই খবর পৌঁছল, তিনি সবাইকে একত্র করে নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, নতুন যারা মুসলিম হয়েছে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট রাখার জন্য বেশি অংশ গনিমত তাদেরকে দিয়েছি। গরু ছাগল ভেড়া দান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তারা কিছু গরু-ভেড়া নিয়ে বাড়ি ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রসুলকে নিয়ে মদিনায় ফিরবে?' রসুলাল্লাহর এই কথা শুনে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে লাগলেন (সিরাত ইবনে ইসহাক)। লক্ষ করুন, রসুলাল্লাহ কিন্তু তাদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন না বা তাদের কণ্ঠরোধ করলেন না। তিনি কেবল তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন এবং তারাও রসুলাল্লাহর কথায় সন্তুষ্ট হল। এমন ঘটনা রসুলাল্লাহর জীবনে বহুবার আমরা দেখেছি।

একইভাবে রসুলের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত উমর (রা.) যখন খলিফা হলেন তখন তাঁর মত কঠোর মেজাজী মানুষকেও জনতার সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হয়েছে। একদিন রসুলাল্লাহর প্রসিদ্ধ সাহাবি সালমান ফারসি (রা.) জুমার খোতবা দেওয়ার সময় খলিফা উমরকে (রা.) প্রশ্ন করেছিলেন, 'বায়তুল মাল থেকে মুসল্লিদেরকে যে কাপড় দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে কারোই ঠিকঠাক জামা তৈরি হয় নি। সবার জামা ছোট হয়েছে, কিন্তু আপনার জামা দেখছি বেশ বড়সড়! আপনি অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন?' উমরের (রা.) মতো ব্যক্তিকে এই প্রশ্ন শুনতে হয়েছে এবং জনগণকে নসিহত করার আগে নিজের সততা প্রমাণ করতে হয়েছে।

সুতরাং শাসকের গঠনমূলক সমালোচনা করা যাবে, তার সংশোধনের জন্য ভুল ধরিয়ে দেওয়া যাবে। ইসলামের সমাজকাঠামোর নকশা বা মডেল হচ্ছে সালাত। সালাতের যিনি ইমাম, তিনি যদি সালাতের কোনো ফরজ রোকন পালন

করতে ভুলে যান তখন মুসল্লিরা যে কেউ পেছন থেকে তাকে 'আল্লাহু আকবার' বলে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। একে বলা হয় লোকমা দেওয়া। এর উদ্দেশ্য ইমামকে পদচ্যুত করা নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া শৃঙ্খলার মধ্যে ইমামকে ফিরিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। **আজকে যারা গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে, বিক্ষোভ কর্মসূচির নামে নাশকতা ঘটাচ্ছে, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে তাদের কাছে ইসলামের নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবনপদ্ধতি দেখলে মনে হবে তাদের বাক-স্বাধীনতা বুঝি হরণ করা হচ্ছে। কারণ তারা দীর্ঘদিনের এই অসভ্য রীতি-রেওয়াজ দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।** প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই মানুষকে প্রকৃত বাক-স্বাধীনতা ও শাসকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে না। ইসলাম ছাড়া প্রতিটি শাসনব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত শাসককে স্বৈরশাসন ও বিরুদ্ধমতকে দমনপীড়নের দিকে নিয়ে যায়। কারণ সেখানে সমালোচনার নামে নাশকতা চলে আর জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকারকে নাশকতা দমন করতেই হয়। কিন্তু ইসলামের জীবনব্যবস্থায় সত্য কথা বলার কারণে কোনোদিন তাকে তিরস্কার করা হবে না, ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক কথা বলার কারণে কখনও কারো চাকুরি যাবে না, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু হবে না। এমন উন্মুক্ত ব্যবস্থা একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শাসকের সমালোচনা ও বাকস্বাধীনতার স্বরূপ হবে নিম্নরূপ:

০১. **শাসকের সমালোচনার সুযোগ:** শাসকের সমালোচনা ও অভিযোগ প্রদানের জন্য সুশৃঙ্খল ও গঠনমূলক পন্থা অনুসরণ করা হবে। এই সমালোচনা হবে ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং সামনা-সামনি। সত্য কথা বলার জন্য কাউকে তিরস্কার করা হবে না, চাকরি হারাতে হবে না, বা মিথ্যা মামলার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার বাইরে কোনো বে-আইনী বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যাবে না।

০২. **শাসক ও জনগণের সম্পর্ক:** ইসলামে শাসক ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শাসক প্রতি জুমায় মসজিদে খোতবা দিবেন এবং ইমামতি করবেন, যেখানে উপস্থিত জনগণ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন। এ সুযোগ শুধু জুমার সময়েই সীমাবদ্ধ নয়; অন্য সময়েও শাসককে প্রশ্ন করার ব্যবস্থা থাকবে।

০৩. **শুরা পরিষদের সমালোচনার অধিকার:** জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শুরা পরিষদের সদস্যরা শাসকের ভুল-ত্রুটি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন এবং শাসকের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারবেন।

০৪. **মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা:** গণমাধ্যমে যে কেউ নিজের মতামত অবাধে প্রকাশ করতে পারবে এবং তা শাসকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকবে।

০৫. **শাসকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আনুগত্য:** শাসক সকলের সমালোচনা শুনবেন এবং আল্লাহর নীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শুরা পরিষদ ও মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেটা মেনে নেওয়া জাতির প্রতিটি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। শাসকের প্রতি আনুগত্যের হাত সরিয়ে নেওয়া বা বায়াত প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ থাকবে না। নেতা একবার নির্বাচিত হলে সামরিক বাহিনীর মতো নিষ্ঠা সহকারে তার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা (Social Protection System)

'সামাজিক সুরক্ষা' এমন এক নীতি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিত করে থাকে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র মূলত দরিদ্র, বেকার, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ বা অসুস্থ নাগরিকদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেমন বৃদ্ধাশ্রম, শরণার্থী শিবির, এতিমখানা, পঙ্গুনিবাস, প্রতিবন্ধী সহায়তা কেন্দ্র, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, নারী ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বেকার পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রের সীমিত সম্পদ ও বিপুল জনসংখ্যার কারণে সামাজিক সুরক্ষার খাতে পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে। উপরন্তু, তহবিল বরাদ্দের ঘাটতি, তহবিল তসরুপ, ভুল পরিকল্পনা, স্বচ্ছতার অভাব এবং অব্যবস্থাপনার কারণে এসব কার্যক্রমের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং তা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমরা মনে করি, পশ্চিমা সভ্যতায় প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষার পদ্ধতি ও ধারণাগুলোতে একটি বড় ঘাটতি রয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলো মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করে কেবল অস্থায়ী সমাধান বা উপশমের দিকে মনোযোগ দেয়। আমাদের জীবনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলোর কারণেই অসহায় মানুষের সংখ্যা এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তবুও প্রচলিত ব্যবস্থাগুলো সমস্যার শিকড়ে না গিয়ে শুধুমাত্র এর ফলাফল নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমাদের প্রস্তাবিত তওহীদ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সমস্যার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর অন্তর্নিহিত সমাধান প্রদান করবে, যাতে একটি টেকসই ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়।

বস্তুত, সমাজের সমস্যাগুলো একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যেমন- চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই সমাজের সাধারণ সমস্যা। এর পেছনে অন্যতম কারণ কর্মসংস্থানের অভাব। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে সহজলভ্য করা। এর ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়। দক্ষ মানুষ বৈধভাবে কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এর ফলে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। ফলে কিশোর অপরাধীদের কিশোর

সংশোধনাগারে পাঠানোর বা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জেলখানায় বন্দি করার প্রয়োজন হবে না। আর সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা একে অপরের পরিপূরক। একইভাবে, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে দুর্ঘটনার পরিমাণ কমে যাবে, ফলে দুর্ঘটনায় আহত, নিহত বা পঙ্গু মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এর ফলে, হাসপাতাল ও পঙ্গু আবাসনের ওপর চাপ কমবে এবং আহতরা জীবিকার জন্য ভিক্ষায় নামতে বাধ্য হবে না। সুতরাং, আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিবে, যাতে দুর্ঘটনা হ্রাস পায় এবং সমাজে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

একইভাবে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা হলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে চাপ কমবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা দ্রব্যমূল্য হ্রাসে সহায়ক হবে। কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা গেলে, মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য সুলভে পাবে। এতে মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, সুস্থতা নিশ্চিত হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ওপর চাপ কমবে। এভাবে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ সংকটেরই টেকসই সমাধান দীর্ঘমেয়াদে হয়ে যাবে। তবে নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্ম ও উপার্জন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তারা কর্মসংস্থান হারায়। আধুনিক দেশে বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা থাকলেও তা কখনোই পরিবারের বিকল্প হতে পারে না। যারা জীবনের সবচেয়ে সোনালি সময় সন্তানদের জন্য ব্যয় করেছেন, তাদের জীবনের দুর্বলতম সময়ে অনাত্মীয় পরিবেশে একাকী জীবন কাটানোকে পুনর্বাসন বলা যায় না; এটি ঘোরতর অন্যায় ও অমানবিক কাজ। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে নিউক্লিয়ার পরিবার গঠনের ফলেই পরিবারে বাবা-মায়ের স্থান হচ্ছে না। ইসলাম যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, যেখানে সন্তানরা তাদের দাদা-দাদীর স্নেহময় সাহচর্য লাভ করে, যা তাদের শৈশব ও মনোভাব গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদি আমাদের সমাজে আবার যৌথ পরিবার প্রথা ফিরিয়ে আনা যায় এবং পারিবারিক বন্ধন, সহমর্মিতা ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করা যায়, তবে বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন হবে না। এজন্য বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষা, গণমাধ্যম ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে, যাদের কোনো আত্মীয় নেই, তাদের জন্য বয়স্কভাতা, কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় বৃদ্ধাশ্রম থাকতে পারে, যাতে তারা সম্মানজনকভাবে জীবনের মৌলিক অধিকারগুলো অর্জন করতে পারে।

এতিমরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাদের সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এবং এজন্য বহু এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রসুল (সা.) বা তাঁর সাহাবিরা জীবনে কোনো এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেননি, এটি ইতিহাস। তবে এর মানে এই নয় যে সে সমাজে এতিম ছিল না। আল্লাহর রসুল (সা.) নিজেই এতিম ছিলেন এবং তিনি সব সময় এতিমদের প্রতি গভীর দয়া ও মমতা প্রদর্শন করেছেন। উম্মতে মোহাম্মদী ছিল একটি যোদ্ধা জাতি, যেখানে যুদ্ধে শহীদ হওয়ার ফলে অনেকের সন্তান এতিম হয়ে পড়তো। তবে, এসব সন্তান কখনো অনাথ অর্থাৎ নিরাশ্রয়, অভিভাবকশূন্য (Guardianless) হতো না, কারণ সে সমাজে শক্তিশালী পরিবার ব্যবস্থা ছিল। ইসলামের যে মূল্যবোধ ও সভ্যতা, তাতে পরিবারহীন থাকার সুযোগ ছিল খুবই কম। **যদি কোনো নারী বিধবা হতো, তবে ইসলামে তার পুনরায় বিয়ে হওয়া খুবই সহজ ছিল, যাতে তার সন্তানদের অনাথ বা এতিম অবস্থায় পড়তে না হয়।** আরবের গোত্রব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি ছিল গোত্রের সদস্যদের জন্য বলা চলে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় ও রক্ষাকবচ। রসুলাল্লাহ (সা.) নিজেও এতিম ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমে দাদা এবং পরে চাচার আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছেন। আবার, চাচা আবু তালেবের দারিদ্র্যের কারণে আলী (রা.) এর ভরণপোষণের দায়িত্ব মহানবীর (সা.) উপর ন্যস্ত হয়েছিল আর আলির (রা.) বড় ভাই জাফর বিন আবু তালিবের (রা.) দায়িত্ব নিয়েছিলেন রসুলাল্লাহ (সা.) চাচা আব্বাস (রা.)। এভাবে, গোত্র ও পরিবারের বন্ধন সমাজের প্রতিটি মানুষের খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। এটি শুধু ইসলাম নয়, অন্যান্য সকল ধর্মেরও এটাই শিক্ষা।

এরপর আছে প্রতিবেশীর অধিকার। এ বিষয়ে ইসলামের যে শিক্ষা তা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা আরো দৃঢ় হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে, একজন মানুষের প্রতিবেশী কেবল তার পাশের বাড়ি নয়, বরং চারদিকের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত তার প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। আর রসুল (সা.) বলেছেন, সে মো'মেন নয়, যে ব্যক্তি পেট পুরে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায়। (বুখারি, মুসলিম)। সুতরাং সামাজিক সুরক্ষা কেবল রাষ্ট্রের নয় বরং সমাজের প্রতিটি সদস্যেরও দায়িত্ব। ইসলামী সমাজচিন্তায় এটি সুস্পষ্ট। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিবেশীর প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা একটি সুস্থ সমাজের বুনিয়াদি বিষয়।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমানে অনেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে ফেলেছে, যা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব যেমন জাতীয় নিরাপত্তা, শাসন ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আইন-প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো

পরিচালনা করার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানও রাষ্ট্রের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র জাতীয় ব্যবস্থাপনাগুলোতে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ করবে, আর সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান সমাজের সদস্যরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে করবে। এর ফলে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব সীমিত করা সম্ভব হবে এবং একটি দায়িত্বশীল সমাজকাঠামো গড়ে উঠবে। আল্লাহর দেওয়া পাঁচদফা কর্মসূচির নীতি অনুসারে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সমাজের প্রতিটা সদস্য শাসনতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক চেইন অব কমান্ডে বাঁধা থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের একজন আমির থাকবে। আমিরের তত্ত্বাবধানে মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠবে, যাদের প্রতিদিন সালাতের সময় সাক্ষাৎ হবে। একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে, আমিরও প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিবেন। কারও কোনো সমস্যা হলে আমির নিজ উদ্যোগে সমাধান করবেন, মৌলিক চাহিদা পূরণ করবেন, যদি তিনি সমাধান করতে অপারগ হন তাহলে চেইন অব কমান্ডে তার ঊর্ধ্বতন আমিরকে জানাবেন। এভাবে যে সমস্যাগুলোর সমাধান সামাজিকভাবে হওয়া সম্ভব নয় সেই সমস্যার সমাধান করবে ঊর্ধ্বতন আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া, যাকাতের অর্থ ব্যয়ের যে খাতগুলোর কথা সুরা তওবা ৯:৬০ এ উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে দরিদ্র, এতিম, পথচারী এবং অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামের সমাজব্যবস্থায় অসহায় মানুষদের দায়িত্ব মূলত সমাজের উপর থাকলেও তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসাবে রাষ্ট্রের উপরেই থাকবে। এ কারণেই খলিফা উমর (রা.) বলেছিলেন, যদি ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তার জন্য কাল হাশরের ময়দানে উমরকে জবাবদিহি করতে হবে।

খলিফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে বায়তুল মাল থেকে বিধবা, এতিম এবং দরিদ্রদের মাসিক ভাতা প্রদান শুরু হয়। একবার তিনি এক বৃদ্ধ ইহুদিকে রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখে তাকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, একজন বৃদ্ধ নাগরিককে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেওয়া রাষ্ট্রের জন্য লজ্জার। একইভাবে খলিফা আলী (রা.) শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করেন। এভাবে ইসলাম সমস্ত নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব পালন করে। আর এ ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র, ভাষা ও পেশার কোনো পার্থক্যকে বিন্দুমাত্রও স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে এই রাষ্ট্রই নাগরিকদের প্রয়োজনীয় রুজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। রাষ্ট্র যদি

এ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় কিংবা কোনো নাগরিক উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবিত তওহীদ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামাজিক সুরক্ষার টেকসই সমাধান হিসাবে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে:

০১. **শিক্ষা সুলভ করা:** শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে সহজলভ্য করা হবে, যাতে যে কোনো বয়সের মানুষ শিক্ষা ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে ও সনদ লাভ করতে পারে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

০২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে, যাতে চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অপরাধ কমে।

০৩. **নিরাপদ সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা:** সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, যাতে দুর্ঘটনার পরিমাণ কমে এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, নিহত বা পঙ্গু হওয়া মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

০৪. **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ:** পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে, যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করবে এবং স্বাস্থ্য খাতে চাপ কমাবে।

০৫. **সামাজিক পুনর্বাসন:** বৃদ্ধাশ্রমের পরিবর্তে পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী করা হবে এবং যাদের কোনো আত্মীয় নেই তাদের জন্য বয়স্কভাতা এবং কর্মসংস্থান সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এতিমদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

০৬. **প্রতিবেশীর অধিকার:** প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে, একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসার জন্য ইসলামের শিক্ষার আলোকে সকলকে অনুপ্রাণিত করা হবে এবং এর মাধ্যমে একটি নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

০৭. **রাষ্ট্রীয় সহায়তা কেন্দ্র:** জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য কিছু আশ্রয়শিবির, পঙ্গুনিবাস, মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, নারী ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ইত্যাদি থাকবে। নদীভাঙন, বন্যা, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং সহায়তার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৮. **রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অভিভাবকত্ব:** রাষ্ট্র অসহায় মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে এবং যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র, এতিম, ভবঘুরে, পথচারীসহ সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য প্রদান করবে।

০৯. **তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার:** তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও আল্লাহর বান্দা এবং অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মতো তাদেরও সমান মানবাধিকার রয়েছে। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা তাদের পরিবারে সদস্য হিসেবে বাস করবে এবং রাষ্ট্রের সকল

কর্মকাণ্ডে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যরা অন্যান্য নাগরিকদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।

শেষ কথা হল, আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় বৃদ্ধাশ্রম, শরণার্থী শিবির, এতিমখানা, প্রতিবন্ধী সহায়তা কেন্দ্র, গৃহহীনদের আশ্রয়কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, নারী ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং বেকার পুনর্বাসন কেন্দ্রের মতো প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা হবে। তবে, আমাদের মূল লক্ষ্য একটি সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা, যেখানে এসব প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন কমে আসবে। সমাজের আর্ত, অসহায় এবং পীড়িত মানুষের সংখ্যা এমন পর্যায়ে কমিয়ে আনা হবে, যেখানে কেউ আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে না।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

(Disaster Management, Relief and Rehabilitation)

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নিচু অঞ্চলে অবস্থিত নদীমাতৃক দেশ, যার উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত থেকে উৎপন্ন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা সহ প্রায় তিন শতাধিক নদ-নদী এবং সেগুলোর শাখা প্রশাখা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিলিত হয়। এসব নদী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে এখানে বন্যা এবং নদীভাঙন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে নিয়মিত হয়ে থাকে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলাভূমি দখল ও ভরাটের কারণে বন্যার পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বঙ্গোপসাগর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঘূর্ণিঝড়ের উৎসস্থল হওয়ায়, এখানকার উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবও তীব্র। পরিবেশগত অবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে পরিবেশের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি করছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। তারা ঘরবাড়ি হারিয়ে গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং সম্পদ হারিয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যায়। দুর্যোগের ফলে তাদের শুধু জীবনের ঝুঁকি ছাড়াও খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, চিকিৎসা সেবা না পাওয়া এবং প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যে কোনো দুর্যোগকালে ইসলামের শিক্ষা কী তা আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। যখন মক্কা থেকে মুহাজিররা মদিনায় এসেছিলেন, তখন আনসাররা তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজেদের বাড়ি, জমি এবং সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন মদিনায় ভয়ানক অভাব দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছিল তখনও মো'মেনরা নিজেরা না খেয়ে, এমনকি নিজেদের সন্তানকে অভুক্ত রেখেও অন্যদেরকে খাইয়েছেন। রসুলাল্লাহ (সা.) স্বয়ং তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে সামান্য খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, জাতির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা গেলে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।

নবুয়তের সপ্তম বর্ষে (৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ) কোরায়েশরা রসুলাল্লাহ (সা.) এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ জারি করে। এর

ফলে মুসলমানরা শিয়াবে আবু তালিব নামক একটি সংকীর্ণ গিরি উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেই খোলা প্রান্তরে প্রচণ্ড রোদ ও প্রতিকূল পরিবেশে টানা তিনটি বছর তাঁরা অসহনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করেন। এ সময় খাদ্য ও পানীয়ের তীব্র অভাবে তাঁরা গাছের পাতা, এমনকি জুতোর শুকনো চামড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে খেতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে, ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার শব্দ উপত্যকার পরিবেশকে আরও করুণ করে তুলত। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার এই কষ্ট এতটাই মারাত্মক ছিল যে এর ফলে অনেকেই পরবর্তীতে মারা যান। এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে অপুষ্টিজনিত কারণেই আম্মা খাদিজা (রা.) ও রসুলাল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর দিন পাল্টায়। **৭ হিজরিতে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যের অভাবে কোরায়েশরা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তখন রসুলাল্লাহ মদিনার শাসক। কোরায়েশদের এই দুর্দশা দেখে রসুলাল্লাহ (সা.) মদিনা থেকে ত্রাণ সহায়তা হিসাবে খাদ্যসামগ্রী পাঠান, যদিও মক্কায় তখনও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোরায়েশরা তখনও মুসলিমদের চরম শত্রু**। তাঁর এই মহানুভবতা কোরায়েশদের জীবন রক্ষায় সহায়তা করে। মানবিক ও ত্রাণ সহায়তার ক্ষেত্রে ইসলামের এই সুমহান আদর্শ সেদিন কট্টর কাফেরদেরও অবাক ও বিস্মিত করেছিল।

খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর খেলাফতের পঞ্চম বছরে হেজাজে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়েছিল। খরার তীব্রতা বোঝানোর জন্য এই বছরকে বলা হয় ছাইয়ের বছর। মদিনার বাজারগুলো একদম জনমানবশূন্য হয়ে গিয়েছিল। একদিন খলিফা উমরের ভৃত্য খবর আনেন যে একজন লোক চড়া দামে এক মশক দুধ আর কিছু মাখন বিক্রি করছে। কিন্তু খলিফা তাকে কিনতে না করে দেন। তিনি বলেন, 'যদি আমি এসব দামি খাবার খাই, তাহলে কীভাবে আমার জনগণের কষ্ট অনুভব করব?' এভাবে কষ্ট করে তাঁর মুখের হাড়গুলো জেগে উঠেছিল। চরম ইসলামবিরোধী ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ম্যুরও তার "Anals of Early Caliphate" বইয়ে উমরের (রা.) এই ঘটনা তুলে ধরেছেন।

অতীতে আমাদের দেশ বারবার ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে, যার ফলে বিপুল প্রাণহানি, অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষতির মূল কারণ ছিল সঠিক পূর্বাভাস এবং প্রস্তুতির অভাব, সমন্বয়হীনতা এবং ত্রাণ সরবরাহে দুর্বলতা। এক কথায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির অভাবই এসব মানবিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুর্যোগ মোকাবেলায় আরও কার্যকর পদক্ষেপের রূপরেখা হচ্ছে:

০১. **সর্বসাধারণের সম্পৃক্ততা:** দুর্যোগ মোকাবেলার দায়িত্ব কেবল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর নয়, বরং পুরো জাতিকে এতে সম্পৃক্ত করা হবে। জাতির সদস্যদের পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসার মনোভাব গঠনের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম, সামাজিক কর্মসূচি ও উদ্যোগের মাধ্যমে এবং জাতীয় ঐক্য বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে নিয়মিত শিক্ষা ও চেতনা সৃষ্টির কাজ করা হবে। এর মাধ্যমে পুরো জাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে। শুধু দুর্যোগের পরেই নয়, দুর্যোগের আগেও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে তারা ব্যাপকভাবে অংশ নেবে।

০২. **সমন্বয় নিশ্চিতকরণ:** দুর্যোগকালীন সময়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকর্মী দল, সেনাবাহিনী, দমকলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা একযোগে কাজ করে। তবে, কার্যকর যোগাযোগের অভাবে এদের কার্যক্রম সঠিকভাবে সমন্বিত হয় না। এর ফলে উদ্ধার কার্যক্রম এবং ত্রাণ বিতরণে বিলম্ব ঘটে, যা দুর্গত মানুষের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তদুপরি, তথ্যের অভাব বা ভুল তথ্যের প্রচার থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল এবং অস্থিতিশীল করে তোলে। দুর্যোগকালীন সমন্বয়হীনতা দূর করতে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল গঠন করা হবে, যেখানে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনসহ সবগুলো সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে তথ্য আদান-প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে প্রতিটা ইউনিটের জন্য দায়িত্বশীল ও লোকবল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে যেন মহাসড়ক থেকে দূরবর্তী কোনো এলাকাও উদ্ধার ও ত্রাণ সহায়তা থেকে বাদ না পড়ে। ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক উদ্যোগে যারা সহায়তা করতে চাইবে তারাও যেন এই ইউনিটগুলোর সাথে সমন্বয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে, যেখানে প্রতিটি সংস্থা রিয়েল-টাইম তথ্য আপডেট করবে। প্রতিটি সংস্থার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। দুর্যোগের পূর্বে নিয়মিত মহড়া আয়োজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

০৩. **ত্রাণ ব্যবস্থাপনা:** ত্রাণ বিতরণে অনেক সময় দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি বারবার সাহায্য পায়, অথচ দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষরা একেবারেই ত্রাণ পায় না, যা মূলত পরিকল্পনা ও সংগঠনের অভাবে ঘটে। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমে শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের সাহায্য দেওয়া হবে, যাতে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের দ্রুত সহায়তা পৌঁছানো যায়। দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির কারণে অনেক সময় সঠিক ব্যক্তির কাছে ত্রাণ পৌঁছায় না। এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ত্রাণ বিতরণে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে এবং

তদারকি কঠোরভাবে করা হবে। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ সময়ের সুযোগ নিয়ে অনেক অসাধু অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট ও প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলন করে নামমাত্র তা বিতরণ করে ও বাকিটা আত্মসাৎ করে। এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের জন্য নিবন্ধন করিয়ে কার্ড প্রদান করা হবে। অনিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কোনোরূপ অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি ও জবাবদিহি করা হবে, যেন কোনো অনিয়ম এক্ষেত্রে না হতে পারে। এতে সাধারণ মানুষের আস্থাও বাড়বে, ফলে সহায়তা কার্যক্রমে সকলেই অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে।

০৪. **বৈদেশিক ত্রাণের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস:** দুর্যোগে পড়লেই বিদেশিদের ত্রাণ-সহায়তা ভিক্ষার মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। দেশের মানুষের আগে এগিয়ে আসার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা মানুষকে দিতে হবে। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেরা ব্যক্তি সে, যে মানুষের উপকারে আসে।' (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৩১৬)। তিনি আরো বলেন, 'একজন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদে সাহায্য করবে, যখন সে সংকটে থাকে।' (সহীহ আল-বুখারি, হাদিস ২৪৪২)

০৫. **দুর্যোগ পূর্বাভাসের সদ্ব্যবহার:** উপগ্রহ প্রযুক্তি, উন্নত যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান করা হবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আগাম সতর্কতা জারি করে মানুষকে দ্রুত প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করা হবে। পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হবে। তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান সম্পর্কে মানুষকে জানাবে। দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আধুনিক মাধ্যম, যেমন টিভি, রেডিও, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে, যা দ্রুত তথ্য পৌঁছাতে সহায়ক হবে।

০৬. **দুর্গত অঞ্চলে উদ্ধারকাজ:** উদ্ধারকাজের জন্য উন্নত নৌকা, হেলিকপ্টার এবং উভচর যানবাহন সংগ্রহ ও সংরক্ষণে একটি জাতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হবে। বিশেষায়িত বাহিনী গঠন করে যানবাহন পরিচালনা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় এই সংকট মোকাবিলা নিশ্চিত করা হবে।

০৭. **আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি:** প্রতিটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক টেকসই এবং আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নিরাপদ পানি, খাবার, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং শৌচাগারসহ প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে দুর্যোগকালীন

আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে প্রস্তুত রাখা হবে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটির সক্রিয় ভূমিকা রাখা হবে।

০৮. **বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন:** প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা, সাইক্লোন বা নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে জাতির বিত্তবান ও দানশীল ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে। জমির মালিকদের মধ্যে একটি সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সৃষ্টি করা হবে, যাতে তারা বিপর্যস্তদের আশ্রয় দিতে আগ্রহী হন। জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, ক্ষতিগ্রস্তরা কখনো বিপন্ন অনুভব করবে না, কারণ তারা জানবে যে পুরো জাতি তাদের পাশে রয়েছে এবং তাদের আমিরও সবসময় অভিভাবক হিসেবে পাশে থাকবেন। কৃষকদের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে, ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ সুবিধা ও বাজার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে। গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় ও আবাসন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা উন্নত করা হবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জীবিকার পুনরুদ্ধার করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী পুনর্গঠন প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো, সেচ ব্যবস্থা, বাধ ও সড়ক পুনর্নির্মাণ করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নয়। তার দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করার ফল হিসাবে যে শান্তি সেই শান্তির নাম ইসলাম।

- এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

স্বাস্থ্যসেবা: পণ্য নয় - অধিকার

(Healthcare: A Right, Not a Commodity)

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সেবাগুলোও এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা সেবাও এখন একট পণ্য। যার টাকা আছে সে চিকিৎসা পাবে আর যার টাকা নেই সে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। সরকারি হাসপাতালের পরিবেশ ও চিকিৎসা অত্যন্ত নিম্নমানের। বেসরকারি হাসপাতালে সাধারণ মানুষের পক্ষে খরচ বহন করাই সম্ভব নয়। প্রতিটা খাতের মতো স্বাস্থ্যখাতেও ব্যাপক দুর্নীতির ফলে এই খাতের কোনো উন্নয়ন, অগ্রগতি নেই; অথচ স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতও নানা ধরনের দুর্নীতি, জুলুম ও অমানবিক বৈষম্যের শিকার। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশে ৪৯ শতাংশ মানুষ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটছে। যারা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল, তারাও এখন চিকিৎসা করাতে বিদেশে যাচ্ছেন। ডেইলি স্টার (২৪ নভেম্বর ২০২৪)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা খাতে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা (৪ বিলিয়ন ডলার) বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা ১৮,৪২৩টি। তারপরও আমাদের রোগীরা বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন মূলত কয়েকটি কারণে, যেমন: চিকিৎসকদের পেশাদারিত্বের অভাব, সরকারি হাসপাতালে অত্যাধিক রোগীর চাপ, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, বিশেষায়িত চিকিৎসার অভাব, স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবার প্রতি অনাস্থা, ভুল টেস্ট রিপোর্ট, আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি, অতিরিক্ত চিকিৎসা খরচ, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, রুক্ষ আচরণ, অযত্ন ও হয়রানি, এবং দক্ষ চিকিৎসক ও জনবলের অভাব। এ সকল সমস্যার অধিকাংশই সৃষ্টি হয়েছে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে বাণিজ্যিক খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কারণে। যদিও রোগীদের বিদেশমুখিতা হ্রাস করানোর জন্য বহু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো সফলতা পাচ্ছে না।

ইসলাম মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই সেবাকে মানবাধিকার ও ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছে। স্যাবাথের দিন একজন অন্ধকে দৃষ্টিদান করে সেই সমাজের ধর্মান্ধ জনগোষ্ঠীকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন হজরত ঈসা (আ.)। তিনি বুঝিয়েছিলেন, আর্ত-পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো আনুষ্ঠানিক উপাসনার চাইতেও অধিক সৎকর্ম।

রসুলাল্লাহ (সা.) এর যুগে স্বাস্থ্যসেবা মূলত চিকিৎসা, সেবাযত্ন এবং প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন এবং তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, সে যতক্ষণ সেখানে থাকবে, ততক্ষণ জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।' (তিরমিজিঃ ৯০৯)। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা ক্ষুধার্তদের অন্ন দাও, রোগীদের সেবা কর এবং বন্দিদের মুক্তি দাও।' (বুখারি ৫৬৪৭)। যুদ্ধের সময় এবং সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারা রোগীদের সেবাযত্ন করতেন। উতবা আল আসলামিয়া, উম্মে আতিয়া, উম্মে আলা, শিফা বিন আব্দুল্লাহ এবং উম্মে সিনান (রা.)-এর মতো মহিলারা ছিলেন যারা আহতদের সেবা করতেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতেন। মসজিদে নববীর পাশে একটি ছোট তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল যা যুদ্ধাহত ও অন্যান্য রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। রুফাইদা আল-আসলামিয়া (রা.) নামে একজন নারী সাহাবী এই চিকিৎসাকেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষিত নার্স ছিলেন এবং অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। এই হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হত। জাতিগতভাবে (উম্মাহ) এর ব্যয় বহন করা হত।

সোনালি যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইবনে সীনা (Avicenna, 980–1037) তার ক্যানন অফ মেডিসিন (কানুন ফিত তিব্ব) গ্রন্থে সার্জারি, পেটের রোগ এবং মস্তিষ্ক সম্পর্কিত চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়ন করেন। আবু আলি হাসান ইবনে হাইসাম (Alhazen, 965–1040) চোখের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আধুনিক অপটিক্স (optics)-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ইবনে রুশদ (Averroes, 1126–1198) মানসিক রোগ ও নার্ভ সংক্রান্ত চিকিৎসায় নতুন পথ দেখান। মুসলিম চিকিৎসকরা গলাব্যথা, হৃদরোগ, রক্তচাপ এবং সংক্রামক রোগের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এছাড়া, আবু বকর আল-রাজি (Al-Razi, 865–925) সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় নতুন ধারণা পেশ করেন এবং সিফিলিসের চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotics)-এর প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। আবুল কাসিম আল-জাহরাওই (Al-Zahrawi, 936–1013) সার্জারিতে অগ্রগতি সাধন করেন এবং তিনি টিকা

(vaccination) ব্যবহারের জন্য একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন। তাদের এসব গবেষণা এবং উদ্ভাবন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সে যুগে চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মানবিক। সেই সময় এ সকল প্রখ্যাত চিকিৎসকরা তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কারণ ইসলাম স্বাস্থ্যকে কেবল শারীরিক অবস্থার বিষয় নয়, এর সঙ্গে মানুষের আত্মিক উন্নতি অবনতির নিবিড় যোগ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। তাই একজন মানুষকে সুস্থ করে তুলতে শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার চিকিৎসাই (Holistic health care) ইসলাম দিয়ে থাকে।

তাই আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় চিকিৎসা সেবাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং একজন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার সময় তার শরীর, মন, আত্মিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা ও আবেগ অনুভূতি সবকিছুকেই বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

০১. **বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা:** বর্তমানে আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোতে দেখা যায় অনেক চিকিৎসক, স্টাফ, দালাল ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের জিম্মি করে কমিশন গ্রহণ করেন এবং অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা (Test) করিয়ে রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যসেবা একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তার এই মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, **সরকারি হাসপাতালগুলোতে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে**। তবে যাদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে রোগমুক্তিবাবদ স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাস্তায় তথা মানবতার কল্যাণে হাসপাতালের জন্য সদকা বা ডোনেশন প্রদানের জন্য। এ অর্থ অন্যান্য দুঃস্থ রোগীদের সেবায় ব্যয়িত হবে। সরকারি বেসরকারি সকল হাসপাতালকে দুর্নীতিমুক্ত করে সেবার উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

০২. **নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা ফাইল:** প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য তথ্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষিত থাকবে এবং একটি কেন্দ্রীয় সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের যেকোনো স্থান থেকে তাতে প্রবেশ (Access) করা যাবে। এতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও চিকিৎসার প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

০৩. **বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ:** আমাদের দেশের বেসরকারি হাসপাতালগুলো রোগীদের ওপর আকাশচুম্বী চিকিৎসা ব্যয় চাপিয়ে দেয়, ফলে দরিদ্র মানুষ সেখানে গিয়ে ভয়াবহ সংকটে পড়ে যায়। **এমনও ঘটনা ঘটেছে যেখানে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে না পেরে পরিবার মৃত স্বজনকে রেখে পালিয়ে গেছে, বা ভর্তি হতে না পেরে মা হাসপাতালের প্রাঙ্গণে গাছের নিচে সন্তান প্রসব করেছে**। এই

অমানবিক পরিস্থিতি এড়াতে, বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় নির্ধারণের জন্য একটি কঠোর সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। চিকিৎসা খাতকে নিছক বাণিজ্যিক খাত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর জন্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে একটি নিরীক্ষা ও তদারকি ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে সেবার মূল্য ও মানের মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালু করা হবে, যাতে তারা কম খরচে প্রয়োজনীয় ও উন্নত চিকিৎসা সেবা পায়। অধিকতর দরিদ্র রোগীদের সহায়তা দেওয়ার জন্য আর্থিক ভর্তুকি এবং স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থা চালু করা হবে। পাশাপাশি সমাজের সামর্থ্যবান দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা হবে, যাতে তারা দাতব্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে স্বাস্থ্যসেবা খাতে অবদান রাখেন। এতে করে রাষ্ট্রের ওপর চাপ কমবে।

০৪. **জাতীয় ঔষধ নীতি:** বর্তমানে অনেক নিম্নমানের ও নকল ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়, যা রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য একটি কঠোর জাতীয় ঔষধ নীতি প্রণয়ন করা হবে। এই নীতির মাধ্যমে ঔষধ প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া কঠোরভাবে তদারকি করা হবে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন ঔষধ বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। যারা নকল ঔষধ বিক্রি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

০৫. **অ্যালোপ্যাথি ও বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি:** প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মান উন্নয়ন করা হবে। কারণ, এসব পদ্ধতিগুলোর মান উন্নত না হওয়ায় অনেক সময় রোগীরা প্রতারিত হন। **হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানি, চিনা চিকিৎসা, নেচারোপ্যাথি, আর্কটিভ থেরাপি এবং অন্যান্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে মেডিকেল শিক্ষা পদ্ধতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।** হোমিওপ্যাথিকে বর্তমানে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হলেও অগণিত রোগী এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিয়ে আরোগ্য লাভ করছেন। আমাদের প্রস্তাবিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথিকে অ্যালোপ্যাথির সম-মূল্যায়ন করা হবে। রসুলাল্লাহ (সা.)-এর সময় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। এছাড়া, ইসলাম স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, কায়িক পরিশ্রম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে শেখায়। ইসলাম স্বল্প আহার ও সঠিক জীবনযাপনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা-জনিত রোগ (Lifestyle Diseases) নির্মূল করার শিক্ষা দিয়েছিল, যা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক করা হবে।

০৬. **চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ:** চিকিৎসকদের অনেকেই চিকিৎসা পেশাকে কেবল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখেন। নিজেদের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে তারা অনেকেই ভোর সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টাকার পিছনে ছুটে বেড়ান। জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় তারা কথিত 'জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন'-কেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে ধরে নেন এবং আরো গাড়ি বাড়ি অর্থবিত্তের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেন। তাদের এই মানসিকতার ফলে রোগীরা ন্যায্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তারা চিকিৎসকদের প্রতি ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে পড়ে। এই সমস্যা দূর করতে, চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের মানবিক ও নৈতিক শিক্ষাও প্রদান করা হবে। **এতে করে তারা রোগীর দুঃখকষ্টকে নিজেদের দুঃখ মনে করে, সহানুভূতির সাথে সেবা প্রদান করবেন। নিজেদেরকে টাকার মেশিন না বানিয়ে, আল্লাহ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ একজন মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।** চিকিৎসকদের সেবামূলক কাজকে এবাদত ও গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে গণ্য করা হবে।

০৭. **নার্সিং সেবা উন্নয়ন:** রোগীর সুস্থতা মেডিসিনের চেয়ে বেশি নির্ভর করে আন্তরিক সেবাযত্নের উপর। তাই নার্সিং সেবার মান উন্নত করতে পর্যাপ্ত নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ও অভিজ্ঞ নার্স নিয়োগ করা হবে। **প্রাথমিক নার্সিং শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে সবাই মৌলিক নার্সিং জ্ঞান অর্জন করতে পারে।** এ ছাড়া, যে কোনো বয়সের মানুষ নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ নিতে পারবে, এমন ব্যবস্থা রাখা হবে। এর ফলে, রোগীরা পরিবার থেকে উন্নত সেবা পাবে এবং হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে।

০৮. **গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা:** অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক এবং হাসপাতালের অভাব থাকে, যার ফলে গ্রামের মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। **অভিজ্ঞ মেধাবী চিকিৎসকদের গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ করা হবে** এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো তৈরি করা হবে।

০৯. **গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা:** গর্ভাবস্থায় নারীদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতন করা হবে, বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। কেননা আজকের সুস্থ শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া গর্ভধারণের পূর্বে যেন প্রতিটা নারী চিকিৎসকের পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে সন্তান গ্রহণ করে। কেননা অসুস্থ মা অসুস্থ সন্তানের জন্ম দেয়, ফলে সেই বাচ্চা জাতির বোঝা হয়। এজন্য এই ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।

১০. **মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন:** অনেক মানসম্পন্ন চিকিৎসক উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী হন। যার ফলে দেশের চিকিৎসা খাত দুর্বল

হয়ে পড়ে। মেধাপাচার রোধ করতে দেশীয় মেডিকেল কলেজগুলোতে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং প্রশিক্ষিত চিকিৎসকদের দেশের জনগণের সেবায় নিয়োজিত করা হবে।

১১. চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং ঔষধের কাঁচামাল: উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও ঔষধের কাঁচামাল অনেক সময় সহজলভ্য হয় না, যার ফলে চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে এবং বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে।

১২. গবেষণা ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতির জন্য উন্নতমানের গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমন্বয়ে নতুন রোগ নিরাময়ের উপায় বের করা হবে। চিকিৎসক ও গবেষকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে, যাতে ক্লিনিক্যাল চিকিৎসার সঙ্গে গবেষণার ফলাফল একীভূত করা যায়। বিশেষ করে জীবাণুজনিত রোগ, মহামারী এবং জন্মগত রোগ নিয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে। নতুন প্রযুক্তি যেমন জেনোমিক্স, বায়োটেকনোলজি ও ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা খাতে উন্নয়ন সাধন করা হবে, যা দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা আরও কার্যকর এবং উন্নত করবে। ফলে উন্নত চিকিৎসার জন্য এদেশের নাগরিকদের বিদেশে যেতে হবে না।

১৩. পাশ্চাত্য প্রভুদের অন্ধ অনুসরণ নয়: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), জাতিসংঘের শিশু তহবিল (UNICEF) এবং সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC) এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি গণস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি পরিচালনায় বড় ভূমিকা পালন করে। তবে, এসব সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে মানবতাবিরোধী অভিযোগও উঠেছে, ইউনিসেফের ওয়েবসাইটেও এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আছে। অনেক সময় এদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণের উপর জোরপূর্বক টিকার প্রয়োগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠেছে। তাই আমরা অন্ধভাবে এসব সংস্থার নীতি অনুসরণ করতে রাজি নই। আমাদের স্বাধীন ও নিজস্ব চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞ টিমের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েই আমরা গণস্বাস্থ্য পরিকল্পনার যে কোনো নীতি গ্রহণ করব।

এই নীতিগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা খাতটি একদিকে যেমন গুণগত সেবা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে তা যান্ত্রিকতার পরিবর্তে মানবিকতায় পরিপূর্ণ হবে।

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা

(Population and Family Planning)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনে রয়েছে আল্লাহর মহা পরিকল্পনা, যার নিদর্শন প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়েও আমরা দেখতে পাই। সবকিছু সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনোকিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।' (সুরা দুখান ৪৪:৩৮-৩৯)। আল্লাহ মানুষকে নিয়েও বৃহৎ পরিকল্পনা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছে স্বয়ং আল্লাহর পরিকল্পনা মোতাবেক আদিপিতা মাতা আদম (আ.) ও হাওয়ার (আ.) মাধ্যমে। তাঁদের থেকে আজকের পৃথিবীর প্রায় আটশো কোটি মানুষের বিস্তার ঘটেছে। এই বিস্তারের পেছনে রয়েছে আল্লাহর নির্ধারিত রিজিকের বণ্টন এবং জনমিতি (Demography) তথা জনসংখ্যা সম্পর্কিত গাণিতিক ভারসাম্য। **যখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহ তাদের রিজিকের জন্য নব নব যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন (চাকা, ছাপাখানা, বাস্প ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বা প্রাকৃতিক সম্পদ (কয়লা, তেল, গ্যাস, লোহা) আবিষ্কারের মাধ্যমে কোনো না কোনো উপায় বের করে দিয়েছেন। সৃষ্টি করে দিয়েছেন মানুষের কর্মসংস্থানের উপায়, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে এনেছে।** এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পরিকল্পনার উদাহরণ। এভাবে মানুষও তার নিজের পরিবার গঠন নিয়ে পরিকল্পনা করবে সেটাই ইসলামের শিক্ষা। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি ব্যাপক বিষয়। এর মধ্যে পরিবার প্রধানের উপার্জন, মায়ের স্বাস্থ্য, সন্তান জন্মের মধ্যবর্তী সময়, শিশুর স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জীবনমান উন্নয়ন, মায়েদের কর্মসংস্থান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতি ইত্যাদি বহুকিছু অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সঙ্গে জনমিতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আধুনিক জনমিতি হলো মানবজাতি, তার জন্মহার, মৃত্যুহার, সম্পদ এবং প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। একটি ভূখণ্ডে কত মানুষ স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারে তা নির্ভর করে কৃষিজমি, জলাশয়, বনভূমি এবং

অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্যের উপর। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করে জীবন পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন।

সন্তান আল্লাহর দান এ কথা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে নর-নারীর সক্রিয় ভূমিকা দ্বারাই সন্তানের জন্ম হয়। তাই ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষ তার সন্তানের ভরণপোষণসহ বিভিন্ন দায় নিতে বাধ্য। যার স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেওয়ার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাকে সামর্থ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন, হঠকারিতা করে বিয়ে করতে বলেননি (সুরা নুর ২৪:৩৩)। সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি। সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ইসলামে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। হাদিসে অধিক সন্তানবতী নারীকে বরকতময় বলা হয়েছে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন: ‘তোমরা প্রেমময়ী, স্নেহশীলা ও অধিক সন্তান জন্মদানকারীনি নারীদেরকে বিবাহ করো! কারণ, কেয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবো।’ (মুসনাদে আহমাদ- ১২৬১৩, আবু দাউদ- ২০৫০)। আরব্য জাহেলিয়াতের যুগে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা হত এবং এখনও ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভপাতের ঘটনা অহরহ ঘটে থকে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদের এবং তোমাদের উভয়ের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করি।’ (সুরা বনি ইসরাইল ১৭:৩১)। আল্লাহ ও তাঁর রসুল সন্তান লাভকে রহমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে পরিবারের সামর্থ্য ও সন্তানদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেন: ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ পরিবার সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮৯৩)। তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছেন যে, ‘হে আল্লাহ! আমার সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং আমাকে যা দান করেছেন তাতে বরকত দিন।’ (বোখারি ৬৩৩৪, ৬৩৪৪, ৬৩৭৮, ৬৩৭৯)। অর্থাৎ তিনি অধিক সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সম্পদও প্রার্থনা করেছেন।

কিন্তু আমরা কী করেছি? আমরা এমন এক ভৌগোলিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যেখানে একটি ছোট, কাঁটাতার ঘেরা ভূখণ্ডে অধিকসংখ্যক জনসংখ্যাকে আটকে রেখে তাদের জীবনযাপনকে শ্বাসরুদ্ধকর করে তোলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছি। এতে জনসংখ্যা ও সম্পদের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবে এর চেয়ে বড় অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। এই ভৌগোলিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে অনেক দেশ বাধ্য হয়েছে কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে। এজন্য তারা যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মধ্যে যেমন সামাজিক সচেতনতা

সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত ছিল, পাশাপাশি কঠোর আইনও ছিল। উদাহরণস্বরূপ অধিক জনসংখ্যার দেশ চিন এবং ভারতের কথা বলা যায়। ১৯৭০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অধীনে ভারতে একটি বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বহু নারী ও পুরুষকে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়েছিল। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ১৯৭৬-৭৭ সালে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও জনবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

একইভাবে চিনেও ১৯৭৯ সালে চিনের সর্বোচ্চ নেতা ডেং শাওপিং এর শাসনামলে এক সন্তান নীতি কার্যকর করা হয়, যা ২০১৫ পর্যন্ত চালু ছিল। এ নীতির আওতায় একাধিক সন্তান জন্ম দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বহু পরিবারের সদস্যকে বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাকরণ ও গর্ভপাত করানো হয়। প্রচুর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে। তথাপি চিনের সমাজতান্ত্রিক সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে এই নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর প্রভাবে বেশ কিছু দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা সেখানে সৃষ্টি হয়। তাই ২০১৫ সালে এই নীতি শিথিল করা হয় এবং 'দ্বৈত সন্তান নীতি' চালু হয়।

দীর্ঘদিন 'এক সন্তান নীতি' চালু থাকার কারণে চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কাঠামোয় যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হল- জন্মহার হ্রাসের সাথে সাথে তাদের কর্মক্ষম জনগণের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। অথচ চিন একটি শিল্পনির্ভর দেশ, তাদের প্রচুর শ্রমশক্তি দরকার। ওদিকে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রবীণদের সংখ্যা, যাদেরকে সরকারের পেনশন ও স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যেতেই হচ্ছে। এটা তাদের জাতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। আবার দীর্ঘ বিরতির পর দম্পতিদেরকে দুইটি করে সন্তান নেওয়ার নির্দেশ দিলেও জন্মহার সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

ঠিক এর বিপরীত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বহুদেশে, যেখানে জন্মহার বাড়ানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের প্রণোদনা চালু করা হয়েছে। তারা জন্মহার বাড়ানোর জন্য দম্পতিদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে যা আমাদের মতো গরিব দেশের মানুষের জন্য কল্পনার বাইরে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া সরকার ২০২৪ সাল থেকে সন্তান জন্মের পর প্রত্যেক পরিবারকে ২৯.৬ মিলিয়ন কোরিয়ান ওন (প্রায় ২৫ লাখ টাকা) প্রদান করছে। এছাড়া সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানের জন্য আরও বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন বিনা মূল্যে পড়াশোনা, বাড়িভাড়া ইত্যাদি। হাঙ্গেরি দম্পতিদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানের জন্য ১,০০,০০০ হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট (প্রায় ২৪,০০০ টাকা) নগদ সহায়তা প্রদান করে এবং অন্যান্য নানা সুবিধা দেয়। ফ্রান্সে দুই সন্তানের জন্য পরিবারকে প্রতি

মাসে ১৩০ ইউরো (প্রায় ১৪,০০০ টাকা) দেওয়া হয়, আর তিন সন্তান থাকলে এই পরিমাণ বেড়ে ২৯৬ ইউরো (প্রায় ৩২,০০০ টাকা) হয়ে যায়। এরপর, প্রতি অতিরিক্ত সন্তানের জন্য আরও ১৬৬ ইউরো (প্রায় ১৮,০০০ টাকা) দেওয়া হয়। এছাড়া, তাদের শিক্ষা সহায়তা এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাও দেওয়া হয়। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও জন্মহার তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

ভৌগোলিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে পৃথিবীতে বহু দেশ আছে যেখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জনহীন পড়ে আছে। যেমন কানাডার আয়তন বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৬৭ গুণ বড়, তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কানাডার সাড়ে চার গুণ বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,২৭১ জন, আর কানাডায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৪ জন। এই অবিচারকে শিরোধার্য করে নিয়ে এখন জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করার যত পরিকল্পনাই করা হোক সব ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইসলাম তো গোটা পৃথিবীকে একটি অভিন্ন দেশ মনে করে, সকল মানুষকে এক জাতিভুক্ত মনে করে। যখন আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়ার সন্তানদের সংখ্যা বেড়ে চলল, তারা জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। আজ, সেই ছড়িয়ে পড়ার পথে তারকাটা বিছানো হয়েছে। ফলে **পৃথিবীর ৮১০ কোটি মানুষ ১৯৫ টি স্বাধীন দেশ নামক বন্দীশালায় আবদ্ধ হয়ে আছে।** এই অবিচার থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অধিক জনসংখ্যা মানেই সংকট- এক একটা ধারণা প্রচারের গুণে আমাদের মনে-মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে অধিক জনসংখ্যা মানেই সেটা সংকট নয়, বরং জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে জাতি উন্নতির শিখরেও চলে যেতে পারে। যেমন, ১৮৮০ সালে জার্মানির জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। ঐ সময় সে দেশের বহু মানুষ খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছিল। লাখ লাখ জার্মান দেশ ত্যাগ করে অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। এরপর মাত্র ৩৪ বছরের মধ্যে জার্মানির জনসংখ্যা বেড়ে ৬ কোটি ৮০ লক্ষতে পৌঁছে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই সময় এই বাড়তি জনসংখ্যার চাপে জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্গতি একটুও বাড়েনি। উল্টো জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, উপার্জনের উপকরণ কয়েক শতগুণ বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি অর্থনৈতিক ও উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যে ভিন্ন দেশ থেকে তাদের শ্রমিক আমদানি করতে হয়েছিল। ১৯০০ সালে ৮ লক্ষ বিদেশি জার্মানিতে কর্মরত ছিল। ১৯১০ সালে এদের সংখ্যা ১৩ লক্ষে পৌঁছে যায়।

এভাবেই জার্মানি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, এমনকি বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধে তারা বড় বড় পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। জার্মান জাতির এই অভূতপূর্ব উন্নতির পেছনে কারণ হিসাবে শিল্পবিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক জাতীয় নীতি, অর্থনৈতিক উদারনীতি ইত্যাদির কথা বলা হলেও আসল কারণ হচ্ছে, তারা এ সকল উপকরণ ব্যবহার করে গোটা জাতির জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তদের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। জাগিয়ে তুলেছিল শ্রেষ্ঠতার অনুভূতি। তাদের প্রত্যেকটি নাগরিক এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে জার্মান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সুতরাং তারা ঘুরে দাঁড়াবেই। তাদের এই বিশ্বাস ছিল তাদের প্রেরণা। ফলে দুটো বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও আবার তারা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ও অন্যতম পরাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

১৯শ শতকের শেষ এবং ২০শ শতকের প্রথম দিকে, বিশেষত নাৎসি জার্মানির উত্থানের সময়ে একটি জাতীয়তাবাদী মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে জার্মানরা হচ্ছে আর্য জাতি বা আরিয়ান এবং তারা পৃথিবীর বিশুদ্ধতম রক্তের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, সভ্য, পবিত্র ও উন্নত মানব সম্প্রদায়। এই মতবাদকে জনপ্রিয় করেছিলেন রিচার্ড ওয়াগনার (১৮১৩-১৮৮৩), আরথার ডি গোবিনো (১৮১৬-১৮৮২), হাউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন (১৮৫৫-১৯২৭) এবং আলফ্রেড রোজেনবার্গের (১৮৯৩-১৯৪৬) মত বহু লেখক, দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক। তারা তাদের বই, সাহিত্য, সঙ্গীত, অপেরা, জনসংযোগ, বক্তৃতা, রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে জার্মানির আর্য জাতীয়তাবাদ ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে (Arian Supremacy) প্রচার করেছিলেন। নতুন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং শুদ্ধ জাতির ধারণাই মূলত নাৎসি জার্মানির উত্থান ঘটিয়েছিল এবং হিটলার এটি জাতির অগ্রগতির জন্য সফলভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তারা তাদের জনসংখ্যার বোঝাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

এভাবে আমরা যদি আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে একইভাবে আমাদের এই দারিদ্রপীড়িত, বৈদেশিক ঋণের জালে জর্জরিত, অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত বাংলাদেশের মানুষ অচিরেই সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে ইনশাল্লাহ। এর জন্য জাতির ভিতরে যে শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা সৃষ্টি করতে হয়, যে গতিশীলতার সঞ্চার করতে হয়, সেই আদর্শিক উপাদান বা বক্তব্য (Philosophy, Narrative) আমাদের কাছে আছে। সেটা হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা- ইসলামের যে ব্যাখ্যা বা আকিদা আমরা তুলে

ধরছি সেটা। এই মহাসত্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সামান্য সংখ্যক আরব বেদুইন একটি উম্মাহয় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং জাতির উন্মেষের মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে অর্ধ পৃথিবী জয় করে নিয়েছিল। কেবল জয় করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, সেখানে তারা মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভিত রচনা করেছিল। সুতরাং আমাদের পক্ষেও সেটা সম্ভব।

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসংখ্যা সংকটের সমাধান ও পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

০১. **আর্থিক সক্ষমতা ও সন্তানসংখ্যা:** প্রতিটি পরিবার তাদের আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে সন্তানসংখ্যা নির্ধারণ করবে। যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, তাদের জন্য বেশি সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উৎসাহ প্রদান করতে পারে, কারণ তারা সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম। অন্যদিকে, দরিদ্র পরিবারগুলিকে কম সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা তাদের সীমিত সম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের সন্তানদের একটি উন্নত ভবিষ্যৎ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

০২. **জনশক্তি উন্নয়ন উদ্যোগ:** জনসংখ্যা জাতির জন্য বোঝা বা অভিশাপ না হয়ে যেন আশীর্বাদে পরিণত হয়, সেজন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করবে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যসেবা খাতে উন্নয়ন করা হবে, যাতে জনগণ সুস্থ ও শক্তিশালী থাকতে পারে। কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ করে তোলা হবে, যা তাদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। পাশাপাশি রাষ্ট্র তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে, যদি জাতির মধ্যে প্রেরণা ও গতি সঞ্চার করা সম্ভব হয়, তবে একটি বৃহৎ জনসংখ্যা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে শক্তিশালী জাতির জন্য আশীর্বাদে পরিণত হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শুধু খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যাই বাড়বে না বরং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও উপার্জনকারীর সংখ্যাও বাড়বে।

০৩. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংকট:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সংকটগুলো তৈরি হয় যেমন- সম্পদের অভাব, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সংকট, পরিবেশগত সংকট, কৃষিজমির ও আবাসভূমির সংকট, তা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪. **ত্রুটিযুক্ত ভ্রুণ:** ত্রুটিযুক্ত মানবশিশুর জন্ম যতটা সম্ভব রোধ করা হবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভধারণের পর তার গর্ভস্থ সন্তানের স্বাভাবিকতা পরীক্ষা করা

হবে। যদি তা ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে চিকিৎসক বোর্ডের পরামর্শক্রমে আদালত গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

◇◇

আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ্ অর্থাৎ 'জীবন-বিধাতা' বলে স্বীকার ও গ্রহণ করার পর জীবনের কোনো অঙ্গনে (Facet) অন্য কোনো বিধান অর্থাৎ আইন স্বীকার করার অর্থ হল তাঁকে ছাড়াও অন্য বিধাতা স্বীকার করে নেওয়া- এটাই হচ্ছে শেরক।

- এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

◇◇

পানি সম্পদ ও মৎস্য (Water Resources and Fisheries)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, যেখানে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক জলাশয় ও মৎস্যসম্পদ রয়েছে। এদেশের প্রায় ৮০% পানি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে দেশের সেচ এবং মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং অপব্যবহারের কারণে পানি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং দীর্ঘকালীন তাপপ্রবাহ দেখা যাচ্ছে, যা দেশের পানি ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবাহ (Salinity intrusion) বেড়ে গেছে, যা সুপেয় পানির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। এদিকে শিল্পবর্জ্য, স্যুয়ারেজ এবং কৃষি ফসলের বিষাক্ত রাসায়নিক দূষণেও পানির মান হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। নদী, খাল এবং পুকুরে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে, যা পানিবাহিত রোগ যেমন ডায়রিয়া ও কুষ্ঠের প্রকোপ বৃদ্ধি করছে। শহরাঞ্চলের দ্রুত নগরায়ণ এবং অব্যাহত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে, ঢাকার মতো শহরে ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের পরিমাণ বিপদ্জনকভাবে কমছে, যা দীর্ঘমেয়াদী পানি সংকট সৃষ্টি করছে।

পানি দূষণের কারণে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। জলাশয়, নদী ও খালগুলোর পানির মান কমে যাওয়ার ফলে মাছের প্রজনন এবং তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। অনেক দেশীয় মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন কৈ, মাগুর, শিং, পাবদা, টেংরা, পুঁটি, ডারকা, মলা, ঢেলা, চেলা, শাল চোপরা, শোল, বোয়াল, আইড়, ভ্যাদা, বুড়াল, বাইম, খলিসা, ফলি, চিংড়ি, মালান্দা, খরকাটি, গজার, শবেদা, চেং, টাকি, চিতল, গতা, পোয়া, বালিয়া, উপর চকুয়া, কাকিলা, গুত্তুম, বৌরানীসহ প্রায় ৫০টিরও বেশি মিঠা পানির মাছ।

এই মাছগুলো একসময় বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের বাজারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন, পানি দূষণের কারণে এগুলোর উপস্থিতি কমে গেছে। জেলেদের জালেও এই মাছগুলো এখন খুব কম দেখা যায়। এর ফলে মাছের বৈচিত্র্যেও হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্য চাহিদা পূরণে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। যদি প্রকৃতি ও জলাশয় দূষণমুক্ত করা হয় এবং বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা যায়, তাহলে মাছের প্রজননের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ফলে বিলুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে যাওয়া অনেক

প্রজাতি ফিরে আসতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে 'বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার' (Ecological Restoration) বলা হয়, যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও খাদ্য সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকে মনে করতে পারেন মাছের বিলুপ্ত প্রজাতিগুলো আবার ফিরিয়ে আনা কীভাবে সম্ভব। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার (Ecological Restoration) এমন একটি বাস্তবসম্মত ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা আল্লাহর বিশেষ রহমতস্বরূপ। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় প্রকৃতি পুনরুদ্ধার ও প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ফিরে আসার অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেমন ইউরোপীয় বাইসন, ক্যালিফোর্নিয়া কনডর (শকুন), গ্রে উলফ, সী অটার (সামুদ্রিক ভোঁদড়) ও পিঙ্ক পিজন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও আবার ফিরে এসেছে।

কৃত্রিমভাবে হ্যাচারি থেকে উৎপাদিত মাছ প্রাকৃতিক জলাশয়ের মাছের তুলনায় অনেক কম পুষ্টিমানের এবং স্বাদহীন। এর প্রধান কারণ হল তাদের খাদ্য এবং পরিবেশের পার্থক্য। হ্যাচারিতে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ফিডে প্রাকৃতিক খাদ্যের মতো সব ভিটামিন, মিনারেল বা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে না, যা মাছের স্বাদ এবং পুষ্টি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ ছোট জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ খেয়ে প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টি অর্জন করে, যা তাদের স্বাদ এবং পুষ্টি উন্নত করে। তবে কৃত্রিম ফিডে এসব উপাদান প্রাকৃতিক ফিডের মতো থাকে না, ফলে মাছের স্বাদ কমে যায় এবং পুষ্টির মানও হ্রাস পায়। এর ফলস্বরূপ, খামারবাড়ির মাছের চাহিদা বেড়েছে, তবে তাদের পুষ্টিমান কম হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পানি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। বিশুদ্ধ পানিকে কেন্দ্র করে মানুষের বসবাস গড়ে ওঠে। তাই প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। যেমন, নীল নদ, সিন্ধু নদ এবং ইরাক অঞ্চলের দজলা-ফোরাত নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বড় বড় সভ্যতা। পানিসম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। যেমন:

০১. প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। (সুরা আম্বিয়া ২১:৩০)।

০২. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের কল্যাণের জন্য। (সুরা মায়েদা ৫:৯৬)

০৩. তিনিই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে সংগ্রহ করতে পার অলঙ্কার। (সুরা নাহল ১৬:১৪)।

০৪. তোমরা যে পানি পান কর তার দিকে লক্ষ্য করে দেখ না যে, আমি কোনো বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেঘ তৈরি করি এবং তার থেকে পানি বর্ষাই। এই নিয়ম পদ্ধতিতে কি তোমরা মেঘ তৈরি করে পানি বর্ষাতে পার? নাকি আমি তা করে থাকি। (সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৬৮-৬৯)

০৫. যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে সমুদ্রের ভেতর থেকে লোনা পানি বাষ্পাকারে তুলে নিয়ে লোনাপানির মেঘ বানাতে পারতাম এবং বৃষ্টির পানিকে লোনা করে দিতে পারতাম। তোমাদের ক্ষতি হবে বলে তা করি না। তবু তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো না। (সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭০)

০৬. হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যক সালাতের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করে নাও। তোমরা আহার করো ও পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা আরাফ ৭:৩১)

পানি যেহেতু আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত, সেহেতু পানির সংরক্ষণ এবং এর সদ্ব্যবহার আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এমনকি অজুর সময়ও যাতে পানির অপচয় না হয়, সেদিকে রসুল (সা.) সতর্ক করেছেন।

০১. একদিন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ওজু করার সময় রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। রসুলাল্লাহ (সা.) বললেন, 'পানির এই অপচয় কেন?' সাদ (রা.) বললেন, 'অজুতেও কি অপচয় আছে?' তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতেও থাকো।' (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২৫)

০২. রসুল (সা.) বলেছেন, 'পানি, আগুন ও বাতাস মানুষকে সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে' (সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ এগুলোর উপরে সকলের অধিকার থাকে।

আমরা আল্লাহর দেওয়া নীতিনির্ভর যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি সেখানে পানিসম্পদ ও মৎস্য খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে:

০১. জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন: পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী নীতি প্রণয়ন করা হবে। এটি জল ব্যবস্থাপনা, সেচ এবং পানি দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা এবং আইন তৈরির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। নাগরিকদের নীতি সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে তাদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা হবে। এই নীতির আওতায় পানির অপচয় রোধ, পুনর্ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। **সুপেয় পানি প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তাদেরকে যেন বোতলজাত পানি কিনে খেতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের প্রস্তাবিত পানি নীতির লক্ষ্য হবে- সবার জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করা।**

০২. **বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতির পুনরুদ্ধার:** বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জেনেটিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজাতি ফিরিয়ে আনা হবে। এর জন্য আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন, বিশেষ প্রজনন কেন্দ্র নির্মাণ, বৃহদায়তন জলাশয় নির্মাণ এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ের পরিবেশ উন্নয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি শুধু মাছের সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, বরং খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

০৩. **মৎস্যচাষের নতুন প্রযুক্তি:** কেবল প্রাকৃতিক জলাধারের মাছ দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়। তাই টেকসই মাছ চাষ নিশ্চিত করতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পুরনো এবং অকার্যকর জলাশয়গুলো সংস্কার, জলাশয় আধুনিকীকরণ, আধুনিক পুকুর ব্যবস্থাপনা, উন্নত মানের মাছের খাদ্য এবং জেনেটিক সহায়তার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের আমিষের চাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

০৪. **নতুন জাত উদ্ভাবন:** উচ্চ উৎপাদনশীল মাছের নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য মৎস্য গবেষণায় বিশেষায়িত কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। উন্নত জাত উদ্ভাবনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্রসব্রিডিং পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে, যা মাছের দ্রুত বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করবে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে মাঠপর্যায়ে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ পরিচালনা করা হবে। এসব জাতের কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যা টেকসই উৎপাদন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

০৫. **পানিদূষণ রোধ:** পানিদূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে, বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্জ্য শোধন সিস্টেমের জন্য কঠোর নীতি আরোপ করা হবে। পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালা এবং প্রচারাভিযান চালানো হবে। এ ছাড়াও দূষিত পানি শোধন প্রযুক্তির (Water Purification Technology) উন্নয়ন করা হবে এবং তা প্রয়োগের জন্য স্থানীয় সরকারকে উৎসাহিত করা হবে। নিয়মিত পরিবেশ পরিদর্শন ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে দূষণ কমানো সম্ভব হবে, যাতে পরিবেশ এবং জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।

০৬. **জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য আইন প্রণয়ন:** জলাশয় সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা হবে, যা জলাশয়ের মালিকানা এবং ব্যবহারের সীমানা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবে। অবৈধ দখল, ভরাট এবং বর্জ্য ফেলা রোধে স্থানীয় প্রশাসন

ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে তদারকি করবে। নিয়মিত পরিদর্শন চালানোর পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে জলাশয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

০৭. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা:** জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে পুনর্নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি, জীবাশ্ম জ্বালানি কমানো এবং বনভূমি সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা করতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য উপকূলীয় বাঁধ, টাইডাল ব্যারেজ নির্মাণ, ড্রিপ সেচ ও সোলার পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পানি সংরক্ষণের জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ভূগর্ভস্থ জল পুনরুদ্ধারের কৌশল গ্রহণ করা হবে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

০৮. **নদী ও জলাশয়ের পুনরুদ্ধার:** নদী, খাল ও জলাশয়ের পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এর আওতায় দখলমুক্তি, পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, খাল খনন, নদীর নাব্য পুনরুদ্ধার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। সেখানে বর্তমানে যারা বাস করছে তাদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলো কার্যকর করা হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি নদী, খাল ও জলাশয় যেন সুরক্ষিত থাকে সেজন্য জনগণের মাধ্যমেই তদারকি ও মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

০৯. **মৎস্য গবেষণা বৃদ্ধি:** মাছের পুষ্টি ও স্বাদ উন্নত করার জন্য এবং পুনরুদ্ধারের জন্য গবেষণা চালানো হবে। বিলুপ্তপ্রায় মাছের সংখ্যা বৃদ্ধিতে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রজাতি শনাক্ত করে কয়েক বছরের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হবে এবং প্রাকৃতিক জলাশয়ে দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করে মাছের প্রজনন উন্নত করা হবে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছ জলাশয়ে ছাড়া হবে এবং অভয়ারণ্য (Fish Sanctuary) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি উন্নত করা হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে মাছের পুষ্টি ও স্বাদ পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে এবং নিয়মিত নজরদারি ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এই উদ্যোগ কার্যকর রাখা হবে।

১০. সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ: বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় পানির সংকট, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের নিম্নগামিতা, সেচের পানির অসম বণ্টন, পানির অপচয়, সঠিক পরিমাণে পানি না পাওয়া এবং বিদ্যুৎ বা জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়সহ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধানে সেচ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি, সোলার পাম্পের মাধ্যমে শক্তি সাশ্রয়, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং পানি পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিতে পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

১১. নদীতে বাধ নির্মাণ: 'যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের বেশি পানি ধরে রাখে, সে যেন অন্যকে তা থেকে বঞ্চিত করে; এটি অন্যায়।' (ইবনে মাজাহ) আন্তর্জাতিক আইনেও অভিন্ন নদীর উপর বাধ নির্মাণ করে কোনো দেশ একচেটিয়াভাবে পানি প্রত্যাহার করে ভাটির দেশকে পানিবঞ্চিত করার অধিকার রাখে না। এটি হচ্ছে জাতিসংঘের জলবণ্টন সংক্রান্ত চুক্তি যা ১৯৯৭ সালে গৃহীত Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses নামে পরিচিত। এই নীতি অনুসারে কোনো ব্যক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ নদী-নালা বা খালের পানিকে বাধ দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে পারে না, নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

মানুষের সার্বভৌমত্বের সাথে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রকৃতিগত পার্থক্য হল, মানুষের তৈরি প্রতিটি ব্যবস্থাই শুরুতে পূর্বের ব্যবস্থা থেকে ভাল ফল দেয়। কিন্তু ক্রমেই অন্যায়, অপরাধ ও অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে তা একসময় পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলে এবং শান্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ফলে সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এভাবে যতই দিন যেতে থাকে অপরাধের পরিমাণ ততই কমতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অন্যায় অপরাধ প্রায় নির্মূল হয়ে যায়, সমাজ হয়ে যায় পূর্ণ শান্তিময়।

এমামুযযামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment and Climate)

বিশ্বব্যাপী বন সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে, পরিবেশ ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রতিটি দেশের মোট জমির ২৫% থেকে ৩০% বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আমাদের বনভূমি উজাড় করে ফেলা হচ্ছে। রসুলাল্লাহ (সা.) এক হাদিসে বলেছেন: 'যদি কেয়ামত শুরু হয়ে যায় আর তোমাদের হাতে কোনো ছোট গাছের চারা থাকে, তবে যদি সম্ভব হয়, সেটি রোপণ করবে।' (মুসনাদে আহমদ)। বন উজাড় করার পাশাপাশি নদীনালা, খালবিল, জলাশয় ভরাট করে সেখানে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। ফলে বন্যা, জলমগ্নতা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন, পাহাড় ধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে আমাদের পড়তে হচ্ছে নিয়মিত। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো থেকে রক্ষা পেতে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে:

০১. **বনভূমি সংরক্ষণ ও বনায়ন:** দেশের মোট জমির ২৫%-৩০% বনভূমি নিশ্চিত করা হবে এবং বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বনভূমি বৃদ্ধি করা হবে।

০২. **জলাশয় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন:** ভরাট হওয়া জলাশয় চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার করা হবে এবং সেখানে বর্তমানে যারা বাস করছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। পুনরুদ্ধার করা জলাশয়গুলো মৎস্যচাষের উপযোগী করে স্থানীয় চাষীদের বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

০৩. **নৌ-চলাচল উন্নয়ন:** খালগুলোর নৌ-চলাচল উপযোগী করা হবে এবং নদীভিত্তিক চ্যানেল উন্মুক্ত করা হবে। এতে সড়কপথের চাপ কমবে, পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে এবং বায়ু দূষণ কমবে। নৌবন্দর নির্মাণের মাধ্যমে নৌপরিবহন ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে।

০৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা:** প্রাকৃতিক ও শিল্পজাত সম্পদ দেশের চাহিদা পূরণের পর বিদেশে রপ্তানি করা হবে, যাতে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

০৫. **অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রতিরোধ:** অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধে আবাসিক, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক এলাকা পৃথকভাবে গড়ে তোলা হবে। আধুনিক নগর পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার কৌশল প্রয়োগ করা হবে, যাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Agriculture and Food Security)

আল্লাহ বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (সুরা বাকারা ২:২৯)। ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল সব প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর (সুরা হুদ ১১:৬)। যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে (সুরা বাকারা ২:২২)। আমি জমিনে মাটির ভিতর বীজ বপন করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য রিজিক সৃষ্টি করেছি (সুরা আরাফ ৭:৫৮)। তোমরা সাগর থেকে তাজা গোশত (মাছ) আহার করো এবং আহরণ করো মণি-মুক্তা যা তোমরা পরিধান করো (সুরা ফাতির ৩৫:১২)। তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে; আর তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক (সুরা নাহল ১৬:৫)।

এই আয়াতগুলোতে কৃষির (Agriculture) বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। মানুষের আদি পেশা হচ্ছে কৃষি। মানুষ যতই শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হোক না কেন, দৈনন্দিন জীবনে যতই 'ডিজিটাল' হোক না কেন, কৃষিকাজ থেকে কখনোই মানুষ বিরত হতে পারে না। কারণ তাকে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করতেই হবে, আর সেজন্য কৃষি ছাড়া খাদ্যের কোনো উৎস হতে পারে না। করোনা মহামারীর সময় পৃথিবীর সব মানুষই এই সত্যটি খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছে। সে সময় পৃথিবীর প্রতিটি দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য কৃষিকাজের দিকে মনোযোগ দিয়েছে এবং বিদেশে খাদ্য রপ্তানি সীমিত করে দিয়েছে। ইসলাম প্রাকৃতিক দীন। তাই ইসলাম কৃষিকাজ ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে। ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায়, **মদিনার হিজরত-পরবর্তী সময়ে রসুলাল্লাহ জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ ও পশুপালনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা মদিনায় স্থাপিত মুসলিম উম্মাহর খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান ও অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে সহায়তা করেছিল।** মদিনায় তাঁর নিজেরও খেজুরের বাগান ছিল, যদিও তিনি সেটা দরিদ্রদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর উট ও ছাগলের খামারও ছিল। তিনি যেসব জমিতে চাষ করা কষ্টকর সেসব জমির ক্ষেত্রে মুসাকাত (সেচকার্য) বা মুজারা (বীজ ও ফসল বণ্টন) ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা জমির মালিক

ছিলেন না তাদেরকে অন্যের জমি আবাদ করে ফসলের অংশীদার করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে বা ফসল ফলায় এবং মানুষ, পাখি বা কোনো প্রাণী তা থেকে উপকৃত হয়, তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে' (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)।

রসুলাল্লাহর পরে খলিফারাও কৃষি উন্নয়নের জন্য খাল, কূপ এবং অন্যান্য জলাশয়ের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। খলিফা উমর (রা.) মিশর, ইরাকসহ বিভিন্ন অঞ্চলে খাল খননের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছিলেন। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য 'সাকিয়া ও শাদুফ' এর মতো যন্ত্র ব্যবহার করে শুষ্ক অঞ্চলেও ফসল ফলানোর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। বিস্তীর্ণ মুসলিম ভূভাগের বিভিন্ন এলাকা থেকে উন্নত ফসলের বীজ সংগ্রহ করে অন্যত্র সেগুলো আবাদ করার ব্যাপারে তারা খুবই উদ্যমী ছিলেন। মুসলিম শাসকেরা কৃষিবিজ্ঞনের গবেষণাকে উৎসাহিত করেন। কৃষিবিদ্যায় আল-ফারাবি এবং ইবনে ওয়াহশিয়ার মতো বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তাঁরা ফসলের রোগ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল এবং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। ৯ম শতাব্দীতে পারস্যের মুসলিম বিজ্ঞানীরা নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসাবে বায়ুকল (Windmill) উদ্ভাবন করেন যা মধ্যযুগের কৃষি ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

০১. **অর্গানিক পদ্ধতি প্রবর্তন:** নিরাপদ কৃষি পণ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষির সকল শাখায় ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক বা অর্গানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করার টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পশুখাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য, জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পরিহার করে সবকিছুর জন্য জৈব উৎস ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) পদ্ধতির প্রবর্তন করা যেতে পারে।

০২. **ভিত্তিবীজ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ:** আমাদের আঞ্চলিক কৃষিব্যবস্থায় ভিত্তিবীজ (বেছন) সংরক্ষণের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যে কাজটি সাধারণত গৃহস্থ পরিবারের নারীরা করতেন। এ কাজে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমানে পুঁজিপতিদের বীজবাণিজ্যের আগ্রাসনে ভিত্তিবীজ আমাদের কৃষিব্যবস্থা থেকে বিলুপ্তপ্রায়। এতে করে দেশীয় বহু প্রজাতির শস্যবীজ একেবারে হারিয়ে গেছে। সেসকল বীজ পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

০৩. **উৎপাদন অথবা অধিগ্রহণ:** উৎপাদনের যোগ্য এক ইঞ্চি মাটিও উৎপাদনের বাইরে থাকবে না। হয় জমির মালিক চাষাবাদ করবে, অথবা সেটা রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করবে। জমিদারি প্রথার মতো একক মালিকানায় কেউ হাজার হাজার একর জমি

করায়ত্ত করে রাখতে পারবে না। রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন: 'যার কাছে জমি আছে, সে যেন তা আবাদ করে; যদি না পারে তবে যেন অন্যকে আবাদ করার জন্য দিয়ে দেয়, যেন তা অনাবাদী না থাকে।' (সহিহ বুখারি ২৩২০)। অন্যত্র নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জমি আবাদ করার জন্য পায়, অথচ তা আবাদ করে না, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।' (সহিহ মুসলিম)

০৪. **দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ:** দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের সকল আবাদযোগ্য জমিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে হবে। যে সমস্ত জমিতে রবিশস্য উৎপন্ন হয় যেমন ধান, গম, ভুট্টা, যব, ডাল, আলু ইত্যাদি খাদ্যশস্য চাষ করা যায়, সেগুলোতে কোনোভাবেই তামাক চাষ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

০৫. **কৃষিজমি সংরক্ষণ:** নগরায়ণের নামে হাজার হাজার একর কৃষিজমি ধ্বংস করা যাবে না। কৃষিজমি কৃষিকাজেই ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি কৃষিজমির উর্বরতা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৬. **শস্য কর ও ফসল বিতরণ:** যারা কৃষি উৎপাদন করবে তারা ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, 'তিনিই শস্যক্ষেত্র ও সবজি বাগান সৃষ্টি করেছেন এবং সে সমস্ত লতা জাতীয় গাছ যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও বিভিন্ন আকৃতি ও স্বাদের খাদ্যশস্য। এবং জলপাই জাতীয় ফল ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- যা একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন তা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং ফসল তোলার দিনে এগুলোর হক আদায় করো। কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (সুরা আন'আম ৬:১৪১)। কৃষক যা কিছু চাষ করে তা ফল বা ফসল যাই হোক, সেটা কাটার দিন (ইয়াওমুল হাসাদ) এর হক আদায় করতে হবে। সেই হক হচ্ছে- এর একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাব করে গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিতে হবে। সমাজে সাম্য ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এই পদ্ধতি ইসলামে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার নাম ওশর।

০৭. **জমি দখল নিষিদ্ধ:** কেউ অন্যের জমি দখল করতে পারবে না। করলে সেই জমি ফেরত দিতে হবে এবং জরিমানা দিতে হবে। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করবে, কেয়ামতের দিন তা তার গলায় বেঁধে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি)

০৮. **কৃষকদের কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা:** কৃষকদেরকে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রদান করতে হবে এবং কৃষিবিদদের দাপ্তরিক কাজের পরিবর্তে মাঠভিত্তিক কাজে নিযুক্ত করতে হবে। কৃষকদেরকে তাদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

লক্ষ রাখতে হবে যেন কৃষিপণ্যে উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে, সার, বীজ, সেচ ইত্যাদি ঠিকমতো না পেয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে বা অন্য কোনো কারণেই কৃষকরা পেশা পরিবর্তন না করে।

০৯. **কৃষকের ন্যায্যমূল্য লাভ:** কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এবং কৃষিকাজে উৎসাহিত করার জন্য ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। এজন্য কৃষকদেরকে সরাসরি বাজারে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং কৃষক ও ভোক্তার মাঝখানে দালালচক্রের দৌরাত্ম বন্ধ করতে হবে। পাশপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষিমেলার আয়োজন করতে হবে, কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। কৃষিপণ্য পরিবহনের ব্যয় সংকোচনের জন্য নদীপথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **বাজার সংকট প্রতিরোধ:** অতিরিক্ত কৃষিপণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুযোগ দেয়া হবে না।

১১. **সুদমুক্ত ঋণ:** কৃষকদেরকে সহজ শর্তে এবং অবশ্যই বিনাসুদে ঋণ দিতে হবে। তাদেরকে সরকার বিনামূল্যে বীজ ও সার প্রদান করবে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ভর্তুকি দিবে। রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে সরকারি উদ্যোগে গ্রাম পর্যায়ে জৈবসার প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে হিমাগার নির্মাণ করতে হবে যেখানে কৃষক স্বল্পব্যয়ে তাদের পচনশীল ফসল সংরক্ষণের সুযোগ পাবে। স্বল্পব্যয়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. **প্রতি বাড়িতে খামার:** প্রতিটি গ্রামীণ বাড়িকে ছোট খামারবাড়িতে পরিণত করতে উৎসাহ দেওয়া হবে। পরিবারগুলোকে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া পালন এবং বাড়ির আঙিনায় সবজি ও ফলমূল চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে বিনা সুদে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা দেওয়া হবে। এ প্রকল্প তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে।

১৩. **সার ও কীটনাশক ব্যবহার:** ক্ষতিকর কীটনাশক ও অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করা হবে যেন ফসল হয় বিষমুক্ত ও প্রাকৃতিক।

১৪. **মৎস্য উৎপাদন:** প্রতিটি পুকুর, জলমহালকে সংস্কার করে মৎস্য উৎপাদনের আওতায় আনা হবে। মাছের পোনা ছাড়ার পাশাপাশি কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব রোধে আইন কার্যকর ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

যোগাযোগ ও পরিবহন
(Communication and Transport)

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র কাঠামোতে সড়ক পরিবহন ও সড়ক উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ ক্ষেত্রে একটি আলাদা কর্তৃপক্ষ অবশ্যই থাকবে, যাদের কাজ হবে আধুনিক যানবাহনের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ, নতুন প্রযুক্তির সংযুক্তি ও সমন্বয় করা, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যমান সড়কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা। তারা যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণ করবে, সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে, যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা বা আইন লঙ্ঘনের তদন্ত করবে এবং সড়ক ব্যবস্থাপনা ও যানবাহন মান নিশ্চিতকরণে তদারকি করবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে অতিরিক্ত ভাড়া কিংবা কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো যাত্রী প্রতিবাদ করলে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে হেনস্থা এমনকি মারপিট করতেও দেখা যায়। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে যাত্রী আর পরিবহন স্টাফদের মধ্যে প্রতিনিয়ত মারামারি থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগ ও খুনোখুনি পর্যন্ত হচ্ছে। গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, ট্রাকের নিচে ফেলে হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছে। গণপরিবহন খাতে চলমান লুটপাট, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, অবিচার, জুলুম চিরতরে বন্ধ করতে হবে। চালক, পরিবহন মালিক এবং রাস্তায় চলাচলকারী সব শ্রেণির মানুষের জন্য নিরাপত্তা নীতি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।

যারা অর্থবিত্তের মালিক তারা সবাই একেকজন একাধিক গাড়ি ব্যবহার করছে। অনেকের পরিবারের সবার আলাদা আলাদা গাড়ি আছে। এসব গাড়ি অতিরিক্ত যানজট সৃষ্টি করছে। কেউ যেন অতিরিক্ত যানবাহন নিজেদের জন্য ব্যবহার করে যানজট সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে পরিবহন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। সড়ক ও পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছেঃ

০১. গাড়ির ফিটনেস এবং চালকের প্রশিক্ষণ: কোনো আনফিট গাড়ি কোনোভাবে রাস্তায় চলার লাইসেন্স পাবে না। কোনো চালক যথোপযুক্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ ছাড়া গাড়ি চালাতে পারবে না।

০২. পরিবেশবান্ধব গাড়ি: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশবিদগণ বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জোর তাগিদ দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারকারী গাড়ি তৈরি ও আমদানি করা হবে। কোনোভাবেই উন্নত দেশ থেকে রিজেক্টেড ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাড়ি আমদানির সুযোগ রাখা হবে না।

০৩. রাস্তার ব্যবহারের সমান সুযোগ: রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ এবং সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটকে রেখে সাধারণ যাত্রীদের যান চলাচল বন্ধ করা যাবে না।

০৪. পরিবহন শ্রমিকদের অধিকার: কোনো পরিবহন শ্রমিক তার ন্যায্য দাবি ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না। কোনো পরিবহন শ্রমিককে তার সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

০৫. মাদকমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা: মাদকের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনভাবেই গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না।

০৬. ভাড়া নির্ধারণ: অতিরিক্ত মুনাফার জন্য পরিবহন মালিকরা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করতে পারবে না। পরিবহন ব্যয় ও গন্তব্যের দূরত্বের পাশাপাশি জনগণের আয় ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিবেচনায় প্রতিটি পরিবহনের ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। পরিবহন মালিকরা যেন যার যেমন খুশি ভাড়া আদায় করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকবে। ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি হতে হবে স্বচ্ছ যেন জনগণ বুঝতে পারে কীভাবে ভাড়া নির্ধারিত হচ্ছে। আর সেটা সরকার জনসম্মুখে প্রকাশ করবে। যাত্রীরা যেন কর্তৃপক্ষকে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে তার জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

০৭. টোল-ট্যাক্স ও রাস্তা ব্যবহার: রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় টোল-ট্যাক্স ইত্যাদি বসিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করা যাবে না। সরকারি বাজেটের মাধ্যমে সড়ক উন্নয়ন, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যকর করে টোলমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

০৮. রাস্তা সংস্কার এবং উন্নয়ন: উন্নয়নের নামে রাস্তা নির্মাণ কিংবা সংস্কার কার্যক্রম বছরের পর বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। এ ব্যাপারে রসুল (সা.) বলেছেন, 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও ইবাদত।' (বুখারি, হাদিস : ২৫১৮)

০৯. **গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ:** কোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো গতিতে গাড়ি চালাতে পারবে না। গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গতি সীমা ও দ্রুতগতির সিগন্যাল সিস্টেম তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে গতি সীমাবদ্ধকরণ অত্যন্ত জরুরি।

১০. **সড়ক পুলিশ প্রটোকল:** সুনির্দিষ্ট কারণ ও তথ্যপ্রমাণ ছাড়া সড়ক পুলিশ যাকে ইচ্ছা সড়কে থামিয়ে নাগরিক অধিকার বিঘ্নিত করতে পারবে না। এজন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রটোকল ও প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।

১১. **রাস্তা ও যানবাহন অনুমোদন:** কর্তৃপক্ষ রাস্তার অবস্থা, জনসংখ্যার চাপ, সড়কের পরিকাঠামো এবং যানজট ইত্যাদি বিবেচনা করে কোন ধরনের কতটি যানবাহন রাস্তার জন্য অনুমোদন দেওয়া যায় তা সিদ্ধান্ত নেবে।

১২. **ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ:** যানজট, গাড়ির সংখ্যা, পরিবহন খরচ এবং পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণপরিবহনের উন্নত পরিবেশ, সেবা এবং মান নিশ্চিত করা হবে, যা মানুষকে ব্যক্তিগত যানবাহনের পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।

১৩. **জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার এবং আইন মানার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষত, শিক্ষার্থীদের এবং তরুণদের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

১৪. **ফুটপাথ ও রাস্তার জমি উদ্ধার:** বেদখল হওয়া সরকারি সড়কের জমি পুনরুদ্ধার করা হবে, ফুটপাথ দখল করে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। সড়কের পাশে সরকারি জমিতে ফল ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হবে যা ছায়া ও ফল প্রদান করবে।

১৫. **রেল যোগাযোগ:** রেল এমন একটি পরিবহন মাধ্যম যা গ্রামীণ কৃষিপণ্যসহ সব ধরনের ভারী মালামাল পরিবহন করতে সক্ষম। এটি পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে সহায়ক। তাই যাত্রী ও পণ্যের পরিবহন খরচ কমাতে নৌপথের পাশাপাশি রেল যোগাযোগকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এই খাতে বিনিয়োগ করা হবে। বিদ্যমান রেলওয়ে অবকাঠামো পুরোপুরি ব্যবহার করা হবে, অকার্যকর লাইনগুলো মেরামত করা হবে এবং সম্ভব হলে প্রতিটি জেলা ও থানা এলাকায় নতুন রেললাইন স্থাপন করা হবে। ট্রেনের গতি বাড়ানো, নতুন সিগনালিং সিস্টেম এবং উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। শহরাঞ্চলে ও শহরতলীতে দ্রুত যাত্রী পরিবহণের জন্য বৈদ্যুতিক কমিউটার ও মেট্রোরেল চালু

করা হবে। একই সঙ্গে সোলার পাওয়ার বা অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে। রেল পরিষেবা উন্নত করতে ট্রেনের স্টেশন, আসন ব্যবস্থাপনা এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

(Power, Energy and Mineral Resources)

অন্যান্য সম্পদের মতই ইসলাম প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ মানব সভ্যতার প্রয়োজন, স্থিতি ও প্রগতির জন্য এ পৃথিবী সম্পদরাজি দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে জলে-স্থলে, ভূ-পৃষ্ঠের অতল গভীরে অসংখ্য মহামূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। তেমনি সমুদ্রগর্ভে রয়েছে অসীম পরিমাণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ। মূলত, পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ অগ্নি, বায়ু, পানি সম্পদ, মৎস্য, পাহাড়-পর্বত, প্রাণীজগৎ, বনজ সম্পদ, নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস, কয়লা, শিলা, লোহা, হার্ডরক, চুনাপাথর, বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান বালি, হীরক, গ্রানাইট, জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এ সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসাবে এগুলোর আমানতদার।

রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'তিনটি জিনিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। সে জিনিসগুলো হচ্ছে পানি, ঘাস ও আগুন' (আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারি-২৩৫০, মুসলিম-১৫৬৫)। এই হাদিসের মূল বার্তা হলো, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সবার জন্য উন্মুক্ত এবং এগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। এগুলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয় এবং এর ওপর সবার সমান অধিকার রয়েছে। এই তিনটির অন্যতম হচ্ছে আগুন অর্থাৎ জ্বালানি। একে আল্লাহ তাঁর একটি নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে আমি সবুজ গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছি, আর তা দিয়ে তোমরা আগুন জ্বালাও?' (সুরা ইয়াসিন ৩৬:৮০)। খনিজ সম্পদ লোহা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা।' (সুরা হাদিদ ৫৭:২৫)।

ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে এ সকল সম্পদের সংরক্ষণ, আবিষ্কার, আহরণ-উত্তোলন এবং যথাযথ ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে মানবজাতি উপকৃত হবে। বিশেষ করে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য জ্বালানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে:

০১. জ্বালানি জাতীয় সম্পদ: জ্বালানিকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হবে, যা ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে না। এই সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং

বিতরণ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হবে, যাতে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

০২. **ফসিল জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস:** পরিবহন, শিল্প এবং গৃহস্থালিতে ফসিল জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। গণপরিবহন হিসাবে বৈদ্যুতিক যানবাহন চালু করার মাধ্যমে গ্রিন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তৈরি করা হবে। পাশাপাশি হাইব্রিড গাড়ির উপর ট্যাক্স কমানো হবে, যা পরিবহন খাতে জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও সহায়ক হবে।

০৩. **নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্প্রসারণ:** সূর্যের আলো কাজে লাগাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে, যা জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। বায়ুশক্তি এবং জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস সম্প্রসারিত করা হবে, ফলে দেশব্যাপী শক্তির সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে এবং গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নেও সহায়তা করবে।

০৪. **বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সময় ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করতে অফিস, আদালত এবং মার্কেটের কাজ সূর্য ওঠার পরপরই শুরু করা হবে এবং সন্ধ্যার আগেই সেগুলোর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে যেন দিনের আলোর পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। একইভাবে কৃষিকাজ, নির্মাণকাজ এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজ দিনের আলোতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া বাড়ির নকশায় সকল ফ্লোরে সূর্যের আলো পৌঁছানোর উপায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা বাড়ির বিদ্যুৎ খরচ কমাতে সাহায্য করবে। হাসপাতালসহ বিভিন্ন জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হবে।

০৫. **সৌর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার:** দেশের রাস্তা, বাজার, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সৌর শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। রাস্তার মাঝে সৌরবাতি স্থাপন এবং কৃষি কাজে সোলার পাম্প ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে। গ্রামীণ স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা হবে এবং নতুন পুরাতন সকল ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। এতে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়বে।

০৬. **অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে জ্বালানি:** দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও খনি থেকে উত্তোলিত জ্বালানিকে প্রথমে স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং অতিরিক্ত জ্বালানি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হবে।

০৭. **জ্বালানির অপচয় রোধ:** অপচয় রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে এবং তা কার্যকর করা হবে। শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য জনগণের মধ্যে

সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে এবং আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে, যাতে তারা শক্তি সাশ্রয়ী পণ্য এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়।

০৮. **গবেষণা ও উদ্ভাবন:** নবায়নযোগ্য জ্বালানির নতুন উৎস আবিষ্কার এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়নে গবেষণা বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে, তরল জৈব জ্বালানি (Biofuels) এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎস নিয়ে গবেষণা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ে শিক্ষাক্রম চালু করা হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই খাতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

০৯. **জনসচেতনতা সৃষ্টি:** জনসাধারণকে জ্বালানির অপচয় রোধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে নিয়মিত প্রচারণা চালানো হবে। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে সবাই এই নীতির গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

১০. **শক্তি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলগুলির মধ্যে শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পর্ক জোরদার করা হবে। শক্তির উৎসের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা হবে, যাতে কোনো একটি উৎসে অস্থিরতা বা সংকট সৃষ্টি হলে অন্য উৎস থেকে শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

১১. **স্মার্ট গ্রিড এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার:** শক্তি ব্যবস্থাপনাকে (Energy management) নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য স্মার্ট গ্রিড এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে (Electricity distribution system) উন্নত করে এবং শক্তির চাহিদা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে, যা শক্তির অপচয় কমায়, সিস্টেম লস ও সিস্টেম ফেইলিওর (System failure) হ্রাস করে। ডিজিটাল প্রযুক্তি, যেমন রিয়েল-টাইম ডাটা ম্যানেজমেন্ট, শক্তি ব্যবহারের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Energy monitoring and control) আরও নিখুঁতভাবে করতে সহায়তা করবে, ফলে শক্তির ব্যবহারে অধিক দক্ষতা অর্জন সম্ভব হবে।

১২. **গ্রামীণ এলাকায় স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ ও প্রণোদনা:** গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎকে অত্যন্ত সহজলভ্য করা হবে, যা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে, যাতে জনগণ এদিকে আগ্রহী হয় এবং এনার্জি সেভিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

পর্যটন শিল্প (Tourism Industry)

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, পাহাড়, হাওরসহ বাংলাদেশে রয়েছে পর্যটনের জন্য বহু দৃষ্টিনন্দন ও ঐতিহাসিক স্থান। ছোট্ট এই দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে অন্তত ১৭০০ পর্যটন স্পট। কিন্তু নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত এই পর্যটন খাত কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারছে না। আমরা আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় পর্যটন খাতের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি এগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় তুলে ধরেছি।

পর্যটন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। পর্যটকরা স্থানীয় নন এবং তাদের কাছে নগদ টাকা থাকে বলে প্রায়ই তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন ছিনতাই, চুরি, ডাকাতির শিকার হন, অনেক সময় নারী পর্যটকরা যৌন হয়রানিরও শিকার হন। এসব কারণে আমাদের দেশে পর্যটকরা প্রচুর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এছাড়া দেশের নিয়মিত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিদেশি পর্যটকরা বাংলাদেশকে আরো বেশি অনিরাপদ মনে করেন। আর পর্যটন অবকাঠামো বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ আবাসন ব্যবস্থা (হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, ক্যাম্পিং), পরিবহন ব্যবস্থা (সড়ক, বিমান, রেল, নৌযান), পর্যটন সেবা প্রতিষ্ঠান (ট্রাভেল এজেন্সি, ট্যুর অপারেটর, গাইড, বিনোদন, রেস্টুরেন্ট, নিরাপত্তা) ইত্যাদির দিক থেকে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান ১০৯তম। দীর্ঘ যানজটের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পর্যটন কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো ও সেবার মানও খুবই নিম্নমানের। এছাড়া পর্যটকদের সঠিক তথ্য প্রদান করার জন্য ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদির অভাবে পর্যটকরা বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন। তাছাড়া **অনলাইনে বাংলাদেশ সম্পর্কে সার্চ করলে বস্তির নোংরা ছবি, বুড়িগঙ্গার দূষিত পরিবেশের ছবি আগে চলে আসে যা কখনওই বাংলাদেশের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে না।** পর্যটন খাতে পিছিয়ে থাকার আরেকটি কারণ হল অপর্যাপ্ত সরকারি বাজেট। বরাদ্দ যতটুকুও থাকে সেটাও দুর্নীতির কারণে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। ফলে পর্যটন খাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যায়। লোকসানের ঝুঁকি কমাতে অনেক পর্যটন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতে ইজারা দেওয়া হয়। তবে ইজারা নেওয়ার পর এই কেন্দ্রগুলোর প্রবেশ ফি এবং সেবার মূল্য এত বেশি নির্ধারণ করা

হয় যে, সেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য হাতের বাইরে চলে যায়। বর্তমানের এই দুর্মূল্যের যুগে ভ্রমণের ব্যয় বহন করা বিত্তবান শ্রেণির পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে। ভ্রমণ করতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য নেই বেশিরভাগ মানুষের। বিশেষ করে দূরে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সেখানে হোটেল ভাড়া করে দু চারদিন থাকা নিম্ন আয়ের মানুষের কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু ইসলাম সমাজের দরিদ্রতম মানুষটিকেও নিরাপদে দেশ ভ্রমণের শখ পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছিল।

ভ্রমণের আরবি হলো সফর, ছায়ের, রেহলাত ইত্যাদি। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হজ অর্থও ভ্রমণ এবং ওমরাহ অর্থও ভ্রমণ। ভ্রমণ একটি আনন্দময় ইবাদত এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার উৎস। সফর বা ভ্রমণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তীদের কীর্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে জানা ও শিক্ষা গ্রহণ করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ও দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। (সুরা ইউসুফ ১২:১০৯, সুরা মুমিন ৪০:২১, ৮২)।

ভ্রমণ বা সফরের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-রহস্য অবলোকন করে জ্ঞানার্জন করা এবং তাঁর কুদরত ও শক্তির প্রতি অনুগত হওয়া। এ বিষয়ে পবিত্র কোর'আনে নির্দেশনা রয়েছে, 'তারা দেশ ভ্রমণ করে না? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে হৃদয়।' (সুরা হজ ২২:৪৬, সুরা আনকাবুত ২৯:২০)। এমন আরো বহু আয়াত কোর'আনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যেখানে আল্লাহ মানুষকে ভ্রমণ করার জন্য বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি বলেছেন যাতায়াত ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাহন ও পরিবহন আল্লাহর কুদরতেরই অংশ। তিনি বলেন, 'তাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, যেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ওই সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ করো দিবস ও রজনীতে।'' (সুরা সাবা ৩৪:১৮)।

ভ্রমণের ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর কিছু দিকনির্দেশনাও রয়েছে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে মেনে চললে মানুষ অবশ্যই উপকৃত হবে। যেমন রসুলাল্লাহ একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ, নসায়ী ও তিরমিযী)। তিনি বলেছেন, একটি সফরে (ভ্রমণে) অন্তত তিনজন ব্যক্তির একত্রে থাকা উচিত (বুখারী ২৮৩৬)। আর সেই তিনজনের মধ্যে একজন আমির নির্ধারণ করে নেওয়া আবশ্যক (আবু দাউদ)।

আজ থেকে ১৪শ বছর আগে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সমাজে একজন মানুষকে জীবনযাপনের জন্য এত টাকার প্রয়োজন পড়ত না। এখন যেমন সব কিছুই, এমনকি এক গ্লাস পানিও টাকা দিয়ে কিনতে হয়, সেই সমাজটি এতটা নিষ্ঠুর ও বাণিজ্যিক ছিল না। বরং সেখানে চেনা অচেনা সব মানুষ একে অপরের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে শিখেছিল। এই শিক্ষা আল্লাহর পবিত্র কোর'আন থেকে উৎসারিত। কারণ তিনি মুসাফির অর্থাৎ পথচারী, পর্যটক বা ভ্রমণকারীদেরকে আশ্রয় ও খাদ্য দেওয়ার নির্দেশ যেমন দিয়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য তিনি সরকারি বরাদ্দের ব্যবস্থাও রেখেছেন। যেসকল আয়াতে তিনি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোতে তিনি মুসাফিরদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা হবে পিতামাতা, আত্মীয়, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যা ভালো কাজ করো, আল্লাহ তা জানেন।' (সুরা বাকারা ২:২১৫, ১৭৭, সুরা নিসা ৪:৩৬, সুরা বনি ইসরাইল ১৭:২৬, সুরা রূম ৩০:৩৮)। মুসাফিরদের সাহায্য করার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন কারণ তারা নিজ পরিবার-পরিজনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা থেকে দূরে অনাত্মীয় পরিবেশে অবস্থান করছে। তার মানে এই নয় যে তারা অসহায়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ এক পরিবার। এখানে সবাই নিরাপদ, সবাই আশ্রয়ের দাবিদার। যেখানে তার পরিবার নেই সেখানে জাতির অন্যান্যরা তাকে সকল সহায়তা দেবে। গোটা মানবসমাজে যখন এই সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির প্রচলন হবে তখন তা সকল মানুষকে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করবে। এমন একটি সেবামূলক সমাজ বাণিজ্যিক ভোগবাদের এই যুগে কল্পনা করা কঠিন।

তবে যার সামর্থ্য সীমিত, তার উপর দীর্ঘদিন মেহমানদারির বোঝা চাপানো ইসলামের রীতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আল্লাহর রসুল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, একজন ব্যক্তি মেহমান হিসেবে সর্বোচ্চ তিন দিন তিন রাত কারো বাড়িতে থাকতে পারবে। এর বেশি থাকলে তা মেজবানের অনুগ্রহ বা সদকা হিসেবে গণ্য হবে। রসুল (সা.) আরও বলেছেন, 'কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এতদিন অবস্থান করে যা তাকে গুনাহগার বানিয়ে ফেলে।' সাহাবারা জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রসুল! তাকে গুনাহগার কীভাবে বানায়?' নবিজি বললেন, 'সে তার ভাইয়ের কাছে এতদিন অবস্থান করে যে, তার কাছে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যা দিয়ে মেহমানদারি করা সম্ভব।' (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।

এ তো গেল পর্যটকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা। এবার দেখা যাক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কী বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। আমরা জানি যে বায়তুল মালের জনকল্যাণমূলক তহবিলের একটি অংশ মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ইসলাম একটি সুসংগঠিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। এখানে ধনী ও সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে জাকাত, খুমস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ) এবং অন্যান্য কর সংগ্রহ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রয়োজন মেটানো হয়। বিশেষত মুসাফিররা যখন অসুবিধায় পড়ে তখন তাদের খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আল্লাহ কোর'আনে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, 'যাকাত শুধুমাত্র গরিব, অভাবগ্রস্ত, জাকাতের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে মুজাহিদ এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত।' (সুরা তওবা ৯:৬০)।

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে মুসাফিরদের সহায়তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রসুলাল্লাহ (সা.)-এর সময় মসজিদে নববীতে আসহাবে সুফ্ফা নামে একটি আশ্রয়স্থল ছিল যেখানে মুসাফির, অভাবগ্রস্ত ও সার্বক্ষণিক আল্লাহর রাস্তায় তৎপর সাহাবিরা অবস্থান করতেন। তাদের সমস্ত প্রয়োজন বায়তুল মাল থেকে পূরণ করা হতো। খলিফা উমর (রা.) বায়তুল মাল থেকে মুসাফিরদের খাদ্য, পানীয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। তাদের জন্য তিনি তাঁর শাসনাধীন এলাকাগুলোতে রাস্তার পাশে বহু সরাইখানা অর্থাৎ বিশ্রামের স্থান নির্মাণ করেছিলেন এবং কূপ খনন করে পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তী কয়েক বছরে অন্যান্য মুসলিম শাসকরাও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এসব সরাইখানায় বিনামূল্যে খাবার, বিশ্রাম এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত। স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিরা তাদের উৎপাদিত ফসল থেকে এগুলোতে দান করতেন। ইসলামী শাসনামলে সড়ক ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসন বণিক ও অন্যান্য কাফেলাগুলোর সঙ্গে সরকারি নিরাপত্তা প্রহরীও সরবরাহ করত। এগুলোই প্রমাণ করে যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে পর্যটকদের ভ্রমণকে সহজতর ও নিরাপদ করার জন্য একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এমন নিরাপত্তা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে যে, একা একজন সুন্দরী নারী দিনে ও রাতে স্বর্ণালঙ্কার পরিহিত অবস্থায় ইরাকের হিরা (নাজাফ) থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারত। তার মনে আল্লাহ ও বন্য পশু ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ভয় থাকত না, সম্পদ বা সম্মান কোনো কিছু খোয়া যাওয়ার আশঙ্কা তার মনে জাগত না। এমন ঘটনা সাহাবিদের জামানায় সত্য হয়েছে। প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈয়ের ছেলে আদি ইবনে হাতিমের (রা.) বর্ণিত বোখারী হাদিস

(৩৫৯৫) ও বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে এমন তথ্যই আমরা পাই। [Dr.Qadi-i Seerah of Prophet (s)]

ইসলামের স্বর্ণযুগ (৭ম থেকে ১৫তম শতাব্দী) পর্যন্ত বেশ কয়েকজন মুসলিম পর্যটক বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, যা আজকের দিনে আমাদেরকে সেই যুগের ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা প্রদান করে। তাঁদের মধ্যে ইবনে বতুতা (Rihla, 1355), আল-মাসউদি (Muruj al-Dhahab, 956), ইবনে খুরদাদবিহ (Book of Roads and Kingdoms, ৯ম শতাব্দী), ইবনে জুবায়র (Rihla, 1185), আল-বিরুনী (Kitab al-Hind, 1030) এবং ইবনে ফাদলান (Risala, 922) উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের ভ্রমণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ভূগোল, রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং সমাজচিত্র সম্পর্কে অমূল্য তথ্য প্রদান করেছেন। এছাড়াও, বাণিজ্য রুট, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কেও বিশদ তথ্য দিয়েছেন। অবশ্য কেবল মুসলিম পর্যটকরাই নয়, অমুসলিম পর্যটকরাও মুসলিম বিশ্ব পরিভ্রমণ করে সেই যুগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। যেমন ইতালীয় বণিক মার্কো পোলো (The Travels of Marco Polo, 1299), ইহুদি পর্যটক বেঞ্জাবিন অব টুডেলা (The Itinerary of Benjamin of Tudela, 1173), খ্রিষ্টান মিশনারি উইলিয়াম অব রুব্রুক (Itinerarium, 1255) এবং খ্রিষ্টান মিশনারি জন অব প্লানো কার্পিনি (History of the Mongols, 1247) মুসলিম বিশ্বে ভ্রমণ করেন। তারা মুসলিম বিশ্বের সামরিক শক্তি, প্রশাসনিক দক্ষতা, নগর ব্যবস্থাপনা, স্থাপত্যশৈলী, কৃষি উৎপাদন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি সম্পর্কিত তথ্য তাদের লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

ইসলামের স্বর্ণযুগে অনেক পর্যটকই শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করতেন, কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণকালে তারা কেবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই অর্জন করতেন না, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হতেন। এসব ভ্রমণকারীরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সেখানকার রাজনীতি, কূটনীতি, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। এই কাজগুলো তাদের জীবন-জীবিকার মাধ্যম হয়ে উঠত। যেমন ইবনে বতুতা দীর্ঘ ৩০ বছরের ভ্রমণে বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরেছেন। এসময় তিনি বহু আমির ও সুলতানদের কাছ থেকে প্রচুর সোনার মুদ্রা, পোশাক, খাবার, ঘোড়াসহ বহু উপহার ও সম্মাননা পেয়েছিলেন। তিনি নিজ মেধা ও চরিত্রগুণে শাসকদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন এলাকায় বিচারিক, কূটনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

এসব কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থনৈতিকভাবেও প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। বিভিন্ন শাসকের কাছ থেকে তিনি উপহার পেয়েছেন। দিল্লি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাকে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্ব দেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করেন।

প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ আল-মাসউদী বিভিন্ন সুলতানের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন, বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল (রাজত্বকাল: ৮৪৫-৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) এর দরবারে। আরেক কূটনীতিক ও অভিযাত্রী ইবনে ফাদলান ৯ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশে একটি কূটনৈতিক মিশনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ভলগা অঞ্চলের বুলগার মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের কাছে প্রদান করেন। এ সময় তিনি বুলগার শাসকদের কাছ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, পশুর চামড়া সহ প্রচুর মূল্যবান উপহার লাভ করেন।

তাঁরা সকলেই লিখেছেন যে তারা যেখানেই গিয়েছেন তাদেরকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সাধারণ মানুষ রীতিমত প্রতিযোগিতা করেছে। কারণ অতিথিকে ইসলামিক এলাকাগুলোতে গৃহস্থের জন্য বরকত তথা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করা হত। ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনীতে বহু অজানা অচেনা পরিবারে অতিথি হিসাবে আশ্রয়লাভ ও আপ্যায়িত হওয়ার ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন। চলে আসার সময় কখনও কখনও তাঁকে উপহারও দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি বহু সরাইখানা, মাদ্রাসা ও মসজিদে অবস্থান করেছিলেন যেখানে তাঁকে বিনামূল্যে এবং সম্মানের সাথে খাদ্য ও আশ্রয় প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে **আজ পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার এই যুগে একজন মানুষ লাখ লাখ টাকা নিয়ে ভ্রমণে বের হয় আর নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কারণ তাকে পদে পদে শোষণ করার জন্য বহু মানুষ ফাঁদ পেতে বসে থাকে।** পর্যটক দেখলেই অনেকে তার কাছ থেকে সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের থেকে বেশি গাড়িভাড়া আদায় করা হয়, খাবারের অতিরিক্ত দাম নেওয়া হয়, বিভিন্ন প্রকার সরকারি ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, হিডেন চার্জ তাদের থেকে আদায় করা হয়। শুধু তা-ই নয়, মানহীন পণ্য তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করা হয়। এই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার আর মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থার পার্থক্য।

আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও পর্যটনের ক্ষেত্রে আবার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য আমাদের প্রস্তাবনা হচ্ছে:

০১. **পর্যটনের অধিকার:** পর্যটকদের প্রতি শোষণমূলক মনোভাব পরিহার করে তাদের প্রতি আতিথেয়তা ও সেবামূলক মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই সেবা সুলভে প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। পৃথিবী মানুষের অভিন্ন আবাসভূমি এবং পৃথিবীজুড়ে স্বাধীনভাবে পর্যটন করার অধিকার মানুষের সৃষ্টিগত অধিকার, কারণ স্রষ্টা তাকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করেছেন। কেউ তাকে পর্যটনের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ ও সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। তাই, কোনো দেশ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানগুলোকে কুক্ষিগত করে ফায়দা লুটতে পারে না। রাষ্ট্রকে এই চেতনা ধারণ করে সকলের জন্য সহজে দেশ দেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

০২. **গাইড দক্ষতা উন্নয়ন:** ট্যুর অপারেটর ও গাইডদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে। এই প্রশিক্ষণে ভাষাগত দক্ষতা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান, গ্রাহক সেবা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, সমস্যা সমাধান কৌশল এবং পেশাদারিত্বের গুরুত্ব দেওয়া হবে, যা তাদের পর্যটকদের জন্য আরও কার্যকর ও সন্তোষজনক সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।

০৩. **পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা:** পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে, যেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সিসিটিভি ক্যামেরা, শাটল বাস ও ট্যাক্সি সেবা, মানসম্মত হোটেল ও রিসোর্ট, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, শপিং সেন্টার, সুপারমার্কেট, স্থানীয় খাবারের ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তথ্য কেন্দ্র, দক্ষ গাইড সেবা এবং সহজে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশের সুবিধা।

০৪. **অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ:** পর্যটন ব্যবসার আড়ালে যাতে কোনো প্রকার মাদক, জুয়া, দেহব্যবসা ইত্যাদি অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হয়, সেজন্য পর্যটন ব্যবস্থাপনায় কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে। এছাড়াও, পর্যটকরা যেন বন্যপ্রাণী শিকার বা পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি না করেন, সে বিষয়েও কড়া নজরদারি থাকবে। কেউ যেন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে অবৈধ বন্যপ্রাণী, অবৈধ বা নকল পণ্য, অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি না করতে পারে, সেটাও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই সব কার্যক্রমে সহায়তা হিসেবে ট্যুরিস্ট পুলিশ নিয়োজিত থাকবে, যারা পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করবেন এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি রাখবেন।

০৫. **পর্যটকের সম্মান ও নিরাপত্তা:** বিদেশি পর্যটকদের সম্মান দেওয়া ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। কারণ এটি কেবল রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা কেবল ট্যুরিস্ট পুলিশের কাজ নয়। পর্যটকদের মালামাল চুরি, হয়রানি, প্রতারণা, তাদের থেকে অতিরিক্ত দাম আদায় বা যে কোনোভাবে তাদের জানমালের ক্ষতি সাধনের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। শিক্ষাব্যবস্থায়

পর্যটকদের সঙ্গে সঠিক আচরণ শেখানো হবে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে পর্যটকদের সম্মান ও নিরাপত্তা বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হবে, সবাই যাতে বুঝতে পারে বিদেশি পর্যটকদের সম্মান দেশের ভাবমূর্তি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে। যদি কেউ তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে, তাকে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা হবে। যদিও কথাগুলো বিদেশি পর্যটকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তবে এটি স্থানীয় পর্যটকদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

০৬. **পর্যটন প্রচার পরিকল্পনা:** বাংলাদেশের পর্যটনকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও ইভেন্টে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। ডিজিটাল মার্কেটিং, সোশ্যাল মিডিয়া, প্রকৃতি ও পর্যটন সংক্রান্ত টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করা হবে। বিশেষ ট্যুর প্যাকেজ এবং অফার তৈরি করে বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। আধুনিক ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হবে, যেখানে পর্যটকরা দেশের পর্যটন গন্তব্য, হোটেল, পরিবহন ব্যবস্থা ও স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সহজে তথ্য পেতে পারবেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল ও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এক নজরে আমাদের মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব
(Our Fundamental Reform Proposal: At a Glance)

এ বইয়ে আমরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব তুলে ধরেছি তা অল্প কথায় পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছিলাম। তথাপি কিছুটা বড় হয়েই গেল। এর কারণ আমরা আসলে নতুন কোনো ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি না, বরং আমরা প্রস্তাব করছি স্রষ্টার দেওয়া সেই আদি-অকৃত্রিম, শাশ্বত, চিরন্তন সেই ব্যবস্থার যা যুগে যুগে, ধাপে ধাপে পৃথিবীতে এসেছে এবং মানুষকে ন্যায়পূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে। আমরা কেবল চেষ্টা করেছি সেই জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন দিককে বিবর্তিত ও আধুনিক জীবনের প্রেক্ষাপটে নতুন আঙ্গিকে, নতুন যুগের বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরতে।

মানুষ যখন আল্লাহর দেওয়া এই জীবনব্যবস্থার পথনির্দেশ বিস্মৃত হয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখন এর সর্বশেষ সংস্করণটি নিয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন আখেরি নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)। কিন্তু তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে এই জীবনব্যবস্থার যে রূপরেখা ও কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন সেটা কালের আঘাতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি সেটার ব্যাখ্যাও গত চৌদ্দশ বছরে বহুভাবে বিকৃত হয়েছে এবং মানুষ তার প্রকৃত রূপটি বিস্মৃত হয়েছে, যদিও আল্লাহ তাঁর কেতাবকে আক্ষরিক বিকৃতির হাত থেকে হেফাজত করেছেন। ফলে সেটাকে মূল নকশা বা ব্লু প্রিন্ট হিসাবে কাজে লাগিয়ে আবারও তওহীদ ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো ও বিশ্বসভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু নির্মম পরিহাস হচ্ছে, এক আল্লাহ, এক রসুল, এক ইসলামের অনুসারীরা প্রচলিত বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। সবাই যার যার মতবাদ নিয়ে তুষ্ট এবং ভিন্নমতের সকলকে কাফের বলে ফতোয়া দিচ্ছে।

এমন একটি জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা স্রষ্টার দেওয়া শেষ ইসলামের আলোকে এই একবিংশ শতাব্দীতে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, তখন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বহু প্রশ্ন, বহু প্রচলিত ব্যাখ্যা। সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যা, ইসলামবিদ্বেষী ব্যাখ্যা, জঙ্গিবাদ ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, মডারেট ব্যাখ্যা, মৌলবাদী ব্যাখ্যা, সুফিবাদী ব্যাখ্যা, নানাবিধ মাদ্রাসার ব্যাখ্যা, সেক্যুলার ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানবাদী ব্যাখ্যা, ফেরকাভিত্তিক ব্যাখ্যা

ইত্যাদি। এসব ব্যাখ্যার জটাজালের মধ্যে আমরা আল্লাহর দীনকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করতে গিয়ে পূর্বতন ব্যাখ্যাগুলোকে মাথায় রেখে নিজেদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে গিয়ে একটু বিস্তারিত বলতে হয়েছে। তথাপি ব্যস্ত পাঠকের সুবিধার্থে এখানে আমরা এক নজরে আমাদের মৌলিক প্রস্তাবনাগুলো ইশতেহার আকারে পেশ করছি। সম্পূর্ণ ধারণা পেতে মূল পাঠের অনুসরণ আবশ্যক।

রাষ্ট্রনীতি

১. সংস্কার নয়, প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামোর আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

২. জীবনের সব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হবে।

৩. আল্লাহর দেওয়া ত্রুটিহীন জীবনবিধান গ্রহণ করতে হবে।

৪. চলমান জীবনব্যবস্থার যে বিধান কোর'আনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো রাখা হবে।

আনুগত্যের ধারাবাহিকতা

১. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হবেন ইমাম। তিনি আল্লাহর বিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন।

২. বিচারবিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও অর্থের অনুমোদন ইমামের এখতিয়ারে থাকবে।

৩. রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সুস্পষ্ট চেইন অব কমান্ডে আমিরের অধীনে থাকবেন।

৪. গণতন্ত্রের বিরোধী দলের মত সব বিষয়ে সরকার বিরোধিতা করা চলবে না।

৫. কোনো আমির আল্লাহর আদেশের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

মন্ত্রিপরিষদ

১. মন্ত্রিপরিষদ ইমামকে নীতি নির্ধারণে এবং আমিরদেরকে নির্বাহী কাজে সহায়তা করবেন।

২. সরকারি কার্যাদি ও নিয়োগে মন্ত্রীদের কোনো অনৈতিক সুপারিশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

৩. মন্ত্রী ও আমলারা অপরাধ করলে তাদের আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে।

আইনসভা

১. আমিরগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সচেতন নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে।

২. কেউ নিজে থেকে প্রার্থী হতে পারবে না।

৩. সরকারিভাবে ঘোষিত প্রার্থী প্যানেল থেকে আমির নির্বাচন করা হবে।

৪. প্রচারসহ নির্বাচনের সকল ব্যয় নির্বাচন কমিশন বহন করবে।

৫. আমিরগণ নতুন চ্যালেঞ্জ সমাধানে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

৬. কোর'আনের বিধান পরিবর্তনের অধিকার কারো থাকবে না।

৭. ডিসি, এসপি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জেলা আমিরের অধীনে কাজ করবেন।

মসজিদ ব্যবস্থা

১. ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে জামে মসজিদ নির্মাণ করা হবে।

২. পাঞ্জেগানা মসজিদ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ মুসল্লিরা নির্মাণ করতে পারবেন।

৩. মসজিদকে জাতীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

৪. ফেরকাভিত্তিক মসজিদ ও বিরোধপূর্ণ জমিতে মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করা হবে।

৫. জুমার খোতবায় ইমামের প্রতিনিধি জাতিকে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিবেন।

৬. মসজিদ থেকে গুজব ও অনৈক্য ছড়ানোর সুযোগ বন্ধ করা হবে।

৭. মসজিদকে কর ও দানের অর্থ সংগ্রহের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

৮. সরকার মসজিদের ইমাম ও খতিবদের জন্য সম্মানজনক ভাতা বরাদ্দ করবে।

৯. মসজিদ থেকে দরিদ্রদের জন্য দান ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

১০. জামে মসজিদে বিনা খরচে সালিশি পদ্ধতিতে বিচারব্যবস্থা চালু থাকবে।

১১. মসজিদে নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১২. মসজিদকে কেন্দ্র করে সরকারি কলোনি ও অতিথিভবন তৈরি করা হবে।

১৩. মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় পথচারী ও অভাবীদের জন্য কমিউনিটি ক্যান্টিন থাকবে।

১৪. নারীরা মসজিদে দিনে বা রাতে সব ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন।

১৫. মসজিদে সামরিক শৃঙ্খলা ও মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১৬. মসজিদে বিয়ে, আকিকা ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে।

রাজনৈতিক দল

১. জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল গঠনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

২. রাষ্ট্রের মূলনীতির প্রতি আনুগত্য রেখে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠনের অনুমতি থাকবে।

৩. রাষ্ট্রের ঐক্য বিনষ্টকারী, জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি হরতাল, অবরোধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

বিচারব্যবস্থা

১. বিচার প্রক্রিয়ায় আল্লাহর হুকুম চূড়ান্ত হিসেবে মানা হবে।
২. যে কোনো মামলার বিচারকার্য স্বল্পতম সময়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করা হবে।
৩. বিচার পেতে নাগরিকদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না।
৪. গ্রাম পর্যায়ে সালিশি বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
৫. গুরুতর অপরাধের শাস্তি জুমার দিন জনসম্মুখে কার্যকর করা হবে।
৬. রাষ্ট্রদ্রোহ, অর্থপাচার, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার বিচার কেন্দ্রীয় আদালতে হবে।
৭. বিচারবিভাগ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।
৮. বিচারকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতা ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেটা রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে নিষ্পত্তি হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১. বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে ভারসাম্যপূর্ণ একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।
২. জীবনমুখী শিক্ষা ও নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।
৩. ধনী-গরিব সবার জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।
৪. শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।
৫. শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই আইসিটি, কারিগরি শিক্ষা, কৃষি ও পশুপালনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৬. প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে।
৭. স্নাতক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে।
৮. শিক্ষার্থীদের জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্যোগে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ক্যাডেট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৯. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ নাগরিক গড়তে খেলাধুলা ও মার্শাল আর্টে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১০. যে কেউ যে কোনো বয়সে শিক্ষা নিতে পারবে।

১১. সকল শিক্ষার্থীকে জীবনদক্ষতা যেমন সম্পদ ব্যবস্থাপনা, রান্নাবান্না, পুষ্টি ও প্রাথমিক চিকিৎসাজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো হবে।

১২. শিক্ষার্থীদের অন্তত দুটি আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ধর্মীয় অধিকার ও সম্প্রীতি

১. ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, চাকরি, অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা হবে না। কর্মদক্ষতা, সততা, যোগ্যতা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো নিষিদ্ধ থাকবে।

২. ধর্মীয় সম্প্রীতি তৈরির জন্য ধর্মীয় সংলাপ, সম্প্রীতি মেলা করা হবে। পাঠ্যপুস্তকে সকল ধর্মের পরিচিতি সংযোজন করা হবে। ধর্মীয় নেতাদের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩. যারা জাতীয় নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের প্রতিরক্ষা কর দিতে হবে।

৪. প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম চয়ন, পরিবর্তন বা ত্যাগের অধিকার থাকবে। ধর্ম বিশ্বাস লালন ও প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে। ধর্মীয় বিষয়ে কোনো জবরদস্তি চলবে না।

৫. আইন সকলের জন্য সমান থাকবে; অপরাধীর ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে ধর্মীয় অধিকার বা মত প্রকাশের নামে আইন ভঙ্গ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধর্মযাজক শ্রেণি

১. ইসলামের নামে সব ধরনের ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

২. মাদ্রাসাশিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, সুদমুক্ত ঋণ, সরকারি চাকুরি দেওয়া হবে। যেহেতু একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, তাই মাদ্রাসাশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কর্মহীন বা বেকার থাকার সুযোগ থাকবে না।

প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা

১. সকল নাগরিক ন্যূনতম সামরিক শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে।

২. একটি নিয়মিত প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকবে, যারা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ হবে।

৩. জাতিসংঘের অধীনে বা স্বতন্ত্র উদ্যোগে শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করা হবে।

৪. শান্তি মিশনে অর্জিত ক্ষতিপূরণের অর্থ সামরিক সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

৫. অফিসার ও সাধারণ সেনাদের মধ্যে বেতন ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দূর করা হবে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

১. পুলিশ বাহিনী সৎ কাজের সহযোগিতা ও অসৎ কাজ প্রতিরোধে কাজ করবে।

২. কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থে পুলিশ কাজ করতে পারবে না।

৩. মিথ্যা মামলা গ্রহণ বা বানোয়াট তথ্য এজাহারে যুক্ত করা নিষিদ্ধ থাকবে।

৪. সন্দেহের ভিত্তিতে হয়রানি বা রিমান্ডের নামে নির্যাতন করা যাবে না।

৫. পুলিশ বাহিনীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক ও কূটনীতি

১. মানবজাতি এক জাতি হিসাবে বিশ্বনাগরিক। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ইসলামে নেই।

২. প্রভুত্বের জায়গায় আল্লাহ থাকবেন; নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কোনো স্থান থাকবে না।

৩. বৈষয়িক স্বার্থের জন্য কোনো জাতি বা রাষ্ট্রকে আক্রমণ, শোষণ বা বঞ্চনা করা যাবে না।

৪. মিত্রদের সঙ্গে চুক্তি মানা হবে, তবে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে না।

৫. ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হবে।

৬. বিদেশি শক্তির কাছে নালিশ (লবিং) রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হবে।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য

১. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুদ গ্রহণ বা প্রদান নিষিদ্ধ করা হবে।

২. সম্পদের দ্রুততম সঞ্চালন ও বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

৩. মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে সুদমুক্ত বিনিয়োগ চালু করা হবে। বিনিয়োগকারী ও শ্রমদাতার মধ্যে ঝুঁকি ও মুনাফার ভাগাভাগি হবে।

৪. জনগণ তাদের টাকা বায়তুল মালে জমা রাখতে পারবে এবং যখন ইচ্ছা উত্তোলন করতে পারবে।

৫. প্রতিরক্ষামূলক উদ্যোগে অংশগ্রহণ না করলে প্রতিরক্ষা কর আরোপ করা হবে।

৬. সিন্ডিকেট ভেঙে ন্যায়সঙ্গত বাজার ব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৭. ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
৮. স্তরভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজির মালিকরা বৃহৎ প্রকল্পে মনোযোগ দেবে।
৯. অর্থনীতিকে কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে সম্পদ নির্ভর করা হবে।
১০. জনগণকে টাকার পরিবর্তে প্রকৃত সম্পদ (কৃষিজমি ও গবাদি পশুর) মালিক হতে উৎসাহিত করা হবে।
১১. বিদেশে অর্থপাচার রোধে কঠোর নীতি প্রণয়ন করা হবে।
১২. আমদানির পরিবর্তে রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে।
১৩. দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।
১৪. 'অতি পুঁজি জমাকারী ব্যাংকের' উপর নির্ভরশীলতা কমানো হবে।
১৫. বিলাসপণ্যের পরিবর্তে জনগণকে অপরিহার্য পণ্যের প্রতি সচেতন করা হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১. বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
২. উদ্ভাবকদের গবেষণায় উৎসাহিত করতে স্বীকৃতি, পুরস্কার, বিনিয়োগ ও পৃষ্ঠপোষণ করা হবে।
৩. বিজ্ঞানের অকল্যাণকর ব্যবহার বন্ধ করা হবে।
৪. বিদেশে মেধাপাচার রোধে দেশে মেধাবীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

সংস্কৃতি

১. রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি তওহীদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু চর্চা করা যাবে না।
২. সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা, ঘৃণা বিস্তার, অনৈক্য ও মিথ্যার প্রচার করা যাবে না।
৩. দেশ, মানুষ, আল্লাহ, রসুল ও সত্যদীনের আদর্শ তুলে ধরার জন্য গান, সিনেমা, নাটক, চিত্র প্রদর্শনীতে উৎসাহ, প্রণোদনা, পুরস্কার ও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

ক্রীড়া

১. ক্রীড়াঙ্গনে অশ্লীলতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অর্থের লেনদেন, জুয়া বা বাজি ধরা নিষিদ্ধ হবে।
২. শরীর গঠনকারী আউটডোর গেমস যেমন হাডুডু, ফুটবল, ম্যারাথন দৌড়, সাঁতার উৎসাহিত করা হবে।
৩. অন্তর্মুখী বিনোদন বা ক্রীড়াকে (তাস, ডিজিটাল গেমস, লুডো, কেরামবোর্ড) নিরুৎসাহিত করা হবে।

৪. আত্মরক্ষামূলক খেলাধুলা যেমন জুডো, বক্সিং, কারাতে, কুংফু, কুস্তি উৎসাহিত করা হবে।

৫. স্টেডিয়ামগুলোকে প্রাণবন্ত রাখতে বিভিন্ন খেলার টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।

৬. খেলা নিয়ে মারামারির সুযোগ দেওয়া যাবে না।

৭. সকল খেলায় মেয়েদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে।

৮. নারীদের ও পুরুষদের শারীরিক গঠন উন্নয়নের জন্য সরকারি উদ্যোগে জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা

১. সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে নারী শালীনতার সঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করার সমান সুযোগ পাবে।

২. কোনো ফতোয়া বা সামাজিক বিধিনিষেধ দিয়ে নারীদের পশ্চাৎপদ বা গৃহবন্দী করা যাবে না।

৩. নারী পুরুষ সকলে শালীন পোশাক পরবে।

৪. পর্দার বিধান নিয়ে অতিব্যাখ্যা করা যাবে না, আল্লাহ যা বলেছেন তা-ই মো'মেনদের জন্য বাধ্যতামূলক।

৫. নারীরা যোগ্যতাবলে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। কেবল মুসলিম উম্মাহর ইমামের পদ পুরুষের জন্য নির্ধারিত।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

১. শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. রাষ্ট্র শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে শ্রম আদায়ের সব পথ বন্ধ করবে।

৩. শ্রমিকের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা হবে।

৪. গৃহকর্মীদের স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হবে এবং নির্যাতনকারীদের বিচার করা হবে।

৫. শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা হবে।

৬. মজুরি সময়মতো প্রদান এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলে মজুরি বাড়ানো হবে।

৭. সব সময় চাকরিচ্যুতির আশঙ্কা থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করতে হবে।

৮. ঊর্ধ্বতনের দুর্ব্যবহার, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯. নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা, সমান সুযোগ এবং সমান বেতন নিশ্চিত করা হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১. অভিজ্ঞ ও দক্ষ নাগরিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

২. অদক্ষ শ্রমিকদের কারিগরি কাজ, ভাষাগত দক্ষতা ইত্যাদির উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩. দক্ষ ও দরিদ্র শ্রমিকদের বিনা খরচে বিদেশে পাঠানো হবে।

৪. অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত চার্জ, হয়রানি, ভিসা ও কাজের অনুমতির জটিলতা দূর করা হবে।

৫. প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৬. বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গণমাধ্যম ও বাকস্বাধীনতা

১. গণমাধ্যমে ভুল, মিথ্যা ও অনুমাননির্ভর তথ্য প্রচার নিষিদ্ধ।

২. কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানহানিকর অপবাদমূলক তথ্য প্রচার করা যাবে না।

৩. গুজব রটনা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪. সরকারের উদ্যোগ, নীতি, প্রকল্পে অনিয়ম বা দুর্নীতি তুলে ধরার স্বাধীনতা গণমাধ্যমের থাকবে।

শাসকের সমালোচনা ও জবাবদিহিতা

১. শাসকের সমালোচনা ও অভিযোগ প্রদানের জন্য সুশৃঙ্খল ও গঠনমূলক পন্থা অনুসরণ করা হবে।

২. সত্য কথা বলার জন্য কাউকে তিরস্কার বা চাকরি হারানোর ভীতি থাকবে না।

৩. ইমাম প্রতি জুমায় মসজিদে খোতবা দেবেন। সেখানে জনগণ সরাসরি তাকে প্রশ্ন করতে পারবেন।

৪. শুরা সদস্যগণ পরিষদের বৈঠকে সরকারের ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন।

৫. গণমাধ্যমে যে কেউ নিজের মতামত অবাধে প্রকাশ করতে পারবে।

৬. ইমাম সকলের সমালোচনা শুনবেন এবং আল্লাহর নীতি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেবেন।

সামাজিক সুরক্ষা

১. প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম জীবনমান ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে রাষ্ট্র জীবনধারণ ভাতার ব্যবস্থা করবে।

২. সচেতন ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা হবে যেন সবাই পরিবারে থাকতে পারে এবং এতিমখানা, বৃদ্ধাশ্রম ও বিভিন্ন পুনার্বাসন কেন্দ্রর উপর নির্ভরশীলতা কমে।

৩. দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে, যাতে অপরাধ কমে।

৪. সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, যাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পায়।

৫. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে, যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করবে।

৬. প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে ইসলামের শিক্ষার আলোকে সকলকে অনুপ্রাণিত করা হবে।

৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও সহায়তার জন্য রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. রাষ্ট্র দরিদ্র, এতিম, ভবঘুরে, পথচারীসহ সুবিধাবঞ্চিতদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে।

৯. তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ পূর্ণ মানবাধিকার ভোগ করবে এবং সকল কাজে যোগ্যতা অনুযায়ী অংশগ্রহণের অধিকার পাবে।

স্বাস্থ্যসেবা

১. সরকারি হাসপাতালগুলোতে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

২. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে দালাল ও দুর্নীতিমুক্ত করে সেবার উপযোগী করা হবে।

৩. দরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যের স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালু করা হবে।

৪. প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে যা যে কোনো থেকে প্রবেশ করা যাবে।

৫. দাতব্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনে দানশীলদের উৎসাহিত করা হবে।

৬. বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির মান উন্নয়ন ও মেডিকেল শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭. হোমিওপ্যাথিকে অ্যালোপ্যাথির সমমূল্যায়ন করা হবে।

৮. চিকিৎসকদের মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৯. নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ও অভিজ্ঞ নার্স নিয়োগ করা হবে।

১০. গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছাতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

১১. উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষধের কাঁচামালের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে।

১২. চিকিৎসা খাতে বিদেশি নির্ভরতা কমাতে দেশীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

১. এক ইঞ্চি আবাদযোগ্য জমি উৎপাদনের বাইরে থাকবে না। অব্যবহৃত জমি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করবে।

২. ভিত্তিবীজ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা হবে।

৩. কৃষকদের নির্দিষ্ট ফসলের একটি অংশ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

৪. কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৫. অতিরিক্ত কৃষিপণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হবে না।

৬. কৃষকদের সহজ শর্তে ও বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে।

৭. কৃষিজমি তামাক চাষের জন্য ব্যবহার করা হবে না।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

১. দুর্যোগ মোকাবেলায় কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, বরং পুরো জাতিকে যুক্ত করা হবে।

২. ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা হবে।

৩. বিদেশি ত্রাণের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করা হবে।

৪. দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হবে, যারা দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধার ও সচেতনতা কার্যক্রমে অংশ নেবে।

৫. দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সেন্টারগুলো প্রস্তুত রাখা হবে।

৬. ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বিত্তবানদের সম্পৃক্ত করে কৃষকদের জন্য বীজ-সার, ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ সুবিধা, এবং গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে।

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা

১.জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে যেন অধিক জনসংখ্যা জনসম্পদরূপে গণ্য হয়।

২. পরিবারগুলোকে তাদের আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী অর্থাৎ ধনী পরিবারকে বেশি ও দরিদ্র পরিবারকে কম সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে।

৩. ত্রুটিযুক্ত মানবশিশুর জন্ম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পানি সম্পদ ও মৎস্য

১.বিনামূল্যে সুপেয় পানি প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা হবে।

২. মাছের নতুন উচ্চ উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩. পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধন বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪. নদীতে বাধ নির্মাণ করে একচেটিয়াভাবে পানি প্রত্যাহার করে ভাটির দেশকে পানিবঞ্চিত করা যাবে না।

৫. নদী বা খালে বাধ দিয়ে পানি ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার ও নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

পরিবেশ ও জলবায়ু

১. দেশের মোট জমির ২৫%-৩০% বনভূমি নিশ্চিত করা হবে।

২. ভরাট হওয়া জলাশয় চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধার করা হবে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. জলাশয়গুলো মৎস্যচাষের উপযোগী করে স্থানীয় চাষীদের বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৪. খালগুলোর নৌ-চলাচল উপযোগী করা হবে এবং নদীভিত্তিক চ্যানেল উন্মুক্ত করা হবে।

৫. প্রাকৃতিক ও শিল্পজাত সম্পদ দেশের চাহিদা পূরণের পর বিদেশে রপ্তানি করা হবে।

৬. অপরিকল্পিত নগরায়ণ রোধে আবাসিক, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক এলাকা পৃথকভাবে গড়ে তোলা হবে।

যোগাযোগ ও পরিবহন

১. আনফিট গাড়ি রাস্তায় চলার লাইসেন্স পাবে না।

২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারকারী পরিবেশবান্ধব গাড়ি তৈরি ও আমদানি করা হবে।

৩. গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটকে সাধারণ যাত্রীদের চলাচল বন্ধ করা হবে না।

৪. পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও পাওনা নিশ্চিত করা হবে।

৫. মাদকমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৬. ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করা হবে, পরিবহন মালিকরা অতিরিক্ত ভাড়া নিতে পারবে না।

৭. রাস্তা নির্মাণ বা সংস্কার কাজ স্বল্পতম সময়ে শেষ করা হবে।

৮. ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার হ্রাস করা হবে, গণপরিবহনের সেবার মান উন্নীত করা হবে।

৯. রেল অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ করে সকল উপজেলায় রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হবে এবং রেলের মাধ্যমে যাতায়াত, গ্রামীণ কৃষিপণ্য ও ভারী মালামাল পরিবহন বাড়ানো হবে।

১০. বড় শহরে বৈদ্যুতিক কমিউটার এবং মেট্রোরেল চালু করা হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

১. জ্বালানিকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় পরিচালিত হবে।

২. ফসিল জ্বালানির ব্যবহার কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩. গণ পরিবহন হিসাবে বৈদ্যুতিক যানবাহন চালু করা হবে।

৪. বৃহৎ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ করা হবে।

৫. বিদ্যুৎ সাশ্রয় নিশ্চিত করতে অফিস, আদালত এবং মার্কেট সন্ধ্যার আগেই বন্ধ করা হবে।

৬. দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত জ্বালানি প্রথমে স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করা হবে।

৭. গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সহজলভ্য করা হবে এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

পর্যটন শিল্প

১. পর্যটকদের প্রতি শোষণমূলক মনোভাবের পরিবর্তে আথিতেয়তার মনোভাব গড়ে তোলা হবে।

২. পর্যটকদের কোনো ধরনের হয়রানি, প্রতারণা বা অতিরিক্ত দাম নেওয়া হবে না।

৩. সকল নাগরিকের জন্য স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে পর্যটনের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৪. ট্যুর অপারেটর ও গাইডদের ভাষাগত দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে।

৫. পর্যটনের আড়ালে অবৈধ কর্মকাণ্ড যেমন মাদক, জুয়া, দেহব্যবসা, বন্যপ্রাণী শিকার, পরিবেশের ক্ষতি বা অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি ইত্যাদি বন্ধ করা হবে।

৬. পর্যটকদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা হবে।

৭. পর্যটকরা যেন পর্যটন গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য পেতে পারে সেজন্য ওয়েবসাইট ও অ্যাপস তৈরি করা হবে।

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না?
তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।

সুরা মুলক ৬৭:১৪

হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে দুটি কথা
(About Hezbut Tawheed)

প্রায় ১৫০০ বছর আগে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার ফলে আরবের জাহেলি সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছিল। যে আরবরা ছিল অশিক্ষিত, দারিদ্র্যপীড়িত এবং গোত্রীয় সহিংসতায় লিপ্ত বর্বর জনগোষ্ঠী, ইসলামের চর্চার মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত, সভ্য, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি, যারা পরবর্তীতে বিশ্ব সভ্যতার অগ্রদূত হয়ে উঠেছিল। অর্ধপৃথিবী জুড়ে তারা এমন এক মহান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে অন্যায় অপরাধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। আদালতে মাসের পর মাস কোনো মামলা আসত না। এমন আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল যে বিত্তবানেরা দান গ্রহণ করার জন্য লোক খুঁজে পেত না।

অনেকে মনে করতে পারেন, এখন আর তেমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা বলছি, এটা এ যুগেও পুরোপুরি সম্ভব এবং যৌক্তিক। প্রয়োজন কেবল একটি সিদ্ধান্তের, সেটা হল আমরা এতদিন মানুষের তৈরি বিভিন্ন জীবনব্যবস্থা মেনে চলেছি। এবার অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করি। সেই জীবনব্যবস্থার প্রকৃত রূপরেখা আমাদের কাছে রয়েছে। এটা বাস্তবায়ন করা হলে কেমন হবে ছোট পরিসরে হেযবুত তওহীদ তার বাস্তব উদাহরণ।

গত তিন দশক ধরে হেযবুত তওহীদ বাংলাদেশে আন্দোলন পরিচালনা করছে। এই দীর্ঘ সময়ে এ আন্দোলন বা এর কোনো সদস্য একটিও আইন লঙ্ঘন করেনি। এটা আমাদের মৌখিক দাবি নয়। ইসলামোফোবিয়া ও আদর্শিক মতানৈক্যের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র হয়েছে। পাঁচ শতাধিক মিথ্যা মামলায় আমাদের সদস্যদেরকে নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি মামলাতেও তারা কেউ অপরাধী প্রমাণিত হননি। সবাই বে-কসুর খালাস পেয়েছেন। এটা আমাদের নৈতিক বিজয় ও অনন্য গৌরব যা বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও দাবি করতে পারবে না।

আমাদের এই আদর্শ কেবল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির দিক নির্দেশ করে না, কেবল পরকালীন মুক্তির কথা বলে না, বরং আমরা মানুষের বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান উপস্থাপন করে থাকি। আমাদের প্রস্তাবিত আদর্শকে আমরা দৃশ্যমান নমুনায় রূপ দিতে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি এলাকায় অর্ধ শতাধিক

উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছি যার মধ্যে রয়েছে গরুর খামার, মাছের খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাসপাতাল ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শত শত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

উন্নয়ন মডেলঃ চাষীরহাট পাইলট প্রজেক্ট
(Development Model: Chashirhat Pilot Project)

আমরা (হেযবুত তওহীদ) যখন বর্তমানে চলমান মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছিলাম, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমাজের চিন্তাশীল শ্রেণি থেকে প্রশ্ন এসেছে যে, আপনাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা (Framework of the governance system) কেমন হবে? তাদের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আমরা একটি বাস্তব মডেল বা রেপ্লিকা স্থাপনের উদ্যোগ নিই। সে হিসাবে আমরা নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে আমার (গ্রন্থকার) নিজ ইউনিয়ন চাষীরহাটকে একটি নমুনা হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এই পর্যন্ত সেখানে আমরা আমাদের ধারণার (Vision) তওহীদ ভিত্তিক ও মসজিদকেন্দ্রিক সমাজকাঠামো, নেতৃত্ব কাঠামো, বিরোধ-মীমাংসা, শিক্ষা, কৃষি উৎপাদন, শিল্প-উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বাণিজ্য, পরিবহন, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, আবাসন ইত্যাদি ব্যবস্থা যথসম্ভব প্রবর্তন করেছি। পুরোপুরি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ দেশে ভিন্ন একটি সিস্টেম চলছে। আমাদের এই 'চাষীরহাট উন্নয়ন প্রকল্প' ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকাকে আলোকিত করে তুলেছে এবং জনগণ-প্রশাসন সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে।

একদল দুর্বৃত্ত ও উগ্রবাদী ২০১৬ সালে ধর্মীয় উন্মাদনা ও মব সৃষ্টি করে সেখানে অবস্থিত আমার বাড়িঘরে ও নির্মাণাধীন মসজিদে হামলা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এ সময় তারা হেযবুত তওহীদের দুইজন সদস্যকে নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে। কিন্তু আমরা দমে যাইনি। আমরা তাদের অপপ্রচার, গুজব, মিথ্যাচার এবং ষড়যন্ত্রে কর্ণপাত না করে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। আমরা ধ্বংসের বদলে নির্মাণ করেছি। যার ফলে আল্লাহর দীনের শিক্ষা বাস্তবায়ন হলে একটি সমাজব্যবস্থা কেমন হতে পারে তার কিছুটা নমুনা আমরা সেখানে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রাণবন্ত মসজিদঃ আমরা সেখানে একটি চারতলা বিশিষ্ট জামে মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছি। প্রতি জুমায় সেখানে হাজার হাজার মুসল্লি জমায়েত হন। আমাদের ধর্মীয় সামাজিক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এই মসজিদ। জুমার সময় সেখানে শুধু নামাজ হয় এমন নয়, সেখানে মুসল্লিদের নীতি-নৈতিকতা, সমাজের

প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। নামাজ শেষে তাদের ঘরে খাবার আছে কিনা, বিনা চিকিৎসায় কেউ কষ্ট করছে কি না, কেউ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা - এ ধরনের বুনিয়াদি, মৌলিক, মানবিক চাহিদাগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হয় এবং তা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা হয়। মসজিদ কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলা কনফারেন্স হল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে বিয়েসহ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মসজিদে বিনা বেতনে মক্তব পরিচালনার মাধ্যমে কোর'আন, হাদিস, ইসলামের মৌলিক আকিদা ও দৈনন্দিন মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। আর বয়স্কদের জন্য মসজিদে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শিক্ষায় ভারসাম্য: প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতি চিহ্নিত করে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে (Modern and moral education) একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছি। সেখানে বর্তমানে চার শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকরা তাদের পাঠদান করছেন। শিল্প সংস্কৃতির চর্চাসহ শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সততা ও নিষ্ঠার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ উদ্যোগ হলো- নৈশকালীন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। এই উদ্যোগের মাধ্যমে এই সমাজের নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণসহ সর্বদিক থেকে ইতোমধ্যেই অত্র অঞ্চলে এই বিদ্যালয়টি অভাবনীয় সাড়া ফেলেছে। প্রত্যন্ত এলাকার একটি বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও ২০২৪ সালের আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে (উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতা, লোকনৃত্যসহ বিভিন্ন বিভাগে) সোনাইমুড়ী উপজেলা থেকে সর্বাধিক বিভাগে জয়ী হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত জেএসসি ও এসএসসি-তে শতভাগ পাশসহ অভাবনীয় ফলাফল করে আসছে। তবে এই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো- শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র। কয়েকটি উদাহরণ দিলে কিছুটা পরিষ্কার হবে- প্রথমত, এখানকার পরীক্ষার পরিবেশ অন্য সব বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরীক্ষার হলে কোনো ধরনের গার্ড দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ প্রত্যেকেই জানে নকল করা বা পরীক্ষায় অন্যের সহযোগিতা নেওয়া অনৈতিক, কাজেই সেটা কেউ করে না। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি দোকান রয়েছে যেখানে বেশিরভাগ সময় বিক্রেতা থাকে

না। শিক্ষার্থীরা এখান থেকে পণ্য নিয়ে নিজ দায়িত্বে একটি কৌটায় টাকা রেখে আসে। এখন পর্যন্ত এমন অভিযোগ আসেনি যে, কেউ পণ্য নিয়ে টাকা রাখেনি। তৃতীয়ত, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেশ কিছু আমগাছ রয়েছে যেগুলো খুবই নিচু। যখন গাছে আম ধরেছে তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও চাইলেই হাত দিয়ে পেড়ে আম খেতে পারত। কিন্তু একটি আম কোনো শিক্ষার্থী পাড়েনি। উল্টো বাতাসে পড়ে যাওয়া আমও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কুড়িয়ে এনে স্যারের হাতে দিয়েছে। চতুর্থত, এ বিদ্যালয়ে ইভটিজিং, অনৈতিক সম্পর্ক, ধূমপান, মাদক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলাদলি মারামারি ইত্যাদি একটি ঘটনাও ঘটে না। এর পেছনে মূল কারণ বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা। আমরা মনে করি, আমাদের শিক্ষিত সমাজ যদি এভাবে নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান হয় তাহলে তাদের দ্বারা দুর্নীতি, অর্থপাচার ইত্যাদি অপরাধ হবে না।

শতভাগ সদস্যের কর্মসংস্থান: প্রথমত এই সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে একটি চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে যে, সক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, যে কোনো হালাল উপায়ে রেজেক হাসিল করতে হবে, এটা ইসলামের নীতি। এর ফলে এখানে কেউ বেকার ও পরনির্ভরশীল থাকতে চায় না। দ্বিতীয়ত, জুমার দিনে খোঁজ নেওয়া হয়- কেউ বেকার আছে কি না। বেকার থাকলে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, এর জন্য আলাদা দায়িত্বশীল রয়েছেন, কর্মসংস্থান সম্পাদক। তৃতীয়ত, এখানকার বসবাসরত সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নানামুখী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন- গরুর খামার, ছাগল ও ভেড়ার খামার, মৎস্য খামার, হাসপালন, মুরগি পালন ইত্যাদি। এছাড়াও কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে যেমন- শাকসবজি উৎপাদন, ধানচাষ, ভুট্টাচাষ ইত্যাদি। আমাদের মৎস্য খামার ও রেণুপোনা প্রকল্প ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও সনদ লাভ করেছে। আর গরুর খামারগুলোতে কোনো রাসায়নিক ব্যবহার না করে অর্গানিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি ও গোমাংসের উন্নত মান নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

শিল্পভিত্তিক কাজকে গতিশীল করার জন্য শিল্প উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, গার্মেন্টস কারখানা, জুতা কারখানা, সাবান কারখানাসহ তেল উৎপাদনের মতো বহু ক্ষুদ্র শিল্প চালু করা হয়েছে। এখানে কেউ বেকার থাকে না। সকলে উপার্জন করে এবং উপার্জনের একটি অংশ জাতির কল্যাণে ব্যয় করে। যারা কঠোর পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত নন, তাদেরকে অটোরিক্সা, ভ্যান ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তারা রুজি-রোজগার করছেন। অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দাপ্তরিক কাজ করছেন।

আবাসন ব্যবস্থা: যেহেতু আমরা মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করার ব্যাপারে জাতির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাই বাসস্থানের অভাবে কাউকে যেন কষ্ট পেতে না হয় এই লক্ষ্যে এখানে অন্তত পাঁচশত পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। তারা আমাদের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার। এসব হাউজিং প্রজেক্টে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র: চিকিৎসা থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না হয় সেজন্য আমরা বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিক স্থাপন করেছি। সেখানে রোগীর প্রয়োজনমাফিক হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদসব রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বড় একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজও চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: প্রাকৃতিক বা যে কোনো দুর্যোগ মুহূর্তে কাউকে যেন খাবারের কষ্ট করতে না হয়, সে জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। যেমন আগস্ট/সেপ্টেম্বর ২০২৪ বন্যায় নোয়াখালী ফেনী এলাকা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। সেসময় হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে নৌকায় করে ঘরে ঘরে খাবার ও জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। আটকে পড়া অনেক পরিবারকে উদ্ধার করে মসজিদ কমপ্লেক্সসহ আমাদের আবাসিক ভবনগুলোতে তাদের আশ্রয় দিই এবং একসাথে প্রায় ৪০০ লোকের রান্না করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যতদিন বন্যার পানি অত্র অঞ্চলে ছিল (প্রায় দুই মাস) ততদিন এই ব্যবস্থা তাদের জন্য চালু ছিল।

বিবাহ অনুষ্ঠান: বর্তমান সমাজে দেখা যায় মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকেই জমি বিক্রি করে, অনেকেই চড়া সুদে ঋণ নেয়, অনেকে আবার সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়ায়। মেয়ে বিয়ে দেওয়া এখন সাধারণ একটি পরিবারের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া অনেক ছেলেও বিয়ের প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে বিয়ে-শাদি করতে পারে না, ফলে তারা অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, অশ্লীল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলাম তো আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেওয়ার কথা, তবে কি এই সমস্যার সমাধান নেই? হ্যাঁ, আমাদের সমাজে এই সমস্যা একেবারেই নেই। ইসলামের আদর্শ দিয়েই তার সমাধান করা হয়েছে। এখানে বিয়ে শাদির ক্ষেত্রে কোনো তরুণ-তরুণীর অশ্লীল কর্মকাণ্ড বা কোনো বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেই। কারণ ইসলাম বিয়েকে খুবই সহজ করেছে। যাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই তাদেরকে আমরা যৌথ একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকলের সহযোগিতায় বিয়ের ব্যবস্থা করি। তাদের সংসার করার মতো প্রস্তুতি দিয়ে দেই। আমাদের মসজিদ কমপ্লেক্সেই

এই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কোনো ধরনের যৌতুক আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ এখানে নেই, বরং বরকে বিয়ের আসরেই তার সামর্থ্য মোতাবেক দেনমোহর পরিশোধ করে বিয়ে করতে হয়। তাছাড়া বিয়ে পড়ানোরও কোনো খরচ এখানে নেই, কারণ বিয়ে পড়ানো দীনের কাজ, আর দীনের কাজ করে আমরা কোনো বিনিময় নিই না। এখানে প্রায় প্রতি মাসেই বিয়ের আয়োজন হয় এবং সেখানে ইসলামের শালীন সুস্থ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিরও চর্চা হয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিনোদন: সক্ষম প্রতিটি নারী-পুরুষের জন্য এখানে নিয়মিত খেলাধুলা, আত্মরক্ষার কৌশল ও শরীরচর্চা করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টি দেখার জন্য সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেইনার রয়েছেন। নিয়মিতভাবে এখানে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করে থাকেন। রমজান মাসে মসজিদের উদ্যোগে ইসলামি সঙ্গীত, আজান ও কেরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ক্লাবের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা করা হয়।

বিবাদ নিষ্পত্তি: এখানে অনৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ নেই বললেই চলে। কারো সাথে সামান্য মনমালিন্য হলে বা পারিবারিক কলহ বিবাদ হলে স্থানীয় আমীর অভিভাবক হিসাবে হস্তক্ষেপ করে মীমাংসা করে দেন। এছাড়া জুমার দিন মসজিদের মধ্যে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ কারো প্রতি কোনো অন্যায়, জুলুম করেছে কিনা। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কিনা। কেউ রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ করলে (যদিও এখনও এমনটা ঘটেনি) আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে যে তাকে মাননীয় এমাম নিজেই আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। তাই এখানে আইন ভঙ্গ করার কোনো সুযোগ নেই।

মাদক নির্মূল: যেহেতু আল্লাহ মাদকদ্রব্য হারাম করেছেন তাই বলা বাহুল্য যে, হেযবুত তওহীদেও মাদক নিষিদ্ধ। আমাদের সদস্যরা আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্যশীল ও সচেতন থাকায় আমাদের সদস্যরা মাদকমুক্ত পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করেন। তবে ইতোপূর্বে যারা মাদকে অভ্যস্ত ছিলেন তাদেরকে যথাযথ চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবার (Counselling) মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। এতে তাদের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে। এক কথায় এখানে মাদকদ্রব্য সেবন বা ব্যবসায়ের কোনো চিহ্নও নেই।

সাম্যের দৃষ্টান্ত: এখানে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-নিরক্ষর, শ্রমিক-মালিক, কর্মচারি-কর্মকর্তা, ডাক্তার-হকার কোনো ভেদাভেদ নেই। যে কোনো অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কারও অর্থনৈতিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিপত্তি এখানে বিবেচিত

হয় না। কেউ অন্যায় করলে আইন সবার জন্য সমানভাবেই প্রযোজ্য হয়। একত্রে তাদের চলাফেরা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব দেখলে হয়ত অনেকে অনুমানই করতে পারবে না তাদের কার কী জীবিকা। একজন কৃষক, একজন হকার বা একজন অটোচালকও এখানে আচরণগত বৈষম্যের শিকার হয় না, অপমানিত বোধ করে না। প্রকৃত ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপিত হয়েছে।

মানবতা ও সেবা: এই সমাজের প্রতিটা সদস্য সুনির্দিষ্ট চেইন অব কমান্ডে বাঁধা। প্রত্যেকের একজন আমির আছেন, যিনি তাদের যাবতীয় সমস্যা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ দেখভাল করতে দায়বদ্ধ। আবার প্রত্যেকেই আমিরের আদেশ, দিকনির্দেশনা মেনে চলে। ফলে কেউ কোনো বিপদে পড়লে সাথে সাথেই অন্য ভাই-বোন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তার সেবা-সুশ্রুষা করে, আর্থিক সহায়তা করে। কেউ একাকী, অসহায় বোধ করার সুযোগ নেই। অসাধারণ এক মানবিক সমাজ এখানে গড়ে উঠেছে।

নৈতিকতাপূর্ণ সমাজ: এমন একটি সমাজ এখানে গড়ে উঠেছে যেখানে মিথ্যা, প্রতারণা, ছলচাতুরি নেই। ব্যবসায়ীরা পণ্যে ভেজাল দেয় না, ওজনে কম দেয় না; ডাক্তার রোগীদেরকে খদ্দের (Client) ভাবেন না, বরং ভাই-বোন মনে করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন, এটাকে তারা এবাদত মনে করেন; গরু, ছাগল, ভেড়া ও মৎস্য খামারে এমন কোনো খাদ্য খাওয়ানো হয় না যার ফলে ঐ খাদ্য জনস্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হয়। গ্রামীণ সমাজের একটি সাধারণ বিষয় হলো ঝগড়া ও লাঠালাঠি, কিন্তু এখানে বছরের পর বছর কারো সাথে কারো ঝগড়া লাগে না, মারামারি হয় না। ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, বুলিং ইত্যাদি কল্পনারও অতীত। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্যোগে নিজস্ব পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করার জন্য প্রতি বছর শীত মৌসুমে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থী ও ক্রেতা এসে ভিড় জমায়। সাধারণত গ্রাম বাংলায় অনুষ্ঠিত মেলাগুলোতে জুয়া, অশ্লীল নাচগান, ইভটিজিং, চুরি ও পকেটমারের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, কিন্তু চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো এখানে এ ধরনের একটি ঘটনারও নজির নেই। বরং বিগত বছরের মেলায় বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, যেমন একটা মানিব্যাগ পেয়ে সেটি একজন মেলার স্টেজে দিয়ে যায় এবং মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্রকৃত মালিকের হাতে এটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মালিক এটি পেয়ে অভিভূত হন, তার মানিব্যাগের একটি টাকাও হারায়নি। এই একই ঘটনা ঘটেছে দুই জনের ক্ষেত্রে। এবং তৃতীয় যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা আরও অভাবনীয়। একটি শিশু মেলার মাঠ থেকে একটি খেলনা কুড়িয়ে পায়, সেটি স্টেজে সে ফেরত দেয়। এটিও মাইকে ঘোষণা দিয়ে মালিকের হাতে ফেরত

দেওয়া হয়। এটি নৈতিকতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত, যেটা সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃত ইসলামের আদর্শ অনুসরণের ফলে।

ভিন্ন এক অর্থব্যবস্থা: এখানে ইসলামি অর্থব্যবস্থার চর্চা চলছে। প্রত্যেকেই পরিশ্রম করে, হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এজন্য পরিবারগুলোতে স্বচ্ছলতা আছে। তাদের স্বল্প উপার্জন থেকেই তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে। এরপরও যে অর্থ তাদের উদ্বৃত্ত থাকে সেটা নিজেদের কাছে না রেখে একটি নিবন্ধিত সুদবিহীন সমবায় সমিতিতে জমা রাখে। এ সমিতি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। সদস্যরা প্রয়োজন হওয়া মাত্রই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন করতে পারে। সমিতি তাদেরকে সুদমুক্ত ও বন্ধকবিহীন ঋণও প্রদান করে। এছাড়াও এই সমাজের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয় নিজেদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করার জন্য। এর ফলে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে উন্নতি করতে পারে। এর ফলে গড়ে উঠেছে সুদমুক্ত এক অসাধারণ সমাজ।

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা: আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, বিদ্যালয়সহ অনেক সম্পদ এখানে রয়েছে। একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচার ও গুজব সৃষ্টি করে আসছে। ইতঃপূর্বে তাদের গুজবের ফলে আমাদের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং দুইজন ভাই শহীদও হয়েছেন। কাজেই আমাদের এই সমাজের নিরাপত্তার জন্য একটি সামাজিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে সেটা এখানে তৈরি হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে যখন সরকার পরিবর্তন হলো, প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল তখন বিভিন্ন জায়গাতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই চরম অস্থিতিশীল সময়ে হেযবুত তওহীদের নেতৃত্বে চাষীরহাট এলাকার সাধারণ জনতা দলমত নির্বিশেষে একত্র হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যার ফলে এখানে বড় ধরনের কোনো নাশকতার ঘটনা ঘটেনি। এরকম যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজের প্রত্যেক সদস্য তাদের জীবন বাজি রেখে জাতি রক্ষায় এগিয়ে আসতে বদ্ধ পরিকর। তাছাড়া এলাকাতে যেন কোনো চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটতে না পারে সেজন্য রাত জেগে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে এই সমাজের মানুষগুলোই এলাকা পাহারা দেয়। সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটা দিন স্বেচ্ছায় তারা এই প্রহরার কাজ করে। এর ফলে এলাকায় কোনো চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটে না, অথচ ইতঃপূর্বে এই অঞ্চলে চুরি-ডাকাতির ঘটনা নিয়মিতই ঘটত।

ভিক্ষাবৃত্তিহীন সমাজ: বর্তমান সমাজে দেখা যায় প্রতিটা গ্রাম, শহর, পাড়া-মহল্লায় কিছু মানুষ কাঁধে ভিক্ষার থলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। তাছাড়াও রোজা, ঈদ, শবে বরাত ইত্যাদি দিবসকেন্দ্রিক আরও অনেক ভিক্ষুক দেখা যায়।

ভিক্ষুক ছাড়াও সমাজের একটি বিরাট শ্রেণি আছে যারা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সরাসরি জড়িত না হলেও বিভিন্নভাবে সাহায্য প্রার্থনার সুযোগ হলেই তারা সেটা করে, যেমন যাকাতের শাড়ি বা লুঙ্গি নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়, স্বল্পমূল্যে টিসিবির পণ্য নিতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। এটা সমাজের যে চিত্র তুলে ধরে তা হলো- সমাজের একটি বিরাট অংশ হতদরিদ্র, অভাবী, তাদের আত্মসম্মান বোধও নেই, তারা ভিক্ষাবৃত্তিতেও লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু আমাদের সমাজে একটি মানুষকেও ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয় না, একজন ব্যক্তিও টিসিবির পণ্যের জন্য লাইন দিতে হয় না। মসজিদে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কারও খাবার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা বা চিকিৎসার সঙ্কট আছে কি না তখন বলতে গেলে কেউই হাত তুলে না। কারণ তাদের আত্মসম্মানবোধ আছে। তারা জানে রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'উপরের হাত (দাতা) নিচের হাত (গ্রহীতা) হতে উত্তম' (আল হাদিস)। তাছাড়া এখানে প্রতিটা সদস্য ইসলামের নীতি মেনে চেইন অব কমান্ডে যুক্ত, ফলে প্রত্যেকের একজন আমির আছেন যিনি তাদের খোঁজ-খবর রাখেন, অভাব-দারিদ্রের সামাজিকভাবে সমাধান করে দেন। এমনকি এখানে কোরবানির ঈদে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন গোশত খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়, অথচ থলি নিয়ে কেউ লাইন ধরে না। গোশত প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এজন্যই ভিক্ষাবৃত্তির প্রয়োজনই হয় না।

সামাজিক নিরাপত্তা: আমাদের মসজিদে কোনো দরজা নেই, তাই তালা দেওয়ারও প্রশ্ন আসে না। এখানে কোনো কিছু চুরি হয় না। কারো বাসা থেকেও কোনো কিছু চুরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আর কোনো দুর্ঘটনায় কারো অঙ্গহানি হলে বা ক্ষয়ক্ষতি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। আমরা আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বেশ কয়েক বছর থেকে বাস্তবায়ন করে দেখলাম যে, যদি একটি জাতির মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব থাকে, নেতৃত্ব যদি নিরপেক্ষ হয় এবং সবাই যদি ভাই ভাই হয়ে বসবাস করে, সবার মধ্যে যদি আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার একটি ভাবনা সৃষ্টি হয়, যদি এমন একটি জীবনবোধ সৃষ্টি করা যায় যে সামাজিক নিরাপত্তা ও ঐক্যের পরিবেশ থাকলে অভাব ও স্বল্প আয়ের মধ্যেও সুখে থাকা যায়। এখানে চুরি, ডাকাতি নেই বললেই চলে, ব্যভিচার শূন্যের কোঠায়, আর ধর্ষণ তো কল্পনাতীত। আরেকটি অবাক করার বিষয় হচ্ছে- এখানকার পারিবারিক বন্ধন এতটাই মজবুত যে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই বললেই চলে। যদিও কালেভদ্রে দু-একটি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা হয়, সেটা আপস মীমাংসার মধ্যেই সমাপ্ত হয়, মামলা মোকদ্দমার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের সদস্যরা কোনো

ফেরেশতা নয়, কাল্পনিক দেবদেবী নয়। তারা রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাদের ভুলভ্রান্তি হতে পারে যেটাকে বলি ব্যক্তিগত পাপ, যা আল্লাহ মো'মেনদের ক্ষেত্রে ক্ষমা করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু এমন একটি জীবনব্যবস্থা (System of life) আমরা লাভ করেছি যা অনুসরণ করার ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজে অশান্তি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অনেকেই মনে করতে পারেন, আমাদের এই উন্নয়ন মডেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তাদের উদ্দেশে বলছি- এই প্রকল্প নিয়ে ইতোমধ্যে দেশের বহু গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে, বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখনো চলমান এবং দৃশ্যমান। যে কেউ চাইলে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার চাষীরহাট ইউনিয়নের পোরকরা গ্রামে এসে স্বচক্ষে সব কিছু দেখে যেতে পারেন। তাছাড়া, সংযুক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করলেই প্রকল্পভিত্তিক ভিডিও প্রতিবেদন দেখে নেওয়া যাবে।

অতএব, আমরা বলতে পারি- আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা অতীতনির্ভর কোনো মুখস্থ কথা নয়, কোনো কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্র বা অলীক শান্তিধাম (Utopia) নয়, এটার মডেল বিকাশমান, অস্তিত্বশীল ও ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। যদিও এই মডেল স্থাপনে আমরা সময় খুব বেশি পাইনি, মাত্র পাঁচ বছর, যার মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারী, বন্যা, ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর প্রোপাগান্ডাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের উপর দিয়ে গেছে। তারপরও আমরা প্রমাণ করেছি, আদর্শ দ্বারা যদি মানুষের আত্মার উন্নয়ন ঘটানো যায়, চেতনার পরিবর্তন সাধন করা যায় তবে এ ব্যবস্থায় নিশ্চিতভাবেই সমাজের সব সমস্যার নিরসন করা সম্ভব।

আমাদের অঙ্গীকার (Our Commitment)

যারা হেযবুত তওহীদের সকল নীতিমালা মান্য করবেন তাদের প্রতি আমাদেরও কিছু অঙ্গীকার রয়েছে যেগুলো পূরণ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই অঙ্গীকারগুলো আল্লাহর হুকুম ও রসুলাল্লাহর সুন্নাহ অনুসারে গ্রহণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানবিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠ স্থানে আসীন করা, যেখানে অন্তত প্রতিটা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা জাতির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হবে। এই অঙ্গীকার পূরণ যা একজন মো'মেন হিসেবে আরেকজন মো'মেনের উপর ঈমানি কর্তব্য এবং রাষ্ট্র যিনি পরিচালনা করবেন, সর্বোপরি তাঁরও দায়িত্ব। যে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূর্ণ করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ সেগুলো হলো:

০১. কেউ খাদ্যের অভাবে মারা যাবে না। হেযবুত তওহীদের মধ্যে গত ৩০ বছরে এই বৈষম্য হয়নি।

০২. কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। হেযবুত তওহীদে আজ পর্যন্ত কোনো সদস্য বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন এমন নজির নেই।

০৩. বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাবে না। শীতবস্ত্রও এই অঙ্গীকারের আওতাধীন।

০৪. বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাবে না। একদিকে কেউ আলিশান বাড়িতে থাকবে আর অন্যদিকে আরেকজন সদস্য রেলস্টেশনে ঘুমাবে, এমন অমানবিক জাহেলি সিস্টেম হেযবুত তওহীদে নেই। আমরা ন্যূনতম মানের হলেও বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটা তার মানবাধিকার।

০৫. কেউ জীবনের জন্য অপরিহার্য শিক্ষা ও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে না। আল্লাহর রসুল বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ (ইবনে মাজাহ, তাবরানি)। সেটা কোন জ্ঞান? সেটা হচ্ছে আল্লাহর নীতিমালা ও বিধিবিধান মেনে জীবনযাপনের জন্য ও নিজের জাতিসত্তা বোঝার জন্য ন্যূনতম জ্ঞান। এ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করেছি। পাশাপাশি কারিগরি, প্রযুক্তিজ্ঞান এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। জীবন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

আমাদের মূলনীতিসমূহ
(Our Principles)

১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার শুরুতেই এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলো সুস্পষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলো আজও অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হচ্ছে। নীতিমালাগুলো হলো-

০১. **প্রকাশ্য কার্যক্রম:** হেযবুত তওহীদের কোনোরূপ গোপন কার্যক্রম থাকবে না, সবকিছু হবে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

০২. **আইন মান্যতা:** কেউ কোনো আইন ভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইনের হাতে সোপর্দ করবেন।

০৩. **সবাইকে নিয়ে কাজ:** শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবে।

০৪. **ধর্মীয় সম্প্রীতি:** অন্য কোনো ধর্মের অবমাননা করবে না এবং অন্য কোনো ধর্মের প্রবর্তক, অবতার, ধর্মগুরু, ধর্মগ্রন্থ বা উপাসনালয়ের সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করবে না।

০৫. **বাইরের অর্থ নিষিদ্ধ:** যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য বা সমর্থক নয় তাদের কাছ থেকে আন্দোলন পরিচালনার কাজে কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

০৬. **স্বার্থের রাজনীতি নিষিদ্ধ:** হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য প্রচলিত স্বার্থভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

০৭. **বৈধ উপার্জন:** কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকবে না, বৈধ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করবে। সেই উপার্জিত অর্থ থেকে তারা যা দান করবেন তা দিয়ে আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

০৮. **দীনের বিনিময় নিষিদ্ধ:** ধর্মীয় কাজ করে কেউ কোনোরূপ স্বার্থ হাসিল বা বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না, বিনিময় নিবে আল্লাহর কাছ থেকে। ইসলামের কাজ হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, মানবতার কল্যাণে। যারা দীনের বিনিময় নেয় তাদের পেছনে নামাজ পড়া বা তাদের অনুসরণ করা যাবে না। (সুরা ইয়াসিন ৩৬:২১)।

সমাধানসূত্রঃ কথা বলতে চাই
(Way Out: We Want to Speak)

আল্লাহর রসুল (সা.) আল্লাহর দেওয়া যে ইসলাম কায়েম করেছিলেন, ইতিহাসের কাল পরিক্রমায় সেই সহজ সরল ইসলামের প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে। মহান আল্লাহ অতীব করুণা করে হেযবুত তওহীদকে আবার সেটা দান করেছেন। আমরা বলতে চাই, বাংলাদেশ তথা সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য সেই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছাড়া যাবতীয় সংকট থেকে মুক্তির আর কোনো পথ নেই। গত ৩০ বছর ধরে হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলাম মানবজাতির সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে শত শত ইসলামি দল ওয়াজ মাহফিল, সভা-সেমিনার, জনসভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে কথা বলে যাচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদল, শত শত রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্লাটফর্মে বিভিন্নভাবে কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু হেযবুত তওহীদকে প্রতিষ্ঠাকাল হতে আজ পর্যন্ত মুক্তভাবে কথাই বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

প্রকৃত তওহীদ অর্থাৎ কলেমার প্রকৃত অর্থ (ঈমান) এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আল্লাহ প্রদত্ত কর্মসূচি, প্রক্রিয়া বা তরিকা মানুষের সামনে উপস্থাপনের অধিকার হেযবুত তওহীদের অবশ্যই রয়েছে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার ও দায়িত্ব (সুরা ইউনুস ১২:১০৮)। বাংলাদেশের আইন মান্যকারী আন্দোলন হিসাবে আমাদের এই প্রস্তাবনা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা আমাদের মৌলিক ও মানবাধিকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্য যে, এ যাবৎকালে আমাদেরকে এই অধিকার চর্চা করতে দেওয়া হয়নি। আমাদের বক্তব্য মানুষ গ্রহণ করবে কি করবে না সেটা তাদের স্বাধীনতা (সুরা কাহাফ ১৮:২৯)। হেযবুত তওহীদের এই ন্যায়সঙ্গত ও আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার অর্থাৎ নির্বিঘ্নে উন্মুক্ত পরিবেশে মানুষের কাছে এই সত্য পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া হোক। আমরা মনে করি এই সংকটকালে আমাদের এই প্রস্তাবনাই পারবে দেশ ও জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে।

ইসলামের প্রকৃত আকিদা (The True Concept of Islam)

এই দীনের সমস্ত আলেম ও ফকিহদের অভিমত হচ্ছে এই যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ইত্যাদি এবং তাছাড়াও আরও হাজারো রকমের ইবাদতের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতই এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমানভিত্তিক সমস্ত ইবাদত অর্থহীন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী?

আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept। কোনো জিনিস দিয়ে কী হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত ইবাদত, আমল নিষ্ফল।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কেউ আপনাকে একটি মোটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মোটর গাড়িটি ইসলাম- আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদীস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদির আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও, মিউজিক প্লেয়ার লাগানো হয়েছে, গাড়িটিকে

সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমনভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য যে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করা। কিংবা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনা, ক্যাসেটে সঙ্গীত শোনা। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ক্যাসেট বাজাবেন। আপনি মনে করবেন এটা বসার একটি আরামদায়ক স্থান।

এই হলে আপনার আকিদা ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ক্যাসেট, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, ইমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে আকিদা সঠিক না হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং ঈমানভিত্তিক অন্যান্য সকল আমল, ইবাদতও অর্থহীন।

একটি গাড়ির প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশের পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সমগ্র গাড়ির মূল উদ্দেশ্য একটা- সেটা হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া। এই যন্ত্রাংশগুলো যত উন্নতমানেরই হোক না কেন, কেউ যদি গাড়ির মূল উদ্দেশ্যই ভুলে

যায় তাহলে এই সব যন্ত্রাংশের আলাদা কোনো মূল্য থাকে না। ঠিক একইভাবে ইসলামের আমলগুলোরও পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য রয়েছে। **কিন্তু খোদ দীনুল হক, ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবন থেকে অন্যায় অবিচার অশান্তি নির্মূল করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যটা আজকে মুসলিমরা ভুলে গেছে।** তারা নামাজ, রোজা, হজ, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি আমলগুলো নিখুঁতভাবে পালন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু এসব আমলের দ্বারা ইসলামের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা- সেটাই অর্জিত হচ্ছে না। তাই সব আমল পণ্ডশ্রম হচ্ছে। ঐ মালিকের মতো আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদীস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি, ধোয়ামোছা করে ঝকঝকে তকতকে করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যতটুকু জানি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের ধর্ষণ করে গর্ভবতী করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, এই আকিদা ভুলের কারণে হাজারো ইবাদত করা সত্ত্বেও যেমন অন্যান্য জাতির কাছে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে তেমনি আখেরাতেও ঐ সমস্ত ফরজ, সুন্নত, নফল ইবাদতসহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ আকিদাবিহীন ঈমান ও আমল সমস্তই অর্থহীন।

ইসলামের বহু বিধান রয়েছে- নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জেহাদ, কিতাল ইত্যাদি। মনে করুন এই বিধানগুলোকে একেকটি ফুল। আর ইসলামকে মনে করুন সেই ফুলগুলো দিয়ে তৈরি মালা। ফুলগুলোকে যতক্ষণ না একটি সুতো দিয়ে একত্রে গেঁথে সেই সুতোটি গিঁট দেওয়া হবে ততক্ষণ কি সেটা মালা হতে পারবে? পারবে না। এই সুতোর গিঁটটাই হচ্ছে আকিদা। আমরা বিয়ের ব্যাপারে 'আকদ' শব্দটি ব্যবহার করি একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর 'সংযোগ করে দেওয়া' বোঝাতে। অর্থাৎ যে জ্ঞান বা ধারণার মাধ্যমে ইসলামের সমস্ত বিধান,

সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত রীতি-নীতি এবং আল্লাহর রসুলের সংগ্রামী জীবনের সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়া একটি সূত্রে সমন্বিত থাকে সেটাই আকিদা।

একটি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ থাকে। যার গাড়ি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই তাকে যদি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দিয়ে সেগুলো সংযুক্ত করতে বলা হয় তিনি কি পারবেন? সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, তিনি ব্যর্থ হবেন। গাড়ির ইঞ্জিন কোথায় বসবে, গিয়ার বক্স কোথায় বসবে, লুকিং গ্লাস কোথায় বসবে, চাকা কোথায় বসবে, আবার হয়ত কোনো যন্ত্রাংশ গাড়ির অংশই নয়, ক্ষতিকর, সেটা ফেলে দিতে হবে- এসব কিছুই তিনি জানেন না বিধায় যন্ত্রপাতি বা পার্টসগুলো সঠিকভাবে স্থাপন করতে পারবেন না এবং চূড়ান্তভাবে একটি গাড়ির যে উদ্দেশ্য থাকে অর্থাৎ মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া সেই লক্ষ্যও ওই ব্যক্তিকে দিয়ে অর্জিত হবে না। তা কেবল তিনিই পারবেন যিনি গাড়ি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। ১৪০০ বছরের কালপরিক্রমায় এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কিতাবের অনুসারী এক জাতিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাড়ির যন্ত্রাংশের মতই ভেঙে আলাদা আলাদা করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আজ বিভিন্ন ফেরকা, মাজহাব, তরিকা, দল উপদল ইত্যাদি ওই ভাঙা গাড়ির ভিন্ন ভিন্ন অংশকেই 'গাড়ি' মনে করছেন। গাড়ির যে কাজ সেটা তো শুধু লুকিং গ্লাস দিয়ে হাসিল করা যায় না, হোক সেটা গাড়ির অংশ। অথচ সেটাই করার চেষ্টা হচ্ছে। কেউ অতি নিখুঁতভাবে গাড়ির চাকা পরিষ্কার করছেন, ইঞ্জিন পরিষ্কার করছেন, লুকিং গ্লাসের ধুলোবালি মুছছেন, ক্যাসেট প্লেয়ার মেরামত করছেন এবং মনে করছেন খুব সওয়াবের কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু সম্যক ধারণা নেই বলে সমস্ত যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করে যে গাড়িটির পূর্ণাঙ্গতা দিবেন এবং তারপর সেই গাড়িটি চালিয়ে গন্তব্যস্থলে যাবেন সেটা কেউ করছেনও না, জানছেনও না।

মানুষের সামগ্রিক জীবনের দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী, পৃথিবীর অন্যতম সমরনায়ক ও সফল বিপ্লবী মহানবী মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল এই ব্যাপারে বর্তমানের মুসলিম নামক জাতির সদস্যদের কাছে প্রশ্ন করলে একেক জনের কাছে একেক রকম জবাব পাওয়া যাবে। কিন্তু রসুলাল্লাহর মাত্র ২৩ বছরের সাধনায় ও সংগ্রামে যে ঐক্যবদ্ধ, অপ্রতিরোধ্য, দুর্নিবার ও দুর্ধর্ষ জাতিটি তৈরি হয়েছিল তাদেরকে যদি প্রশ্নটা করা হত নিঃসন্দেহে সবার কাছেই একই জবাব পাওয়া যেত। কারণ তারা আকিদা শিক্ষা করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছে থেকে।

কোর'আনের অন্তত তিনটি আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন তিনি কেন রসুল প্রেরণ করেছেন। সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯ ও সুরা

তওবা ৯:৩৩- এই তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাঁর রসুল সম্পর্কে আকিদা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তাঁর রসুলকে হেদায়াহ ও দীনুল হক্বসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দীনের উপর এটাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যয় করেছেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের লক্ষ্য (আকিদা) ভুলে গিয়ে লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকেই আজ লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে মুসলমান জাতি। গত কয়েক শতাব্দীতে সামরিক শক্তিবলে পরাজিত করার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদেরকে শাসন ও শোষণ করেছে। বর্তমানে তারা মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে টার্গেট করেছে। এটা হচ্ছে সভ্যতার সংঘাত যার কথা স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন লিখে গেছেন। মুসলমানদের দেশগুলো তারা একের পর এক ধ্বংস করে ফেলছে, গণহত্যা চালাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান আজ উদ্বাস্তু। কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই আগ্রাসন যে মোকাবেলা করবে, তা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। এই অবস্থায় জাতির করণীয় ছিল দুইটি- প্রথমত নিজেদের মধ্যে যাবতীয় মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহর রসুলের সংগ্রামী জীবনকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে তিনি যেই কর্মপন্থায় যেই লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন সেই কর্মপন্থা মোতাবেক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু হায়! ঐক্যবদ্ধ হবার সমস্ত পথই যে বন্ধ। দীনের প্রকৃত আকিদা ভুলে গিয়ে, আল্লাহর রসুলের আগমনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে, তওহীদের রশি ছেড়ে দিয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ছোট-খাটো বিভিন্ন আমল নিয়ে তর্ক, বাহাস, মারামারি ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকে ঐক্যের সমস্ত দরজাতেই তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দীনের ছোট খাটো কম প্রয়োজনীয়, এমনকি অপ্রয়োজনীয় বিষয়েও বাড়াবাড়ি রকমের অতি বিশ্লেষণ করতে করতে ছোট খাটো বিষয়ের মধ্যেই জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে নিবদ্ধ হয়ে গেছে যে, সেখান থেকে মাথা তুলে এক নজরে আল্লাহর রসুলের সামগ্রিক জীবনটাকে দেখার ও উপলব্ধি করার সক্ষমতা তাদের নেই। এমতাবস্থায়, এই জাতির ঐক্যের সূত্র কী হতে পারে এবং আল্লাহর রসুল কীজন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, কী লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন এবং জাতির উপর কী দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন, তা জাতির সামনে তুলে ধরার মহৎ উদ্যোগটি নিয়েছে হেযবুত তওহীদ। হাজারো বিকৃতি ও মতভেদের পাহাড় সরিয়ে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলামের যে আকিদা হেযবুত তওহীদ উপস্থাপন করছে তা যদি জাতি উপলব্ধি করতে পারে তাহলে এখনও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

ইসলামী বক্তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন 'আকিদা' বিষয়টি ইসলামের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা আলোচ্য বিষয় নয়। তাদের উদ্দেশে আমাদের কথা হচ্ছে, ইসলামের যে কোনো আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে নিয়ত করা। ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর সংকলিত বোখারি শরিফের প্রথম যে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি হচ্ছে- ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত অর্থাৎ প্রত্যেকটি আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কাজটি কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে সেটা না জানা থাকলে বা ভুল হলে আমলেরই কোনো মূল্য থাকবে না। এই উদ্দেশ্যই হচ্ছে আকিদা। আকিদা শব্দটির প্রকৃত অর্থ না জানার কারণেই কেউ কেউ এ ভুলটি করেন। আকিদা যদি গুরুত্বহীন বিষয় হত তাহলে ইমাম আবু হানিফাসহ (রহ.) ইসলামের প্রাথমিক যুগের ফকিহ ও মুজতাহিদগণ আকায়েদ নিয়ে এত বিপুল সংখ্যক বই লিখতেন না। এখনও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ইসলাম শিক্ষা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম থাকে 'আকায়েদ'। উপরে দেওয়া গাড়ির উদাহরণে বলে এসেছি, গাড়ি তৈরি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিবহন। কিন্তু এই কথাটি গাড়ির ম্যানুয়ালে লেখা থাকে না, গাড়ির গায়েও লেখা থাকে না। কারণ গাড়ির উদ্দেশ্য সর্বজনবিদিত, সর্বত্র গৃহীত; কাজেই এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। ঠিক ইসলামের ব্যাপারটিও তেমনি। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা, তাই স্বভাবতই এটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিষ্ঠা ছাড়া জীবনব্যবস্থা অর্থহীন।

তাহলে অতি সংক্ষেপে ইসলামের প্রকৃত আকিদা হল এমন:

» **ইসলামের প্রধানত দুটো অংশ:** উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া।

» ইসলামের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর নাজিল করা সত্যদীন মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করে সর্বরকম অন্যায় অবিচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

» উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হল জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম, জেহাদ ও কেতাল।

» সেই সংগ্রাম করার জন্য প্রয়োজন একটি নিখুঁত কর্মসূচি। এটাও আল্লাহ দিয়েছেন। তা হচ্ছে ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, হিজরত ও জেহাদ এই পাঁচ দফা।

» এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি জাতি বা উম্মাহ। সেই উম্মাহর চরিত্র অর্জনের জন্য দরকার প্রশিক্ষণ। সেটাও আল্লাহ দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে- সালাত, যাকাহ, হজ, সওমসহ আরো অন্যান্য আমল যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, সামরিক ও মানসিক চরিত্র হাসিল হবে।

তাহলে মানুষের প্রথম কাজ হল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদের উপর ঈমান আনা। যারা ঈমান আনবে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি উম্মাহ গঠন করবে। তাদের একজন ইমাম থাকবেন। তাঁর নেতৃত্বে উম্মাহর সদস্যরা সালাতসহ অন্যান্য

আমলের মাধ্যমে মো'মেনের চরিত্র হাসিল করবে। সেই চরিত্র দিয়ে তারা ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে আল্লাহ-প্রদত্ত কর্মসূচি অনুসরণ করে জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম, জেহাদ করবে। তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

ফলে দীন প্রতিষ্ঠা হবে। সেই দীনের ফল হবে ন্যায়, সুবিচার এক কথায় শান্তি অর্থাৎ ইসলাম। মানবসৃষ্টির প্রারম্ভে ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে মানুষ পৃথিবীতে অন্যায় অশান্তি ও যুদ্ধ রক্তপাত ঘটাবে। মানুষের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর বুকে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহ বিজয়ী হবেন এবং ইবলিস পরাজিত হবে। আল্লাহকে বিজয়ী করার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ যে খেলাফত দিয়েছেন তা সার্থকতা পাবে। এর পুরস্কারস্বরূপ পরকালে ঐ মো'মেনদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন।

আর যারা আল্লাহকে এই পৃথিবীতে বিজয়ী করার জন্য ঈমান আনবে না, চরিত্র হাসিল করবে না, সংগ্রাম করবে না, জানমাল দেবে না তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। এই হচ্ছে অতি-সংক্ষেপে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আকিদা বা Comprehensive concept.

সালাত (নামাজ) উম্মাহর বাস্তব জীবনের নকশা
(Salat: A Pattern for the Real Life of the Ummah)

সালাত বা নামাজ হলো ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী বিধানের দ্বিতীয়টি। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের (তওহীদ) উপর ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতকেই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে ধরে নিয়ে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সালাত যাতে সহিহ-শুদ্ধ হয়, আল্লাহর কাছে কবুল হয়, এ উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে ওজু-দোয়া-দরুদ ইত্যাদি করার জন্য অগণিত বই লেখা হয়েছে। এমনকি শুধু নিয়মিত নামাজ পড়ার উপদেশ দেওয়ার জন্যই গড়ে উঠেছে বহু সংস্থা, সংগঠন, দল-উপদল। কিন্তু এত কিছুর পরও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এই যে, আল্লাহ কেন নামাজের বিধান দিয়েছেন, নামাজের উদ্দেশ্য কী, নামাজ আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয় সেই আকিদাটাই আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে।

যে কোনো কিছুরই সৃষ্টির উদ্দেশ্য আছে। আসমান-জমিনসহ কোনো বস্তুই আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তেমনি ইসলামেরও একটি উদ্দেশ্য আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে- মানবজাতির জীবনের যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। একইভাবে দীনের যেসব আমলের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, সেগুলোরও উদ্দেশ্য আছে। তাহলে সালাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যাকে আল্লাহ কোর'আনে বিরাশি বারেরও বেশি উল্লেখ করলেন তা কি বিনা উদ্দেশ্যে হতে পারে? অবশ্যই তার একটি উদ্দেশ্য আছে। সেটা কী? সেটা হচ্ছে সালাতের মাধ্যমে মো'মেনদেরকে মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। যেন সে নিজেকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করার চারিত্রিক গুণ (Attribute) ও আত্মিক শক্তি লাভ করে যাবতীয় লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন-

ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি:

সালাত জাতিকে 'ঐক্য' শিক্ষা দেয়। লক্ষ্যের ঐক্য, উদ্দেশ্যের ঐক্য। একেকজন একেক স্থান থেকে এসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কাতারবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে অর্থাৎ কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে মো'মেনদের মধ্যে একদিকে লক্ষ্যের ঐক্য তৈরি হয়, অন্যদিকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। তারা মনে করে- আমার পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি আমারই ভাই। আমরা একই প্রভুর সৃষ্টি। নিজেদের মধ্যে যতই বিভেদের কৃত্রিম আবহ তৈরি করে রাখি না কেন, আল্লাহর সামনে আমাদের অবস্থান একই সারিতে। আমাদের যাত্রাও একই অভিমুখে, সত্য ও ন্যায় তথা আল্লাহর অভিমুখে। আমার পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি শিক্ষিত নাকি নিরক্ষর, দরিদ্র নাকি ধনী, সাদা নাকি কালো তা আমি দেখব না।

নামাজের কাতারকে বলা হয় 'সফ'। কেন সফ বলা হয় তার উত্তর আল্লাহ সুরা সফেই দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা সীসা গলানো প্রাচীরের মত 'সারিবদ্ধভাবে' তাঁর পথে সংগ্রাম করে (সুরা সফ ৬১:৪)। অর্থাৎ সালাতের এই সফ কেবল সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই সফ আসলে মো'মেনদের বাস্তব জীবনের ঐক্যের প্রতীক। সুতরাং যারা সালাত কায়েম করবে তারা সর্বদা মনে রাখবে আমরা সজাগ-সচেতন থাকব যাতে আমাদের জাতির মধ্যে কেউ ঐক্য নষ্ট করতে না পারে, ভ্রাতৃত্বে ফাটল ধরাতে না পারে। ঐক্য নষ্ট হয় এমন কথা বলব না, এমন কাজ করব না। শিরক, কুফর, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকব। দৈনিক পাঁচবার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের এই অনুপম শিক্ষা দেয় সালাত। এ কারণে সালাত এত গুরুত্বপূর্ণ।

শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি:

কীভাবে ওজু করব, কীভাবে দাঁড়াবো, কীভাবে পোশাক-পরিচ্ছেদ পরব, কীভাবে ওঠা-বসা করব, কীভাবে রুকু করব, কীভাবে সেজদা করব ইত্যাদি প্রায় শতাধিক নিয়ম-শৃঙ্খলা মাথায় রেখে সালাত কায়েম করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সালাতে সামিল হতে হয়, কাতার ধনুকের ছিলার মত সোজা করতে হয়, এক পায়ে দাঁড়ানো যাবে না, এদিক ওদিক তাকানো যাবে না, চোখ বন্ধ রাখা যাবে না, রুকুতে পিঠ কুঁজো হওয়া যাবে না, ঢিলেঢালাভাবে সালাত করা যাবে না, মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে, ইমামের তকবিরের আগে বা পরে যাওয়া যাবে না, হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে আনুগত্য করতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সুরা-কেরাত-তাসবিহ পাঠ করতে হবে- এভাবে বলতে গেলে সালাতের নিয়ম শৃঙ্খলা অসংখ্য। এই সবগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলা মাথায় রেখে সালাত কায়েম করার ফলে মো'মেনদের চরিত্রে অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ তৈরি হয়। তাদের প্রত্যেকটি কাজ হয় শৃঙ্খলামাফিক। যার যেমন খুশি তেমন না করে তারা জাতিগতভাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে জাতীয় যে কোনো

সমস্যার মোকাবেলা করে। যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের মত যে কোনো অন্যায় দূর করার জন্য এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতির কোনো বিকল্প নেই।

আনুগত্যবোধ সৃষ্টি:

জামাতে ফরজ সালাতে ইমামের কোনো বিকল্প নেই। ইমামের তকবিরের সাথে সাথে মুসল্লিরা রুকু করবে, সেজদা করবে, সালাম ফেরাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ ইমামের হুকুম পালন করতে হবে। কেউ ইমামের আনুগত্যের বাইরে গেলে সালাত হয় না। প্রতিদিন একজন লোক ১৭ রাকাত ফরজ সালাতে ইমামের আনুগত্য করে। ইমাম রুকুতে গেলে সে রুকুতে যায়, ইমাম সেজদায় গেলে সে সেজদায় যায়। এক মুহূর্তের জন্যও সে ইমাম সাহেবের কমান্ডের বাইরে যেতে পারে না। এভাবে তার চরিত্রে আনুগত্যবোধ তৈরি হয়।

এটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, কোনো জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মধ্যে একজন আদেশদাতা না থাকে এবং সেই আদেশদাতার আদেশ শর্তহীন, প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীনভাবে পালন করা না হয়। এ কারণেই আল্লাহর রসুল বলেছেন- আমীর নাক কানকাটা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের নিগ্রো ক্রীতদাস হলেও তার আনুগত্য করবে (হাদীস)। কারণ একজন নেতার কথাকে যদি জাতির সকলে শর্তহীনভাবে আনুগত্য না করে তবে জাতি বড় কোনো সঙ্কট মোকাবেলা করা তো দূরের কথা, নিজেরাই নিজেদের সঙ্কট হয়ে দাঁড়াবে। সালাত থেকে নির্দ্বিধায় আদেশ পালনের শিক্ষা নিয়ে যখন একটি জাতি তাদের আদেশদাতার প্রতিটি আদেশ পালন করাকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করবে তখন সেই জাতি পৃথিবীর যে কোনো সঙ্কটকে অবলীলায় মোকাবেলা করতে পারবে সন্দেহ নেই।

আজকে মুসলিম বিশ্বের একক কোনো আদেশদাতা নাই। সরকারগুলো যত ভালো নির্দেশই দিক দেখা যায় সে নির্দেশ মানার চেয়ে না মানার দিকেই জনসাধারণের ঝোঁক থাকে বেশি। জাতির মধ্যে কোনো আনুগত্যবোধ নেই। কারণ নামাজের যে প্রকৃত শিক্ষা তা তারা জানেও না, বোঝেও না, তাই চরিত্রে ধারণ করতেও পারে না। নামাজের কয়েক মিনিট ছাড়া মসজিদের বাইরে ইমাম সাহেবের মতামতেরও কোনো মূল্য দেওয়া হয় না। ইমাম সাহেব যতই সুদ, ঘুষ, অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলুক, মানুষ শোনে না। তাকে ভাবা হয় নামাজের ইমাম, কেবল নামাজের সময়েই যার নির্দেশ মানার যোগ্য; সমাজ নিয়ে, বাস্তব দুনিয়া নিয়ে তার কথা বলার অধিকারই নেই। অথচ নামাজের প্রকৃত আকিদা জানা থাকলে এমনটা হবার কথা ছিল না। নামাজ মো'মেনদের

মধ্যে আনুগত্যবোধ তৈরি করত। যে কোনো ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ-উপদেশ, তা সরকারের পক্ষ থেকেই আসুক বা ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকেই আসুক, তা শর্তহীন-প্রশ্নহীনভাবে মান্য করার দায়বদ্ধতা তৈরি হত।

শারীরিক সক্ষমতা অর্জন:

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি সালাত মুসল্লিদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাতের যে উঠা-বসা, রুকু, সেজদা ইত্যাদির নিয়ম-কানুন, এসব যদি ঢিলেঢালা বা দায়সারাভাবে না করে রসুলের হাদীস মোতাবেক সঠিকভাবে করা হয়, অর্থাৎ পিঠ, ঘাড়, কোমর, পায়ের পাতা, আঙ্গুল, হাতের তালু, হাঁটু, নাক, কপাল ইত্যাদি অঙ্গসমূহ হাদীসে যেভাবে সঞ্চালন করতে বলা হয়েছে সেভাবে যদি করা হয় এবং এভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতসহ নফল, সুন্নত কায়েম করা হয় তাহলে তা ব্যায়ামের মতই কার্যকরী হবে। শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিতে সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে যুবুথুবু হয়ে সালাত কায়েম করা হয় তা মুসল্লিদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না।

সালাতের আত্মিক ভাগ:

এতক্ষণ আলোচনা করেছি সালাতের মানসিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- মানুষ যেমন দেহ-আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট জীব, তেমন দীনুল হক্কেও আল্লাহ দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তৈরি করেছেন। ইসলামের অন্যান্য বিধানের মতই সালাতও তাই কেবল জাতির বাহ্যিক, মানসিক বা শারীরিক প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়, এর আত্মিক ভাগও যথেষ্ট প্রবল।

মো'মেন যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন সে মনে মনে ভাববে- হে আল্লাহ, তুমি তোমার নবীর মাধ্যমে আমাদের প্রতি যে মহাদায়িত্ব অর্পণ করেছ (পৃথিবীতে ন্যায় ও শান্তি স্থাপন করা), সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে চরিত্র দরকার, সেই চরিত্র সৃষ্টির প্রশিক্ষণ নিতে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। তুমি দয়া করে আমাদেরকে সেই চরিত্র, আত্মিক শক্তি দান কর যাতে আমরা মানবজীবনে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থাকতে পারি, আমাদের জীবন-সম্পদ, পুত্র-পরিজন মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করতে পারি।

সালাতে দাঁড়িয়ে মো'মেনরা সর্বদা মনে রাখবে- আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সবার মনের খবর জানেন। যখন একজন মো'মেন রুকুতে যায় তখন সে কার্যত আল্লাহর

বিশালত্বের সামনে বিনীত ও বিনয়নম্র হয়, আত্মসমর্পিত ভঙ্গিতে আল্লাহর মহীমা ঘোষণা করে। তারপর যখন সেজদায় যায় তখন সে কার্যত ত্রুটিহীন (সোবহান) প্রভুর সামনে তার দেহমনসহ সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করে। সে মুখে আল্লাহর বিশালত্ব ও অসীম উচ্চতার ঘোষণা দেয় এবং মাথা মাটিতে ঠেকানোর মাধ্যমে নিজের সীমাবদ্ধতা ও ক্ষুদ্রতা স্বীকার করে নেয়। একজন মো'মেন যখন সর্বাবস্থায় মহান স্রষ্টার তুলনায় নিজের এই ক্ষুদ্রতার কথা স্মরণ রাখে, তখন সে আর উদ্ধত, অহংকারী ও স্বৈরাচারী হতে পারে না। বাস্তব জীবনে সে আল্লাহর প্রতিটি হুকুম মেনে চলে। মানুষের সাথে বিনীত ও মার্জিত আচরণ করে। শয়তানের প্ররোচনায় কখনও গাফেল হয়ে গেলে, লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলে, ঐক্য নষ্ট করলে, অপর কোনো মো'মেন ভাইয়ের সাথে খারাপ আচরণ করলে, পরবর্তী ওয়াক্তে সালাতে দাঁড়িয়েই সে লজ্জিত হবে, অনুতপ্ত হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে। এজন্যই সালাতের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সংস্কার। সালাত বা সালাহ শব্দটি এসেছে আসলাহা থেকে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'সংশোধন' বোঝাতে (সুরা আন'আম ৬:৪৮)।

যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা (জেহাদ):

অর্থাৎ বোঝা গেল- সালাত বা নামাজের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া এবং জীবন-সম্পদকে উৎসর্গ করার আত্মিক দৃঢ়তা দান করা, পাশপাশি যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হবার উপযোগী চরিত্র তৈরি করা। নামাজ অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র তৈরি করে বলেই আল্লাহ বলেছেন- নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত ২৯:৪৫)।

বস্তুত অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (জেহাদ) করা প্রত্যেক মো'মেনের দায়িত্ব। এ কাজ না করে কেউ মো'মেন থাকতে পারে না। মো'মেন হওয়ার অর্থই তাকে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। কিন্তু এ সংগ্রামে সফল হতে হলে জাতির মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও আত্মিক প্রেরণার বিকল্প নেই। সেটা সৃষ্টি করে সালাত।

সুতরাং আজ দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে যখন বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, অন্যায়, অবিচার, হানাহানি, রক্তপাত চরম আকার ধারণ করেছে, আমাদের দেশ নিয়েও ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়েছে এবং এমতাবস্থায় দেশের ১৭ কোটি মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীসাঢালা

প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ হবার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে, তখন জাতির ধর্মবিশ্বাস বিরাট এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। নামাজসহ ইসলামের যাবতীয় বিধানের সঠিক আকিদা প্রচার করা গেলে সাধারণ মানুষ তাদের ঈমানী চেতনা থেকে নিজেরাই দেশবিরোধী অপশক্তি ও অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে- এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী।

ধর্মবিশ্বাসঃ এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান
(Religion: The Simple Solution to a Big Problem)

১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছিল খ্রিষ্টধর্মের গোড়ামি থেকে মানুষের চিন্তাকে মুক্ত করার জন্য। এর কারণ মধ্যযুগের খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বিজ্ঞানবিরোধী ছিলেন, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে তারা ধর্মবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বহু বিজ্ঞানী ও যুক্তিশীল মানুষকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। তখন থেকেই ধর্মবিরোধী একটা মনোভাব ইউরোপকে পেয়ে বসেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে ইউরোপ যখন শিল্পবিপ্লব ঘটালো, তখন তারা এত বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করল যে সেই পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহের লক্ষ্যে তারা বাকি দুনিয়ায় নিজেদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করল। তখন তাদের মাধ্যমে ধর্মবিরোধী সেই মানসিকতাও তাদের উপনিবেশগুলোতে বিস্তার লাভ করল। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেও ধর্মবিরোধী, ধর্মহীন একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী উপনিবেশগুলোতে সৃষ্টি করা হল যারা মানসিকভাবে পাশ্চাত্য প্রভুদের দাস আর পেশাগতজীবনে উপনিবেশের কেরানি।

এভাবেই গত কয়েকশ বছর ধরে ধর্মবিদ্বেষ আমাদের সমাজে ও মননে ঠাঁই করে নিয়েছে। চলমান রাষ্ট্রকাঠামোতে ধর্মের কোনো গুরুত্ব বা কর্তৃত্ব নেই। ধর্ম এখানে কেবল ব্যক্তিগত উপাসনা ও বিশ্বাসের জায়গায় রয়েছে। তবুও রাষ্ট্রনায়কদেরকে সদা-সর্বদা ধর্মীয় উগ্রবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। এমনকি ধর্ম, ধর্মীয় উগ্রবাদ ও ধর্মভিত্তিক বিভাজনই হয়ে দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ। রাষ্ট্র যতই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলুক, রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ের মন যুগিয়ে চলতে বাধ্য হয়। ধর্মের উদ্দেশ্যমূলক অপব্যবহারের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয় ধর্মীয় উন্মাদনা, মবোক্র্যাসি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাই ধর্ম আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। তাই তো নির্বাচন এলে স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারাও হজ করেন, মুসল্লি সাজেন, ধর্মের পক্ষে বুলি আউড়ান। প্রশ্ন হল, ধর্ম এত বাজে, এত সেকেলে, এত অচল, এত আফিম- তবু কেন এত চেষ্টা করেও ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে বাদ দেওয়া গেল না? মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে ধর্ম থেকে মুক্তির জন্য

কত কিছুই না করা হচ্ছে, অশ্লীলভাবে আল্লাহ-রসুলকে আক্রমণ করা হচ্ছে, তবু কেন ঘুরে ফিরে ধর্মই আমাদের জীবনের প্রধান আলোচিত বিষয় হয়ে রয়ে যাচ্ছে? এর কারণ-

ক) স্রষ্টার প্রতি সহজাত বিশ্বাস:

প্রতিটি মানুষের মধ্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার আত্মা, রূহ আছে (সুরা হিজর ২৯)। যে তাঁকে বিশ্বাস করে না, তার মধ্যেও স্রষ্টার আত্মা রয়েছে। এর শক্তিশালী প্রভাব মানুষের চিন্তা-চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকে। এজন্য যখনই তারা অসহায় অবস্থায় পড়ে তখন তারা সর্বশক্তিমান সত্তার কাছে আশ্রয় চায়। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট নির্দশন প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলো বিবেচনা করেও মানুষ সেই মহান সত্তার সামনে মস্তক অবনত করে। একটি শ্রেণির দেখাদেখি বা অন্যের কথা শুনে তারা নাস্তিক হয়ে যায় না। উপরন্তু আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় গাম্ভীর্য তাদের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। তাই অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে পবিত্র জ্ঞান করে সম্ভ্রমের সাথে পড়ছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং যতদিন সৃষ্টিজুড়ে স্রষ্টার নিদর্শন টিকে থাকবে, ধর্মগ্রন্থগুলো থাকবে, মানুষের ভিতরে স্রষ্টার আত্মা বিরাজিত থাকবে ততদিন মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা করা অবান্তর।

খ) ধর্মভিত্তিক জীবনব্যবস্থার অতীত ও ভবিষ্যদ্বাণী:

অতীতে হাজার হাজার বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্মভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। সে ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও চরম নৈরাশ্যজনক। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই পাশ্চাত্য মতাদর্শের প্রচার তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের পানেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি যামানা, The Last hour), আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে, সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, কোনো অবিচার, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিময় (Kingdom of Heaven) হবে। এ বিশ্বাস তাদের ঈমানের অঙ্গ, একে মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

গ) ধর্মহীন জীবনব্যবস্থার ব্যর্থতাঃ

মানুষকে ধর্মভিত্তিক জীবনবিধান থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন বিকল্প এমন একটি জীবনব্যবস্থা রচনা করা যা তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধি দিতে পারবে, একই সঙ্গে আত্মার প্রশান্তিও বিধান করতে পারে। কিন্তু মানুষ সেটা আজ পর্যন্ত করতে পারে নি এবং কোনো কালে পারবেও না। বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু সবই মাকাল ফল, বাইরে থেকে সুন্দর, ভিতরে তিক্ত। বর্তমান স্রষ্টাবর্জিত জীবনব্যবস্থাগুলো মানুষকে স্বার্থপর, ভোগসর্বস্ব, অমানবিক জীবে পরিণত করেছে। কাজেই মানুষ এখন আবারও ডান দিকে অর্থাৎ ধর্মের দিকে ফিরে যেতে চাচ্ছে। সুতরাং মানুষকে ধর্মহীন করার যে চেষ্টা করা হয় সেটা কোনোদিন সফল হয় নি, হবেও না।

এখন একটাই করণীয়, মানুষের ঈমানকে, ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক পথে চালিত করা, এর শক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ধর্মকে মানবজীবন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তারা এখন সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসাবে প্রচার করছে যে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের একমাত্র পন্থা। তারা বলছে, ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে থাকুক কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোনো স্থান নাই। কিন্তু বাস্তবতা আলাদা। বাস্তবে ধর্ম রাজনীতির একটা প্রধান নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা লাভ করার জন্য এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মীয় দলগুলোকে সমীহ করছেন। সেক্যুলার এমনকি বামপন্থী দলগুলোও তাদের সাথে জোটবদ্ধ হচ্ছে। এই সুযোগে ধর্মীয় দলগুলো ধর্মকে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছে। আর যারা ধর্মবিরোধী তারা নিজস্ব পরিমণ্ডলে সতর্কতার সঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছেন, বাইরে বলতে পারছেন না। বাইরে নিজেদেরকেও ধর্মবিশ্বাসী ও নামাজি মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই যখন অবস্থা, তখন আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, ধর্মকে বাদ দেওয়ার চিন্তা থেকে সকলেরই ফিরে আসা উচিত। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, তাদের এই বিশ্বাসকে কেউ যেন ধ্বংসাত্মক মানবতাবিরোধী কাজে ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য এই বিশ্বাসকে সঠিক খাতে, মানবতার পক্ষে, গঠনমূলক কাজে লাগাতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব তা আমরা দেশজুড়ে হাজার হাজার সেমিনার, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে তুলে ধরেছি, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখে সমাজের শিক্ষিত সচেতন মানুষের সামনে তুলে ধরেছি। আমাদের এই

প্রস্তাবের মূল ধারণা হচ্ছে, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক প্রতিষ্ঠান করে রাখা যাবে না, বরং রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে ধর্মকে ব্যক্তিগত উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতার জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে। এতে করে ধর্ম জাতি ও রাষ্ট্রের কোনো উপকারে আসতে পারছে না, কেবল ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ধর্ম সম্পর্কে, ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে সঠিক ধারণা মানুষকে প্রদান করতে হবে। কারণ ইসলামের সকল আলেম-ওলামা ও ফকীহগণ একমত যে- আকিদা ঠিক না থাকলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আর স্বভাবতই ঈমানের মূল্য না থাকলে ঐ ঈমানভিত্তিক আমলেরও কোনো মূল্য থাকে না। তাই ইসলাম-শিক্ষা বইগুলোর প্রথমেই থাকে 'আকায়েদ' অধ্যায়। সেই মহামূল্যবান আকিদা কী? আকিদা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা (Comprehensive concept)। কোনো কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হবে- সেটা জেনে বুঝে করাই আকিদা। ঘড়ির কাজ সময় দেওয়া, কলমের কাজ লেখা। এটা বোঝাই ঘড়ি ও কলম সম্পর্কে সঠিক আকিদা। এটা জানা না থাকলে সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে আমাদেরকে জানতে হবে কেন আমরা ঈমান পোষণ করব, ধর্ম বলতে কী বোঝায়, ধার্মিক কারা, কোন কাজটি প্রকৃত এবাদত, নবী-রসুলদের আগমনের উদ্দেশ্য কী, নামাজ-রোজা-হজ্ব ইত্যাদি কেন আল্লাহ করতে বলেছেন। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা বিগত ১৩০০ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হয়ে গেছে। তাই মানবজাতির ধর্মবিশ্বাস থাকলেও আকিদা ঠিক নেই, ফলে আমল অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, যিকির-আজকার ইত্যাদি নিষ্ফল হচ্ছে। এ অবস্থা বোঝাতেই আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোজা হবে না খেয়ে থাকা (উপবাস), তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা (কবুল হবে না)। তাই ধর্মের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক আকিদা বা সামগ্রিক ধারণা মানুষের সামনে সর্ব উপায়ে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই মানুষের ধর্মবিশ্বাস গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত হবে।

ধর্ম কী? ধার্মিক কারা?

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। কোনো বস্তু, প্রাণী বা শক্তি যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধারণ করে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পোড়ানোর ক্ষমতা হারালে সে তার ধর্ম হারালো। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ যে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করে এবং সেটা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় সে-ই ধার্মিক। অথচ প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট

লেবাস ধারণ করে সুরা কালাম, শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারে, নামাজ-রোজা, পূজা, প্রার্থনা করে সে-ই ধার্মিক।

এবাদত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিকোণ

আল্লাহর এবাদত করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা যারিয়াত ৫১:৫৬)। এবাদত হচ্ছে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করা। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পাখি, তরুলতা আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সেগুলো তারা অহর্নিশি করে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা তাদের এবাদত করছে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা ২:৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, অথবা আল্লাহর উপাসনা ফেলে আগুন নেভাতে যাওয়া দুনিয়াবি কাজ, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামাজ-রোজা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

নামাজ রোজা ও এবাদত যে পৃথক বিষয় তা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা রয়েছে। এখানে শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো এলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার 'এবাদত' কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হা ২০:১৪)। এমনই আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এবাদত ও সালাহ আলাদা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। মুসার (আ.) দায়িত্ব অর্থাৎ এবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হা ২০:২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

সমাজের যারা আল্লাহওয়ালা লোক হিসাবে পরিচিত তারা সমাজকে অপশক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত নাজাতের চিন্তায় মশগুল, আর ধর্মব্যবসায়ীরা ব্যস্ত স্বার্থসন্ধানে। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করলে তাদের রোজগার ও ভোজনবিলাসের সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকেই তারা জোর দেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করার জন্য দানবাক্স-মাইক নিয়ে তাদেরকে ওয়াজ করতে দেখা যায়, কিন্তু

ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল বা বাসগৃহ নির্মাণ অর্থাৎ কোনো প্রকার জাতীয় উন্নয়নের কাজে বা জনকল্যাণমূলক কাজে দান করাও যে এবাদত এটা তাদের আকিদার মধ্যে, চিন্তার মধ্যেও নেই। এবাদতের সঠিক অর্থ না বোঝার কারণে নির্যাতিতের হাহাকার, ক্ষুধার্তের ক্রন্দন মহা ধার্মিকদের কানে প্রবেশ করে না। এগুলোকে দুনিয়াবি কাজ বলে এড়িয়ে যাবার মত পাশবিক মনোবৃত্তি তাদের তৈরি হয়েছে।

মুসার (আ.) জন্য এবাদত ছিল দীর্ঘদিন ধরে ফেরাউনের দাসত্বের কবলে নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে মুক্ত করা। প্রকৃতপক্ষে নিপীড়িত জনতাকে জালেম ও অন্যায় ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্ত করে শান্তি দেওয়াই হচ্ছে মানুষের মূল এবাদত, এটাই হচ্ছে আল্লাহর খলিফা, প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের কাজ। শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর রহমাতাল্লিল আলামিন নামের অর্থই হচ্ছে সমস্ত জগতের জন্য করুণা, রহমত। সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদীরও সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে বেলাল (রা.) একদিন কোরায়েশদের নিপীড়িত ক্রীতদাস ছিল সেই বেলালকে (রা.) রসুলাল্লাহ ক্বাবার উপরে উঠে আযান দিতে আদেশ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জগদ্বাসীকে বুঝিয়ে দিলেন ইসলামের দৃষ্টিতে সবকিছুর চাইতে মানবতা ঊর্ধ্বে, মানুষ ঊর্ধ্বে। তোমরা যে পাথরের ঘরের পানে ফিরে সেজদা করছ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, মো'মেনের মর্যাদা সেই ক্বাবারও উপরে। অর্থাৎ সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে মানবতা।

আজকে সেই মানুষ নির্যাতিত, নিগৃহীত, সর্ব-অধিকার বঞ্চিত। সেই মজলুম মানুষকে জালেমের অত্যাচারের মধ্যে রেখে ধার্মিকরা মন্দির মসজিদ গির্জা প্যাগোডা বানাচ্ছেন। এই অন্তর্মুখিতা আর সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বিকার নিস্পৃহতা দেখেই কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই ধর্মকে আফিম বলবেন না তো কী বলবেন? তিনি তো ইসলামের বা কোনো ধর্মেরই প্রকৃত রূপ দেখেন নি। আজকে যেটা ইসলাম হিসাবে চলছে সেটা প্রকৃত ইসলাম নয়, প্রকৃত ইসলাম হারিয়ে গেছে ১৩০০ বছর আগেই।

বস্তুবাদী, ভোগবাদী জীবনব্যবস্থার (System) প্রভাবে মানুষ আজ এতটাই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যে, নিজের লাভ-ক্ষতি ছাড়া কিছুই ভাবার সময় তার নেই। ফলে চোখের সামনে কোনো অপরাধ হতে দেখলেও মনে করে এর প্রতিবাদ করা তার দায়িত্ব নয়, এ দায়িত্ব শুধুই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। কিন্তু সত্য হলো- সমগ্র জাতি যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়, ন্যায়ের পক্ষে না দাঁড়ায়, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাকে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে না করে তাহলে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর

একার পক্ষে শত চেষ্টা করেও সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব নয়। এজন্য মানুষের মানসিক পরিবর্তন সাধন করতেই হবে। জাতির চরিত্রের উন্নয়নই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উন্নয়ন।

স্বার্থপরের নামাজ নাই, সমাজ নাই, জান্নাত নাইঃ

আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ব্যক্তি কখনও মো'মেন-মুসলিম হতে পারে না। কারণ পবিত্র কোর'আনের সুরা হুজরাতের ১৫ নম্বর আয়াতে মু'মিন হবার শর্ত হিসেবে জীবন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সমাজ তথা মানবজাতির শান্তির লক্ষ্যে নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে প্রচেষ্টা না করলে কারও কোনো আমলই কবুল হবে না, তারা জান্নাতেও যেতে পারবে না। অন্যদিকে সমাজ হলো একদল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা যার অস্তিত্বের ভিত্তি হলো ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, ত্যাগ, কোরবানি। এই গুণগুলো মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে গেলে সেটাকে আর মানবসমাজ বলা যায় না, তখনই মানুষের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়। যে ব্যক্তি শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, দেশ-সমাজে যা হয় হোক, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না, এমন স্বার্থপরের অধিকার থাকে না কোনো সমাজে বসবাস করার। মানুষকে বুঝতে হবে যে, সে আর দশটা প্রাণীর মতো সাধারণ সৃষ্টি নয়, সে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ- সে আল্লাহর রূহ ধারণকারী, আল্লাহর প্রতিনিধি, তাকে আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছেন এবং অন্য সকল সৃষ্টিকে তার সেবায় নিযুক্ত করেছেন। এই জন্য যে, প্রতিটি প্রাণী কেবল নিজের জন্য বাঁচে কিন্তু মানুষ বাঁচবে অন্যের জন্য। মানুষও যদি কেবল পশুর মতো খায়, বংশবিস্তার করে আর মরে যায় তাহলে তার মানবজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই আমাদের জীবন তখনই সার্থক হবে যখন আমাদের দ্বারা মানবজাতির কোনো কল্যাণ হবে। সেটার পুরস্কার আমরা হাশরের দিনে পাব। আজ সমস্ত বিশ্ব যখন অন্যায় অশান্তি, যুদ্ধ, রক্তপাতে পূর্ণ তখন আমাদের সমাজ তথা প্রিয় জন্মভূমিকে যাবতীয় সন্ত্রাস, হানাহানি থেকে নিরাপদ রাখা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য, এটা ইসলামের পবিত্র আমল জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম ও ধর্মীয় কর্তব্যকে যখন এই আঙ্গিকে জাতির সামনে তুলে ধরা হবে তখন কোনো উগ্রবাদী গোষ্ঠী আর মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে হাইজ্যাক করে মানবতাবিরোধী কাজে, সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। বরং মানুষ ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করবে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদা সতর্ক থাকবে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে অগ্রাহ্যের মানসিকতা কেন?
(Why is Islam deliberately ignored in state affairs?)

শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ প্রায়শই বিভিন্ন আলোচনা সভা ও সেমিনারে ঘোষণা করে যে Islam is a complete code of life অর্থাৎ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এবং আরেকটি কথা বলেন যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে কোনো মারামারি, কাটাকাটি নেই। কিন্তু শান্তিটা কীভাবে আসবে সেই রূপরেখা তাদের জানা নেই। বাংলাদেশের অধিবাসীদের ৯০% জন্মসূত্রে মুসলমান। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যখনই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ আসে, তখন আর তারা আগ্রহী হচ্ছেন না। এ বৈপরীত্যের অন্যতম কারণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শক্তির সামরিক আধিপত্যে মুসলিম বিশ্ব ক্রমাগত পদানত হয়েছে। তাদের শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠী ইউরোপীয় রাজনৈতিক বয়ান, দর্শন, আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরবর্তী সময়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ব রাজনীতির গতিপথ আমূল পাল্টে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপনিবেশ দখলের লড়াই এবং কূটনৈতিক জোটগুলোর সংঘর্ষের ফল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। এখানে একদিকে ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ, যার নেতৃত্বে ছিল হিটলার ও মুসোলিনি, আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রপন্থী দেশগুলোর জোট-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরাজিত হলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জয়গান শুরু হয়। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, যুদ্ধের ফলাফল যদি বিপরীত হতো, তখন আজকে যারা গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা হয়েছেন তারাই মুক্তকণ্ঠে ফ্যাসিবাদের মহিমা প্রচার করতেন। যাহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা দুনিয়া গণতন্ত্রকে উদারনৈতিক বিকল্প জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু বাস্তবে তা যা করেছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল গণতন্ত্রের প্রচারিত বুলির বিপরীত। বহু দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাতে আগ্রাসন চালানো হয়েছে, আবার কখনো নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের স্বৈরশাসকদের মদদও দেওয়া হয়েছে। এভাবে বারবার তারা প্রমাণ করেছে যে,

তাদের কাছে ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে যার যার জাতিরাষ্ট্রের (Nation State) ভূরাজনৈতিক স্বার্থই বড়।

আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পর থেকে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কথিত গণতন্ত্রের চর্চা হয়ে আসছে, কিন্তু একদিনের জন্যও রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হয়নি; মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ও মানবাধিকার পায়নি। নির্বাচনে কারচুপি, প্রশাসনে দুর্নীতি, বিচারব্যবস্থাসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক দলগুলোর স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, চাঁদাবাজি এবং গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার, এসবের ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। গণতন্ত্রের এই চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে আড়াল করতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনো 'শিশু'। এই শিশুটি যেন শত বৎসরেও বড় হচ্ছে না। গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুত ন্যায়ভিত্তিক শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ- এগুলো কোনো কিছুই বাস্তবে দেখা যায়নি, এগুলো কেতাবের পাতাতেই রয়ে গেছে। তারপরও আমাদের শিক্ষিত শ্রেণি এখনো কথিত গণতন্ত্রের উপরেই আস্থা রাখতে চান। কারণ, তারা এই জটিল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যুগে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে সময়োপযোগী মনে করতে পারেন না। তারা মনে করেন যে আল্লাহর দেওয়া দীন সেকেলে, প্রাচীন, এই যুগে অচল। বরং পশ্চিমা সভ্যতা যেটিকে আধুনিক ও ভালো বলে, তারাও সেটিকেই সর্বোত্তম পন্থা বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাই আজ তাদের কাছে ভালো-মন্দের মানদণ্ড, তাদের চিন্তার প্রধান ভিত্তি, রেফারেন্স পয়েন্ট। যদিও একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, ইসলাম বা ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে কটূ কথা বলার স্বাধীনতাকেই পশ্চিমা বিশ্ব 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' বলে গণ্য করে। আর তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বলাকে বাক-স্বাধীনতা মনে করে। শত শত বছরের দাসত্বের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামপন্থী মানুষদের স্বকীয়তা, আত্মবিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, তাদেরকে পরিণত করেছে মানসিক দাসে। ফলে সভা-সেমিনারে ইসলামকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' বলে স্বীকার করলেও তারা শিশু গণতন্ত্রের বড় হওয়ার অপেক্ষায় কেয়ামত পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে রাজি। অবশ্য এর মধ্যে যদি ইমাম মাহদি বা ঈসা (আ.) এসে বিশ্বব্যবস্থা পাল্টে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে দেন তাহলে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না!

অন্যদিকে, মুসলমানদের অপর একটি শিক্ষিত অংশ যারা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না; ইসলামকে তারা পশ্চিমা প্রিজম দিয়ে দেখে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক

ধারণা ও ভীতি (Islamophobia) কাজ করে। তাদের ধারণা, যদি ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাহলে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে এক ধরনের চরম স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হবে। সেখানে শরিয়াহ আইনের নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হবে, কঠোর মধ্যযুগীয় দণ্ডবিধি ও জবরদস্তিমূলক বিধান কার্যকর করা হবে, খেলাফতের নামে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র কায়েম হবে, জিহাদের নামে সন্ত্রাস চলবে, পর্দা প্রথার নামে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখা হবে, সংস্কৃতি ও বিনোদনের সকল পথ রুদ্ধ করা হবে এবং ভিন্নধর্মীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে তাদের মানুষের মর্যাদা হরণ করা হবে। এই আতঙ্ক ও ভয় মূলত একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ফসল। ইউরোপীয়রা শত শত বছর থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, সাহিত্য, ইতিহাসচর্চা, গণমাধ্যম, সিনেমা, নাটক, গবেষণা, কার্টুন, চিত্রকর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি ও বক্তৃতায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামবিদ্বেষ প্রচার করেছে। এর মাধ্যমে মানুষের মন-মগজে ইসলামভীতি এতটাই গভীরভাবে গেড়ে বসেছে যে, তা একরকম বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যমূলক ইসলামবিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা এখনও পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে।

ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরনো এবং বহুমাত্রিক। যে মুহূর্তে আখেরি নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপের অজ্ঞ, বর্বর ও পশ্চাৎপদ এক জনগোষ্ঠী ঐশী অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, মানবতা ও ন্যায়ের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিল, সে মুহূর্ত থেকেই ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছে। ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা মানুষকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল ক্ষেত্রে উন্নতির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর পথ-প্রদর্শন করে। মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শান্তিময় ও সমৃদ্ধ সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল ইসলাম। সে সময় মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-দর্শন, ন্যায়বিচার, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সামরিক শক্তি - জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। মুসলিম জাতির এই উন্নতি ও প্রগতির দিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। একইসঙ্গে, পশ্চিমা বিশ্বের ক্ষমতাধর এবং রাজ্যলোভী শাসকদের ঈর্ষাপরায়ণ ও লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মুসলিম জাহানের দিকে।

এ সময় ইউরোপ ছিল মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। দারিদ্র্য, ধর্মান্ধতা, গির্জার শোষণ, কুসংস্কার এবং বিজ্ঞানের প্রতি চরম বিদ্বেষ ছিল ইউরোপীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থার মধ্যেই শুরু হয় ক্রুসেড- যার

লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে জেরুজালেমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আগ্রাসন চালানো। এই ক্রুসেড থেকেই মূলত মুসলিমদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রোপাগান্ডার সূচনা ঘটে। ইউরোপের পোপ, যাজক ও পাদ্রীরা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান জনসাধারণের কাছে 'ধর্মদ্রোহী', 'বর্বর', 'অসভ্য' এমনকি 'শয়তানের অনুসারী' হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকে। তাদের লেখক ও চিন্তাবিদরা হাজার হাজার বই, বক্তৃতা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে কোরআন, মহানবী (সা.) এবং ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে তুলে ধরতে থাকে, যেন বিশ্ববাসী বিশেষ করে খ্রিষ্টান জগৎ ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এভাবে ইউরোপের লাখো কোটি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত একটি মবের রূপ ধারণ করে। তার পরিণতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড। এই দীর্ঘ সময়ে ঘটে গেছে বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন, বদলে গেছে বহু রাজ্যের মানচিত্র, উল্টে গেছে বহু সম্রাট ও সুলতানের সিংহাসন।

এই সময়েই ইউরোপে ঘটে যায় যুগান্তকারী রেনেসাঁ- যা তাদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও সৃজনশীলতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা ও প্রোপাগাণ্ডার সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়নি, বরং আরও আধুনিক, সুপরিকল্পিত ও কৌশলী রূপ লাভ করেছে। আরো অগণিত বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে। তারা তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার না করে পরসম্পদ লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা সামরিক শক্তিবলে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো দখল করে নেয়, উপনিবেশ স্থাপন করে, সম্পদ লুট করে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয়। কারণ, ইসলামকে তারা শুরু থেকেই সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রধান শত্রু হিসেবে নিয়েছিল।

বিশ্ব রাজনীতিতে 'ইসলাম বনাম পশ্চিমা সভ্যতা'র এই সংঘাতের ধারণাটিকে তাত্ত্বিকভাবে নতুন মাত্রা দিয়েছেন মার্কিন চিন্তাবিদ স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন। তাঁর বিখ্যাত থিওরি Clash of civilizations অনুযায়ী ভবিষ্যতে পৃথিবীর বড় বড় সংঘাতগুলো আদর্শিক বা জাতীয়তাবাদী কারণে নয়, বরং সভ্যতার দ্বন্দ্বের কারণে সংঘটিত হবে। তিনি বলেন, ইসলামিক সভ্যতা ও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র সভ্যতা যা পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। হান্টিংটনের এই মতবাদ আসলে পশ্চিমা আধিপত্যবাদী মানসিকতারই প্রতিফলন, কারণ তারা ইসলামকে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে।

তারা জানে, একমাত্র ইসলামই বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পশ্চিমা সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কেননা একমাত্র ইসলামই সাম্প্রতিকতম সময়ে মানুষের আধ্যাত্মিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে, পশ্চিমা বিশ্ব সামরিক শক্তির বলে বিশ্বকে পদানত করতে সক্ষম হলেও আদর্শের শক্তিতে ইসলামকে কখনওই পরাজিত করতে পারেনি। অপরদিকে, অন্য ধর্মগুলো বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছে, তা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বহু আগেই সেগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন থেকে বিদায় নিয়ে কেবল ব্যক্তিজীবনের উপাসনা ও আত্মিক উন্নতির পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামকেই তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রধান হুমকি হিসেবে মনে করে। তারা জানে, যদি ইসলাম পুনরায় বিশ্বমঞ্চে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের অন্যায়-শোষণমূলক বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। এই আশঙ্কা থেকেই ক্রুসেডের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন, জেহাদ, খেলাফত কিংবা শরিয়াহভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রসঙ্গ এলেই পশ্চিমা মিডিয়া, গবেষক ও রাজনীতিবিদরা আতঙ্ক ও ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

দুঃখজনক বিষয় হলো, গত কয়েক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আল কায়েদা, আইএস, তালেবান, বোকো হারাম, শাহদাত আল হিকমাহ ইত্যাদি নামে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংগঠন ইসলামের নামে বিকৃত খেলাফত, জবরদস্তিমূলক ইসলামী আইন ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। মধ্যপ্রাচ্য, মিশর, তিউনিসিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এসব প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকেও এক ধরনের ভীতি জন্ম নিয়েছে। কারণ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept) না থাকায় অর্থাৎ বিকৃত আকিদার কারণে এই সংগঠনগুলো জেহাদের নামে সহিংসতা, সন্ত্রাস, আত্মঘাতী হামলা, বোমা বিস্ফোরণ করে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছে, নারীদের শিক্ষার অধিকার, চলাফেরার অধিকার হরণ করেছে, মারাত্মকভাবে মানবাধিকার লংঘন করেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ও ভিন্নমতাবলম্বী মুসলমানদের হত্যা করেছে, সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম চালিয়েছে, তারা ইসলামি খেলাফতের মূল চেতনার (ন্যায়-ইনসাফ, কল্যাণ, মানবতা) বিরুদ্ধে গিয়ে ভয়ের পরিবেশ ও অস্ত্রের মাধ্যমে শাসন কায়েম করেছে। তারা আল্লাহর সহজ সরল সীমারেখা, বিধি প্রতিষ্ঠা না করে গত কয়েক শতাব্দী থেকে রচিত শরিয়তের কিতাবগুলোর অনুসরণে একটি বিকৃত শরিয়াহ ব্যবস্থা চালু করেছে যা আল্লাহ-রসুলের ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এর নেতিবাচক ফল হতে বাধ্য। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। 'খেলাফত' শব্দটির প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঐতিহাসিক কারণে দুর্নিবার

আকর্ষণ রয়েছে। কারণ খোলাফায়ের রাশেদুনের যুগের সোনালী ইতিহাস তারা জানে। প্রকৃতপক্ষে এই উগ্রবাদী দলগুলো 'খেলাফত' শব্দটির সেই আকর্ষণকে ব্যবহার করে তাদের ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে মাত্র। শুধু তা-ই নয়, এই সংগঠনগুলোর অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে তারা বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি বা মদদপুষ্ট। আন্তর্জাতিক মিডিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্টে বারবার এসব বিষয় উঠে এসেছে। তাই মানুষের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বা খেলাফতের প্রসঙ্গে এক ধরনের বিভ্রান্তি ও ভীতি তৈরি হয়েছে। এসব কারণেই রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে না। তাছাড়াও ক্রমাগত ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা তো চলছেই।

জাতিকে মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করার পাশাপাশি ইসলামের প্রতি ভীত ও বিদ্বেষপ্রবণ করে তুলেছে পশ্চিমা বিশ্ব। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই পশ্চিমা যান্ত্রিক বস্তুবাদী 'সভ্যতা'-কে বিশ্বনবী বর্ণিত দানব 'দাজ্জাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে তাঁর লেখা 'দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'! বইটি পড়ার অনুরোধ করছি।

আমরা সকলেই জানি যে, আল্লাহর রসুল (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে আখেরি যামানায় বিরাট বাহনে চড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর দানব (দাজ্জাল) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে মানবজাতির 'রব' বা প্রভু বলে দাবি করবে। সে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে পদদলিত করবে। এই দাজ্জাল শব্দটি ইংরেজি শব্দ 'Dazzle' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো চোখ ধাঁধানো, চমকপ্রদ প্রতারণা। রসুলাল্লাহর সময়ের নিরক্ষর আরবদের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত কৌশলের ওপর ভিত্তি করা মহাশক্তিশালী সভ্যতা সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা অবশ্যই অর্থহীন হতো, তাদের পক্ষে তা বোঝা মোটেই সম্ভব ছিলো না। তাই আল্লাহর নবী এটাকে তাদের কাছে রূপকভাবে (Allegorically) বর্ণনা করেছেন। চৌদ্দশ' বছর আগের নিরক্ষর আরবদের পক্ষে সম্ভব না হলেও বর্তমানে দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যাচাই করলে সন্দেহের কোনো স্থান থাকে না যে মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে আল্লাহর রসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল। যেমন:

১. আল্লাহর রসুল বলেছেন, দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন করবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মতো তার করায়ত্ত হবে (মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর)। বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই যে দাজ্জাল, এটি সিদ্ধান্ত যারা অস্বীকার করবেন বা এতে সন্দেহ করবেন, তারা দয়া করে

আমাদের বলে দেবেন, তাহলে রসুলাল্লাহ এই হাদিসে কাকে বা কী বোঝাচ্ছেন? সমস্ত পৃথিবীর মাটি ও পানি, অর্থাৎ পুরো পৃথিবীকে আজ কোন মহাশক্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে? তারা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, সেই শক্তি অবশ্যই পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা। সমগ্র পৃথিবীতে আজ এর শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

২. আল্লাহর রসুল বলেছেন- দাজ্জালের কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের সে ঐ ভাণ্ডার থেকে রেযেক দেবে না। এইভাবে সে মুসলিমদের অত্যন্ত কষ্ট দেবে। যারা দাজ্জালকে অনুসরণ করবে তারা আরামে থাকবে আর যারা তা করবে না তারা কষ্টে থাকবে। [বুখারী ও মুসলিম]

পৃথিবীর সম্পদের সিংহভাগই বর্তমানে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার দখলে। এই সম্পদ থেকে দাজ্জাল শুধু তাদেরকেই দেয় যারা তাকে মেনে নিয়েছে, তাকে স্বীকার করেছে, স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান ত্যাগ করে দাজ্জালের সৃষ্ট তন্ত্রমন্ত্র, বাদ, নীতি গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা জাতি দাজ্জালের একটু অবাধ্যতা করলেই তাকে সব রকম সাহায্য দেয়া বন্ধ (Economic Sanction) করে দেয়, তার ওপর অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক অবরোধ (Embargo) স্থাপন করে। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল (Consortium) ইত্যাদি, এক কথায় দাজ্জালের অধীনে যত কিছু আছে তার কোনো কিছু থেকেই কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না।

৩. দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে (আব্দুলাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম)। পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার ডান চোখ অন্ধ, অর্থাৎ এ সভ্যতায় কেবল বস্তুকেই চূড়ান্ত সত্য বলে মানা হয়, আধ্যাত্মিক জগত, পরকাল, স্রষ্টা, মালায়েক ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না।

৪. রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, দাজ্জাল এত দ্রুতগতির হবে যে জুমার সালাত আদায়ের সময়ের মধ্যেই পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারবে। আজকের যুগে উপগ্রহ (satellite) প্রযুক্তি এবং মহাকাশ অভিযানের অগ্রগতি এই হাদিসের তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে। বর্তমানে বিভিন্ন উপগ্রহ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং মানুষেরা দীর্ঘ সময় ধরে মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করতে পারে।

৫. রসুলাল্লাহ বলেছেন, দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে চলবে [নাওয়াস বিন সা'মান (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি]। দাজ্জাল, অর্থাৎ পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার তৈরি অ্যারোপ্লেন

যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখন সেটাকে বায়ুতাড়িত, অর্থাৎ জোর বাতাসে চালিত মেঘের টুকরোর মতো দেখায় - তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি?

৬. আল্লাহর রসুল আরও বলেছেন, দাজ্জাল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কী হচ্ছে তা শুনতে ও দেখতে পাবে। আধুনিক ইলেকট্রানিক ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন পুরো বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৭. রসুলাল্লাহ বলেছেন, দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে (মুসলিম, তিরমিযি)। ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি আকাশে হালকা মেঘের ওপর অ্যারোপ্লেন দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে (Cloud seeding) বৃষ্টি নামাতে পারে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঐ প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজের জন্য বৃষ্টি নামানো হচ্ছে।

৮. দাজ্জালের গবাদি পশু আকারে বড় হবে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে (মুসলিম, তিরমিযি)। আধুনিক genetic engineering এবং selective breeding প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পশ্চিমা বিশ্বে গবাদি পশুর আকার বড় হচ্ছে এবং তারা চার-পাঁচগুণ বেশি দুধ উৎপাদন করছে।

৯. রসুলাল্লাহ দাজ্জালের আরেকটি বৈশিষ্ট্য বলেছেন যে, তার আদেশে মাটির নিচের সম্পদ উঠে আসবে এবং সেগুলো তাকে অনুসরণ করবে (মুসলিম, তিরমিযি)। আজকের যুগে Oil drilling ও Mineral extraction প্রযুক্তির মাধ্যমে মাটির নিচের সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে এবং পশ্চিমারা এটি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

এই হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রসুল (সা.) যে এক ভয়ঙ্কর শক্তির আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেটি বর্তমান পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার সাথে হুবহু মিলে যায়। আজ মুসলিমসহ সমগ্র মানবজাতি দাজ্জালকে (পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা) প্রভুর (রব) আসনে স্থান দিয়েছে এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে, অর্থাৎ তাকে সেজদাহ (আনুগত্য) করছে। এই সভ্যতার সামরিক শক্তি, শক্তিশালী মিডিয়া এবং অর্থনৈতিক শক্তি এত ব্যাপক এবং শক্তিশালী যে, মুসলিম বিশ্বের কেউ পশ্চিমা জীবনদর্শন থেকে বেরিয়ে বিকল্প ঐশী বা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান গ্রহণ করার হিম্মত করছে না। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসাবে জানা সত্ত্বেও একে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখছে। সুতরাং, মুসলিম জাতির মধ্যে আল্লাহর দেওয়া বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ হচ্ছে:

» আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা তওহীদের উপর জাতির আস্থা ও বিশ্বাস না থাকা।

» ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও সম্যক ধারণার (আকিদা) অভাব। বিশেষ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কীভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও প্রযুক্ত হবে তা না জানা।
» ইসলাম ও এর ইতিহাস সম্পর্কে পশ্চিমা সভ্যতার অপপ্রচার।
» ইসলামের নামে বিভিন্ন উগ্র সংগঠনের বাড়াবাড়ি এবং ভুল ব্যাখ্যা।
» মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব।
» পশ্চিমা শক্তির দমন নীতি, অবরোধ ও আগ্রাসন।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম বিশ্বকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা দাজ্জালের অনুসরণ করব, নাকি নিজেদেরকে দাজ্জালের প্রভাব থেকে মুক্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র করব? যদি আমরা মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, তবে আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে এবং একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনেকে মনে করেন, এই যুগে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বলয়ের বাইরে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত, এটি এক প্রকার মানসিক দাসত্ব, যা বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করার ফলে আমাদের চিন্তা-চেতনায় ঠাঁই গেড়ে বসেছে। এখন আল্লাহর উপর ভরসা করে এই অকারণ পরনির্ভরতা কাটিয়ে উঠে ইসলামের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের সময় এসেছে। সেটা কীভাবে সম্ভব তার ধারণা আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

ইসলামী গণতান্ত্রিক দলগুলো কেন দীন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে?

(Why will Islamic democratic parties fail to establish Deen?)

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বেশ উজ্জীবিত। তারা আগামীতে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ক্ষমতার বাইরে থেকে তারা রাজনীতি করে এসেছে, এই প্রথমবার তারা একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের মধ্যকার বিভক্তিগুলো মিটিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছে, যদিও ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। কেন পারছে না সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাদের কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ভোটব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করা। এজন্য তারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তারা দেশে আল্লাহর আইন, কোর'আনের শাসন, শরিয়ার বিধান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করবে। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাদের এই কথায় আকৃষ্ট হতেই পারে, কারণ তারা ইসলাম ভালোবাসে, পরকালে জান্নাতে যেতে চায়। তারা জানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে শান্তি আসবে, মানবাধিকার আসবে। মুসলমানদের এই ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক দলগুলো গদিতে বসতে চায়। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা কতটুকু কী করতে পারবে সেটা পরের ব্যাপার।

ইতোপূর্বে বলে এসেছি যে কোর'আনের শাসন বা খেলাফত রাষ্ট্র বিষয়টিকে পশ্চিমা সভ্যতা ও তাদের অনুসারীরা ভীষণ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে। তাদের কাছে এর অর্থ হল কেউ চুরি করলেই তার হাত কেটে ফেলা হবে, কেউ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক করলেও পাথর মেরে হত্যা করা হবে। রাস্তায় রাস্তায় ভয়ংকর শরিয়াহ পুলিশ ঘুরে বেড়াবে, কোনো মেয়ের চুল দেখা গেলেও তাকে সঙ্গে সঙ্গে বেত দিয়ে পেটানো হবে, মেয়েদেরকে আপাদমস্তক ঢেকে বাক্সবন্দী করে রাখা হবে, তাদের লেখাপড়া বন্ধ। নাটক, সিনেমা, বিনোদন সব বন্ধ। পশ্চিমা চোখে এই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের চেহারা। বিভিন্ন উগ্রবাদী ইসলামি দল এমন পরিবেশই তাদের অধিকৃত এলাকাগুলোতে কায়েম করেছে সাম্প্রতিক সময়ে। তাদের প্রবর্তিত শরিয়াহ আইনের ভয়াবহ রূপ দেখে বিশ্বজুড়ে ইসলামের প্রতি ভীতি সৃষ্টি হয়েছে।

তাই আমাদের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখন পশ্চিমা ভাবধারার সমাজ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

প্রকৃতপক্ষে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইকামতে ইসলাম' এই শব্দগুচ্ছটি কোর'আনে কোথাও নাই। কোর'আনে আছে আকিমুদ্দিন। আল্লাহ বলছেন, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর আর এ নিয়ে মতভেদ করো না (সুরা শুরা ৪২:১৩)। তিনি পৃথিবীতে তাঁর শেষ রসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, আমি আমার রসুল প্রেরণ করেছি হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে যেন তিনি একে অন্যান্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন (সুরা তওবা ৯:৩৩, সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা সফ ৬১:৯)। এখানেও বলা হয়েছে দীনকে বিজয়ী করার কথা। এসব আয়াতেও ইসলাম শব্দটি আসেনি। কারণ 'ইসলাম' হচ্ছে ফল, যেটা লাভ করার জন্য আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান কার্যকর করা হলে তার ফল হবে শান্তি, তাই এই জীবনব্যবস্থার নাম তিনি দিয়েছেন ইসলাম এবং বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়েদা ৫:৩)'।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে আরো সহজ হতে পারে। যেমন একটি গাছের ফল হচ্ছে আম। আমরা কিন্তু আমগাছের ডালপালা, কাণ্ড, পাতা, বীজ বা মূলকে 'আম' বলি না। আম হচ্ছে এই সবগুলো মিলিয়ে যে গাছ সেই গাছের ফল। এই সমগ্র গাছটি হচ্ছে একটা সিস্টেম বা ব্যবস্থা যার ফল হচ্ছে- আম। তেমনি আল্লাহর দেওয়া দীন হচ্ছে সিস্টেম বা ব্যবস্থা আর তার ফল হচ্ছে শান্তি বা ইসলাম। তেমনি কেবল নামাজ, রোজা, হজ পালন করলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে এমনটা মনে করা ভুল হবে, যতক্ষণ না মানুষের সামগ্রিক জীবনে শান্তি কায়েম না হয়।

তাই যদি কোনো সরকার গোটা জাতিকে জোর করে নামাজি বানিয়ে দেয় বা শরিয়াহ পুলিশ নিয়োগ করে সব নারীদেরকে বোরকা পরিয়ে দেয় অথবা সবাইকে দাড়ি টুপি পাগড়ি আর টাখনুর উপরে প্যান্ট পায়জামা পরিয়ে দেয়, এমনকি চুরি জেনার কথিত 'শরিয়তি' শাস্তি দেয় তাহলে সেটা দেখেও এমন ভাবার কারণ নেই যে, ইসলাম হয়ে গেছে। আমরা তখনই বলতে পারব ইসলাম এসেছে যখন দেখব সকল মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানুষ দরজা খুলে ঘুমাচ্ছে, মানুষ দু মুঠো ভাতের চিন্তায় তাকে অস্থির হতে হচ্ছে না, অসুখ হলে সে চিকিৎসা করাতে পারছে, একটা মেয়ে একা দিনে রাতে পথ চলতে পারছে, বাসা ভাড়া দিতে গিয়ে না খেয়ে থাকা লাগছে না, সব ধর্মের মানুষ সম্মানের সাথে বাঁচতে

পারছে, জনসাধারণ যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও অশান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে তখন। এসব বাস্তব সমস্যার সমাধান না হলে কেবল পোশাকি ইসলাম দিয়ে, সবুজ রং দিয়ে, প্রতিষ্ঠানের আরবি নাম দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ফেলার দাবি মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা আশ্বাসই গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো জাতিকে দিয়ে যাচ্ছে।

আম গাছ যদি একটি সিস্টেম হয় তাহলে তার শুরু একটি বীজ দিয়ে। ঠিক তেমনি ইসলাম (শান্তি) পেতে হলে যে সিস্টেম (দীন) প্রতিষ্ঠা করা লাগবে তারও একটা শুরু আছে। যেনতেন প্রকারে, নামে বেনামে রাজনীতি করে, অন্যের কাঁধে চেপে, বিপ্লব ছিনতাই করে রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে সেখানে কিছু শরিয়াহর বিধান প্রবর্তন করে দিলেই তো দীন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল না। অন্যের জমি অবৈধভাবে দখল করে সেখানে বাড়িঘর তুলে ফেললেই সেই বাড়ি আপনার হয়ে যাবে না। উল্টো আপনার জেল-জরিমানা হবে, কেবল সময়ের ব্যাপার। তাই জমির মালিকানা লাভের সঠিক পথে আপনাকে হাঁটতে হবে। মানুষের তৈরি প্রত্যেকটি দীন প্রতিষ্ঠার যেমন নির্দিষ্ট পথ থাকে তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠারও নির্দিষ্ট পথ আছে। আর সেই পথের শুরুর জায়গাটা কোথায় সেটা জনগণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে হবে। বৃক্ষের শুরু যেমন বীজ থেকে তেমনি ইসলামের শুরুটা হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদ থেকে। অর্থাৎ যারা দীন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিবে তারা প্রথমে এই কথার উপর একমত হবে যে, মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের বিধাতা হবেন আল্লাহ, তিনিই হবেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা। আজকে আমাদের দেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই তারা জনগণের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মনে করে। সংসদে যে মত বেশি ভোট পায় সেই মতই জয়যুক্ত হয়। সে বিষয়ে আল্লাহ কী বলেছেন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

আমাদের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোও মানুষকে কেবল একটা ভোট দিতে বলছে। ভোট দিলেই জান্নাত নিশ্চিত। প্রতিটি ইসলামী দল বলছে যে তাদের মার্কায় ভোট দিলে ভোট পাবেন আল্লাহ-রসুল। অধিকাংশ জনগণ গণতন্ত্র চায়, তাই ইসলামী দলগুলোও গণতন্ত্রের পথেই হাঁটে, গণতন্ত্রের গান গায়। গণতন্ত্র আর ইসলাম যে দুটো আলাদা দীন, আলাদা জীবনব্যবস্থা এটা তারা জনগণের কাছে খোলসা করে বলছে না। কারণ বললে তারা নির্বাচন করবে কী করে? তারা এটাও জনগণকে পরিষ্কার করে বলছে না যে ইসলামের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর আর গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব মানুষের যা সুস্পষ্ট শেরক। যারা শেরক করে তারা মুশরেক। ইসলামের বিধান হল, মানুষ আল্লাহর বান্দা হিসাবে কেবল আল্লাহর হুকুম মানবে, আল্লাহর দাসত্ব করবে, আর গণতন্ত্রের নিয়ম হল মানুষ মানুষেরই দাসত্ব করবে। তাই ইসলামের এই গোড়ার জায়গাটা জনগণের সামনে পরিষ্কার

না করে কেবল একটি ভোটের বিনিময়ে জান্নাত লিখে দেওয়ার যে দাবি তারা করেন সেটা একপ্রকার প্রতারণা যা তারা জেনে বুঝেই করেন।

গণতান্ত্রিক দেশে একই রাজনীতি করছেন সমাজতান্ত্রিকরাও। তারাও শ্রেণিহীন বৈষম্যহীন সমাজ ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, গণতন্ত্রের গুণকীর্তনও করছেন। তাদের মনোগত বাসনা হল, একবার গদিতে গিয়ে বসি, তারপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সাম্যবাদী নীতি প্রতিষ্ঠা করে ফেলব। আর যদি নাই পারি ক্ষতি নেই, নিজের ও দলের আখের তো গোছানো যাবে! এ কারণে তারাও সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রচার না করে ভোটভিক্ষা করেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, লেনিন কখনও ভোট ভিক্ষা করে, প্রতারণার রাজনীতি করে ক্ষমতায় যাননি। তিনি শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মাঝে মার্কসবাদ ছড়িয়ে দিয়েছেন, শ্রেণিসংগ্রামের দর্শন বুঝিয়েছেন। দীর্ঘ সময়ের সেই চিন্তা-চেতনার বিকাশের ফলেই রুশ বিপ্লব ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম জাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হবে এবং সেই সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের আন্তরিক সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। দীন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তই হচ্ছে- জনগণ যেন তাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা ও সর্বশেষ হুকুমদাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে মেনে নেয়। আদালতে কোন আইনে বিচার হবে- এসব বিষয় অনেক পরের ধাপ।

প্রথমে মানুষের মনোজগতে ও আত্মায় এই বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয় জন্মাতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমই সর্বোত্তম, কেবল আল্লাহর বিধানই ন্যায়সঙ্গত, কেবল আল্লাহর আইনই শান্তিদায়ক। যখন এই বিশ্বাস মানুষের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহকেই ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তারা মানদণ্ড হিসেবে মেনে নেবে না। তখনই সেই জাতির মধ্যে দীন প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।

কিন্তু আজ আমাদের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে মানুষের সামনে ভালোমন্দের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা। আজ যদি প্রশ্ন করা হয় - কে সভ্য জাতি? কে উন্নত? কোন দেশে যেতে চাও? কোথায় ন্যায়বিচার পাওয়া যায়? কার ভাষা শিখতে চাও? কোন দেশের মানুষ সুন্দর? কার সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা উন্নত ও মহৎ? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এসে দাঁড়ায় ইউরোপ-আমেরিকার দিকে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে। পশ্চিমা সভ্যতা যা ভালো বলে, তাই আমাদের কাছে ভালো; তারা যা খারাপ বলে, সেটাও আমাদের কাছে খারাপ। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম পরিবর্তন আনতে হবে এই মানসিকতা ও চিন্তাগত জায়গায়।

যখন মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হিসাবে আল্লাহকে গ্রহণ করে নেবে তখন সে একজন বিশ্বাসী বা মো'মেন হিসাবে পরিগণিত হবে। তখন আর তার ভিতরে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারবে না, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বক্রদৃষ্টি থাকতে পারবে না, সাদা-কালো, বাঙালি পাহাড়ি বর্ণবাদ থাকতে পারবে না, বংশীয় আভিজাত্যের ভেদজ্ঞান থাকতে পারবে না, কে শিক্ষিত কে অশিক্ষিত তা নিয়ে কাউকে ছোট করে দেখতে পারবে না। তখন সে মানুষকে মূল্যায়ন করবে আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ড দিয়ে। যেমন সে একজন মানুষকে বিচার করবে তার গুণাবলি দিয়ে যেমন সে সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী, সে ওয়াদা পালনকারী নাকি ওয়াদা ভঙ্গকারী, আমানত রক্ষাকারী নাকি খেয়ানতকারী, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর নাকি দানশীল উদার ইত্যাদি। যখন একজন মানুষ এভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত হবে তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি ঈমান আনল। দীন প্রতিষ্ঠার শুরুটা এখান থেকে। এই ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের সমন্বিত রূপকে বলা হয় উম্মাহ। এরা বাকি সকল মানুষ থেকে হবে আলাদা একটি জাতিসত্তা গড়ে তুলবে, তারা হবে আলাদা জনগোষ্ঠী। এদের একটা মূল দায়িত্ব হবে, তারা সৎকাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সেজন্য তাদের হাতে অবশ্যই রাষ্ট্রক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতায় না গিয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদানের বৈধ অধিকার কারো সৃষ্টি হয় না।

এই যে তারা একটি আলাদা জাতি গঠন করল, তাদের জাতির ভিত্তিটাই হল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। তাদের একজন ইমাম অর্থাৎ নেতা থাকবেন। জাতির সবাই আনন্দের সাথে সেই নেতার শর্তহীন ও প্রশ্নহীন আনুগত্য করবে। ইমাম আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হবেন। তিনি হবেন দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উম্মাহর আদেশদাতা কর্তৃপক্ষ, পবিত্র কোর'আনের ভাষায় উলিল আমর (সুরা নিসা ৪:৫৯)। দীন প্রতিষ্ঠার শুরুটা কিন্তু এখান থেকে। এরপর আসবে দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি। কর্মসূচি ছাড়া কোনো লক্ষ্য হাসিল করা যায় না।

তাহলে লক্ষ্য হচ্ছে মানবরচিত সকল ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই দীন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া আল্লাহ দিলেন জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে মুখে বলা থেকে শুরু করে সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হবে। রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবীরা অর্ধ পৃথিবীতে এই জেহাদ করেই দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করে এক বর্গ ইঞ্চি মাটিতে দীন প্রতিষ্ঠার নজির আমরা দেখিনি। কারণ ঐ প্রক্রিয়া আল্লাহর নয়, পাশ্চাত্যের শেখানো। তাদের তৈরি পদ্ধতিতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কিন্তু এই জেহাদ করার জন্য তো একটি

কর্মসূচি থাকা অপরিহার্য। কর্মসূচি ছাড়া কোনো সংগঠন, কোনো সংগ্রাম চলতে পারে না। আল্লাহ কি রসুলকে কোনো কর্মসূচি ছাড়াই নিজের ইচ্ছামত সংগ্রাম করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন? এটা হতেই পারে না। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এ কথার মানে হল কী উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে সেটাও আল্লাহ দিয়েছেন। সেই কর্মসূচির সন্ধান পাওয়া যায় রসুল (সা.) এর বেশ কয়েকটি হাদিসে যেটা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি সমগ্র জীবন এই কর্মসূচি অনুসারে সংগ্রাম করে গেছেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি তাঁর গড়ে তোলা উম্মাহর হাতে এই কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। তিনি বলেন- 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, যে পাঁচটি কাজের আদেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ হও, (নেতার আদেশ) শোন, (নেতার ওই আদেশ) পালন কর, হিজরত কর, আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম কর।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেলল- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করলো, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পোড়লেও এবং রোজা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

হাদিসটির শেষ অংশে রসুলাল্লাহ বলেছেন, যারা এই পাঁচ দফা থেকে আধহাত বহির্গত হলে তার গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে। ইসলামের বন্ধন খুলে যাওয়া মানে কী? সে আর মুসলিমই থাকবে না। আর এই কর্মসূচির বাইরে ভিন্ন কোনো কর্মসূচির দিকে যারা আহ্বান করবে তাদের তো মুসলিম থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এই কথাটা তিনি এতটা জোর দিয়ে বললেন যে, সে যদি নামাজ পড়ে, সে যদি রোজা রাখে এমন কি সে যদি নিজেকে মো'মেন মুসলিম বলে বিশ্বাস করে তবু সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে। আজকে যারা আল্লাহর দেওয়া এই পাঁচ দফা কর্মসূচিকে বাদ দিয়ে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে নিজেদের মনগড়া কর্মসূচি অনুসারে তাদের 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন তাদের এই দাবির বৈধতা কতটুকু? রসুলাল্লাহর কথা মোতাবেক তারা তো মুসলমানই থাকেন না, বরং তারা জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবেন।

যে কথা বলছিলাম। দীন প্রতিষ্ঠার সূচনাবিন্দু হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটি উম্মাহ গঠন। তাদের থাকবে একজন ইমাম, একটি লক্ষ্য- সমগ্র পৃথিবীতে জেহাদ, সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা। এই জেহাদ তারা করবেন আল্লাহ প্রদত্ত এই পাঁচদফা কর্মসূচি অনুসারে। এভাবে জাহেলিয়াতের

সমাজ থেকে ভিন্ন একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, একটি নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে। তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, তাদের বোঝাপড়া, জীবনের লক্ষ্য ও লক্ষ অর্জনে ত্যাগ-তিতীক্ষা, লেনদেন, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, তাদের শৃঙ্খলা, আনুগত্য এগুলোই ধীরে ধীরে একটি তাদেরকে আলাদা একটি সমাজ হিসাবে পরিচিত করে তুলবে, সেটাই এক সময় বৃহৎ সভ্যতায় রূপ নেবে। এই নতুন সমাজভুক্ত লোকগুলির সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠবে একটি তওহীদভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো। আল্লাহর দৃষ্টিতে এই লোকগুলোই হচ্ছে মো'মেন।

মো'মেন হওয়ার জন্য তাদেরকে দুটো শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিবে ও রসুলাল্লাহর উপর ঈমান রাখবে। দ্বিতীয়ত তারা জীবন ও সম্পদ কোরবানি করে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ (সংগ্রাম) করবে (সুরা হুজরাত ৪৯:১৫)। অর্থাৎ মো'মেন হতে হলে তাকে জান ও মাল দুটোই ত্যাগ করতে হবে, বিনিময়ে সে কিছু নিতে পারবে না। সবাইকে তার সর্বস্ব কোরবানি করেই মো'মেন হতে হবে, সে ধনী হোক আর গরীবই হোক। এর বিনিময়ে সে আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত কিনে নেবে (সুরা তওবা ৯:১১১)। দুনিয়ার কোনো সুখ-সম্ভোগ যদি তার কাছে জেহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রসুল ও তাঁর রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না (সুরা তওবা ৯:২৪)।

এই যে দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রস্তুতি, এটা হল দীন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রস্তুতি। এর পেছনে কারো এমন কোনো ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকতে পারবে না যে আপাতত সময় ও সম্পদ বিনিয়োগ (Invest) করি, ক্ষমতায় গেলে পরে সব উসুল করে নেব। বরং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগই হল মো'মেনের বৈশিষ্ট্য। যখন এই রকম মো'মেন যখন জেহাদের জন্য তৈরি হবে তখন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাঠাবেন। এজন্য তিনি পাঁচ হাজার মালায়েক প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সুরা ইমরান ৩:১২৪-১২৫)। আল্লাহর এই সাহায্য ছাড়া উম্মতে মোহাম্মদীর বিজয় সম্ভব হয়নি। যারা মো'মেন নয়, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন না এটা সাধারণ জ্ঞান। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক রয়েছে, তাঁর সাহায্যের

দ্বারা এখানে আরশের সঙ্গে জমিনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন তাদের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্কই রচিত হয় না। এই চরম সত্যটি আগে সব ইসলামী সংগঠনকে উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া রসুলাল্লাহর পক্ষেও বিজয়ী হওয়া সম্ভব হতো না। তাই তো তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় আল্লাহর কাছে 'সুলতানান নাসিরাহ' অর্থাৎ মহা শক্তিশালী সাহায্য প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন যে সাহায্য কর্তৃত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি মোনাজাত করেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করান সত্যপূর্ণভাবে এবং আমাকে বাহির করুন সত্যপূর্ণভাবে এবং আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাকে দান করুন মহা শক্তিশালী কর্তৃত্বপূর্ণ সাহায্য (সুলতানান্ নাসিরাহ)। (সুরা বনি ইসরাইল ১৭:৮০)। তিনি ও তাঁর সাহাবিরা যখন নিজেদের সর্বস্ব কোরবানি করে, অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন তখন তাঁরা মদিনায় গিয়ে রাষ্ট্রশক্তি লাভ করলেন। রসুলাল্লাহর জীবনের এই মহা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনগুলোকে আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তারপর আল্লাহ বলছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে (মো'মেন) ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জীবনব্যবস্থাকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।' (সুরা নূর ২৪:৫৫)। এটাই হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা বা দীন প্রতিষ্ঠার রোডম্যাপ। তখন তারা সেখানে শাসনকর্তৃত্ব (Authority) পেয়ে যাবে, তখন সেখানে যে জীবনরীতির চর্চা করবে সেটাই হচ্ছে তাদের শরিয়াহ। এতদিন তারা যে ভ্রাতৃত্ব নিজেদের মধ্যে কায়েম করেছে, সেটাই তখন রাষ্ট্রে কায়েম করবে। উম্মাহর বৃহত্তর ও বিকশিত রূপ হবে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় রূপ।

তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটে জিতে মাঝখান থেকে একটি গণতান্ত্রিক ইসলামী দল এসে সরকার গঠন করে রাষ্ট্রে শরিয়াহ (অবশ্য একেক মাজহাবের একেক রকম শরিয়াহ) কায়েম করে ফেলবে, এটা কখনও বাস্তবসম্মত চিন্তা নয়, সম্ভবও নয়। কারণ, এ জাতির চিন্তা-চেতনা ও মানসপটে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে গণতান্ত্রিক দর্শন, যেখানে আল্লাহর তওহীদের কোনো স্থান নেই। ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জনগণকে ইসলাম বুঝিয়েছে। সেই জনগণ আল্লাহর বিধানকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনগণের মতামতের উপর আস্থাশীল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি সুদের পক্ষে মত দেয়, সুদ রাষ্ট্রীয় আইনে বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলামে সেটা হয় না।

আবার ইসলামের নিয়ম হল নেতার নিঃশর্ত আনুগত্য, এবং নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে দিয়ে জাতির জন্য সংগ্রাম করা। অথচ গণতন্ত্রের চর্চা হল, এখানে বিরোধীদল অবশ্যই থাকতে হবে। বিরোধীদলের সংখ্যা অগণিতও হতে পারে। সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাই তাদের কাজ। সরকার তাদের কথা না শুনলে সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে তারা হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর করবে, সরকারি স্থাপনার উপর হামলা চালাবে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আক্রমণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সরকারও তাদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের উপর জেল, জুলুম, গুম, মামলা দিয়ে হয়রানি করবে এটাও স্বাভাবিক। এক কথায় সেখানে 'আমরা সবাই রাজা' হওয়ার পরিণামে এমন এক অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা ইসলামে কল্পনাও করা যায় না।

আবার দেখা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নাগরিকরা চাইবে চার/পাঁচ বছর পর পর সরকার পরিবর্তন হোক। কিন্তু সেটা তো ইসলামের খেলাফতের সঙ্গে যায় না। ইসলামের খলিফা যদি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তবে তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এতে ইসলামের কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এমন আরো অনেক কিছুই কথিত গণতন্ত্রের সংস্কৃতির সঙ্গে যাবে না। সেগুলো তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে মানাতে হবে। কিন্তু সেটা হবে দীনের একটি মৌলিক নীতি 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন - এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই'- এই নীতির লংঘন। আর যখনই রাষ্ট্র তার জনগণের উপর জবরদস্তি করবে তখনই তা স্বৈরাচারী সরকারে পর্যবসিত হয়ে পড়বে। মানুষ যেটা মন থেকে চায় না, সেটা তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাই হল ফ্যাসিজম বা স্বৈরাচারিতা। এক গ্লাস পানি যদি মানুষ সেটা নিজে থেকে খায় তাহলে এটা কোনো কাজই না। কিন্তু যখন আপনি কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে চাইবেন তখন আপনার তাকে আগে রশি দিয়ে বাঁধতে হবে। দুই জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক লাগবে যারা তাকে জোর করে পানি গেলাবে। ইসলাম এটার পক্ষে না, ইসলামের কর্মসূচিও এটা না। জোর করে পানি গেলানো হচ্ছে ফ্যাসিবাদ, আর মানুষ স্বেচ্ছায় পানি খাবে এটাই হল তার দীন, ফিতরাত, স্বভাব। দীন মানে তার দৈনন্দিন জীবন আচরণ, তার প্র্যাকটিস। যেভাবে আমি আমার জীবন পরিচালিত করবো, সেটাই আমার দীন।

তাহলে রাষ্ট্র কাঠামোর বেলায় ইসলাম নামক দীনটি কেমন? এটি এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে কোনো দপ্তরে, কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যার স্থান নেই - সর্বত্র

থাকবে মিথ্যার পরিবর্তে সত্যের চর্চা, স্বার্থের বদলে ত্যাগের চর্চা। দুর্নীতির প্রশ্নই আসবে না। কিন্তু এই ধরনের সমাজ, রাষ্ট্র তো একদিনেই হয়ে যাবে না। কারণ রাষ্ট্র যারা চালাবে তারা তো মানুষ, তাদের মানসিকতা ও চরিত্র কীভাবে পাল্টাবে? এর জন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি যা আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান করেছেন এবং রসুল সেটা দিয়ে আরব সমাজকে পাল্টে দিয়েছেন। সেটা হল, প্রথমে তওহীদের ভিত্তিতে একটি উম্মাহ গঠন করতে হবে। তারপর তাদের সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সত্যনিষ্ঠ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিশেষে সেই সমাজকেই রাষ্ট্রের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে- এই রাষ্ট্রের অর্থনীতি কীভাবে চলবে- সুদের ভিত্তিতে, নাকি আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতিতে? আদালতে বিচার হবে কোন আইন দিয়ে- ব্রিটিশ আইন দিয়ে নাকি শরিয়াহ আইন দিয়ে?

কিন্তু আজ যারা ইসলামপন্থী হয়েও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চান, তাদেরকে ক্ষমতায় গিয়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে সুদভিত্তিক অর্থনীতিই চালু রাখতে হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সৌদি আরবের অর্থনীতি ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত বলে দাবি করা হলেও, বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে সেখানে সুদভিত্তিক অনেক উপাদান বিদ্যমান। তারা আন্তর্জাতিক লেনদেনে, বিশেষত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে থাকে। একইভাবে, তুরস্কেও সুদভিত্তিক অর্থনীতি পুরোদমে চালু রয়েছে, যদিও কথিত ইসলামিক ব্যাংকিংও সেখানে চালু রয়েছে। এই দুটি দেশের উদাহরণ দিলাম কারণ তারা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ইসলামকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে থাকে।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান যেন আত্মতুষ্টি লাভ করে যে তারা হারাম সুদ খাচ্ছে না, সেজন্য ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো এমন কিছু 'হেকমত' প্রয়োগ করে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। তারা একদিকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু রাখে, অন্যদিকে জনগণের মন জয়ে শরিয়াহ-সম্মত ব্যাংকিং ব্যবস্থার নামে এক ধরনের অদ্ভুত (!) পদ্ধতি প্রবর্তন করে। অর্থাৎ তারা সুদ নির্মূল করে ইসলামের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। একইভাবে, তারা আদালতে শরিয়াহ আইনও বাস্তবায়ন করতে পারে না, কারণ ইসলামের মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তাদের কাছে নেই। তারা কেবল ইসলামের নাম ব্যবহার করে ভোট আদায় করে থাকে। এমনকি যে ধরনের শরিয়াহ আইন চরমপন্থী ও জঙ্গিবাদ-আক্রান্ত কিছু দেশে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো সেসব আইন বাস্তবায়নের সাহস দেখায় না- কারণ এতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন

হারানোর আশঙ্কা থাকে। তাদের কাছে দীনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা যদি থাকত, তাহলে সেটা তাদের কার্যক্রমে ও চরিত্রে প্রতিফলিত হতো। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার, নারী বিদ্বেষী বক্তব্য, আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব প্রচার করে থাকে। এমনকি 'মব' সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর হামলা ও সহিংসতা চালিয়ে থাকে বলে বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে মব সন্ত্রাস পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা 'তওহীদী জনতা'র পরিচয় নিয়ে যায়, সেখানে দলীয় পরিচয় গোপন করে। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদভিত্তিক রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করে থাকে, অন্যান্য দলের মধ্যে পরিচয় গোপন করে বছরের পর বছর রাজনীতি করে যায়, এভাবে অন্যের অভ্যুত্থান ও বিপ্লব ছিনতাই করে। এভাবে যখন তখন তারা রূপ বদলায়। অথচ রসুল (সা.) কখনোই এমন বহুরূপী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সরল, খোলামেলা ও অকপট। শত্রুর সাথেও যদি কোনো ওয়াদা করতেন, তার পূর্ণ মর্যাদা দিতেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে কেন যুদ্ধ করছেন- তা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতেন, যাতে কেউ বিভ্রান্ত না হয়। যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রাণহানি হলে তিনি তার দায়ভার নিজ কাঁধে নিতেন, কখনোই অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতেন না। যুদ্ধের ফলাফল তিনি কখনো এড়িয়ে যেতেন না বা দায় অস্বীকার করতেন না। এমনও ঘটেছে যে, তাঁর নিযুক্ত সেনাপতির ভুলের কারণে শত্রুপক্ষের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণহানি ঘটেছে- তবুও তিনি সেই দায় স্বীকার করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর 'বানু জুযাইমা অভিযান'-এ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বেশ কয়েকজন নিরপরাধ মানুষ নিহত হন, যারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু খালিদ (রা.) সঠিকভাবে তা বোঝেননি। রসুল (সা.) এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, খালিদের ওই সিদ্ধান্তের দায় স্বীকার করেন এবং নিজে ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিহতদের পরিবারকে সন্তুষ্ট করেন। (সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ৪৩৩৯; সীরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১২)

একইভাবে, আল-হুরাকাহ নামক একটি গোত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এক শত্রু যোদ্ধা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করার পরও ওসামা (রা.) তাকে হত্যা করে ফেলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এই কথা বলেছে। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা.) এই ঘটনাতেও ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন- কারও অন্তরের অবস্থা যাচাই না করে কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করা ঠিক নয়। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে?'- এই

প্রশ্ন তিনি বারবার ওসামাকে করেছিলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৯৬; সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ৪২৬৯)

অপরদিকে, আজকের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো নেতাকর্মীর দ্বারা সন্ত্রাসী কিংবা অনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে দল সেই দায় স্বীকার করে না। বরং দায়ী ব্যক্তিকে দলের সদস্য হিসেবে অস্বীকার করে এবং একটি দায়সারা রাজনৈতিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পন্ন করতে চায়। এমনকি, তাদের উস্কানিতে সৃষ্ট মবের হাতে কেউ নিহত হলেও, তারা সেটির দায় তওহীদী জনতার ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এই ধরনের রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি ইসলামের নীতিমালার সাথে যায় না।

মোট কথা, মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। এই জন-আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা মানুষকে উমরের (রা.) শাসন ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ধর্মপ্রাণ জনগণের ভোট প্রার্থনা করে। ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে, সওয়াবের আশায় ও জান্নাতের প্রত্যাশায় মানুষ তাদের ভোট দেয়।

কিন্তু বাস্তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তারা ইসলামের বহু মূলনীতি বিসর্জন দিয়েছে। তারা শিরক ও কুফরের সঙ্গে- এমনকি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয়েও আপস করেছে। অথচ এসব বিষয় ভোটারদের সামনে স্পষ্ট করা হয় না। বরং ইসলামের প্রতিটি বিষয়, কোর'আন, হাদিস ও রসুলের জীবনকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা প্রতারণা করে যাচ্ছে- যা উপরে বলে এসেছি।

তাই যারা জাতীয় জীবনে সত্যিকারের ইসলাম চায়, তাদের সামনে যদি ইসলামের সামগ্রিক রূপ, আকিদা স্পষ্ট হয়, তাহলে কেউ আর তাদের ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করতে পারবে না। এজন্য বিশেষ করে দরকার ইসলাম আসলে কী, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য কী এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি ও কর্মসূচি কী - এসকল বিষয়ে ধর্মপ্রাণ জনগণের সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা। আর এই বিষয়গুলোই হেযবুত তওহীদ জনসমক্ষে তুলে ধরছে।

বিভ্রান্তির বেড়াজালে সুন্নাহ ও হাদিস

(Confusion in the Maze: Sunnah and Hadith)

আল্লাহর রসুল বিদায় হজের ভাষণে তাঁর উম্মাহকে বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে আল্লাহর কেতাব, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার সুন্নাহ। অনেকে ভুল করে বলেন, একটি হচ্ছে কোর'আন, আরেকটি হচ্ছে হাদিস। না। এটা একদমই ভুল ধারণা। হাদিস মানেই সুন্নাহ নয়, হাদিসের মধ্যে তাঁর সুন্নাহকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাঁর জীবনীগ্রন্থেও তাঁর সুন্নাহকে খুঁজে পাওয়া যায়। রসুলাল্লাহ কোনো হাদিসগ্রন্থ রেখে যান নি। তিনি রেখে গেছেন তাঁর সুন্নাহ। হাদিস সংকলন শুরুই হয়েছে তাঁর ইন্তেকালের দুশো বছর পার হওয়ার পর। ইমাম বোখারি (রহ.) ১৯৪ হিজরি থেকে ২৫৬ হিজরি সন পর্যন্ত হাদিস সংকলনের কাজ করেন। এসব হাদিসে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে, রসুলাল্লাহর জীবন যাপন পদ্ধতি, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা এবং তাঁর বিভিন্ন উক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস অনভ্যাসগুলোকেও এখন সুন্নত (সুন্নাহ) বলা হচ্ছে। যেমন তিনি কীভাবে বসতেন, কীভাবে দাঁড়াতেন, কীভাবে খেতেন, কীভাবে শুতেন, কীভাবে মেসওয়াক করতেন, কীভাবে পাগড়ি বাঁধতেন, তাঁর পাগড়ির কী কী রং দেখা গেছে, তাঁর চুল-দাড়ি ইত্যাদি ব্যক্তিগত অভ্যাস অনভ্যাসকে সুন্নত বলা হচ্ছে। আসলে এগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় আদাত। এগুলো সুন্নত না। সুন্নত বা সুন্নাহ হচ্ছে কর্মনীতি বা কর্ম পদ্ধতি। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে তিনি কী কর্মনীতি নিয়েছেন এটা হচ্ছে তাঁর সুন্নাহ। এটা তিনি তাঁর জাতির জন্য রেখে গেছেন। একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

যে কোনো কাজ করার জন্য কঠিন ও সরল দুটো পদ্ধতি যদি থাকে তখন তিনি কোন পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন? তিনি অবশ্যই সরল পথটি অবলম্বন করতেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন দীনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এমন একটি পন্থা অবলম্বন করতে যাতে মানুষের উপর অযথা কঠোরতা আরোপ না হয়। এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস উল্লেখ করছি।

০১. তোমরা কখনও দীনের মধ্যে কঠোরতা আরোপ করো না, কেননা যারা কঠোরতা প্রয়োগ করবে, তারা পরাজিত হবে। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর: ৩০৪৪)

০২. তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না; আনন্দদায়ক করো, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না। (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৬৯; সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১৭৩৪)

০৩. রসুলাল্লাহ (স.) যখনই দুটি কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পেতেন, তিনি সবসময় সহজ পথটি বেছে নিতেন, যদি তা গুনাহের পথ না হত। যদি তা গুনাহের পথ হত, তাহলে তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তা থেকে বিরত থাকতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৬১২৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৩২৭)

০৪. আমি সহজতর ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নম্বর: ১৭৪০০)

তাহলে আমরা রসুলাল্লাহর একটি নীতি জানলাম। সেটা হল- যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষের পালন করতে সহজ হয়, সেই পথটি অবলম্বন করা। এটা হলো রসুলের সুন্নাহ। নীতি বলতে মেসওয়াক, দাড়ি, পাগড়ি বা মুচকি হাসির মত কোনো বস্তুগত ও ব্যক্তিগত আচরণকে বোঝায় না, নীতি হচ্ছে উম্মাহর জন্য সর্বকালীন (Universal) দিক-নির্দেশনা। আরবে হোক কিংবা সাইবেরিয়াতে- এসকল সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু আবহাওয়াভেদে পোশাক আশাকের পরিবর্তন হতেই হবে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁর নিজের সুন্নাহ বা নীতির উল্লেখও করেছেন। যেমন:

০১. **মো'মেনদেরকে আল্লাহ কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন:** আল্লাহ বলেন, যদি কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করত এবং পরবর্তীতে তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী খুঁজে পেত না। এটা আল্লাহর সুন্নাহ, যা পূর্ব হতে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর সুন্নাহতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা ফাতাহ ৪৮:২২-২৩)

০২. **গুজব রটনাকারী মোনাফেকদের প্রতি আল্লাহর কঠোর অবস্থান:** আল্লাহ বলেন, যদি মোনাফেক, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা মদিনায় মিথ্যা গুজব ছড়ায়, তারা যদি এ কাজ বন্ধ না করে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে তাদের দাঁড় করিয়ে দেব। এরপর তারা তোমার সঙ্গে খুব অল্প সময়ই মদিনায় অবস্থান করতে পারবে। তারা অভিশপ্ত হবে; যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, তাদের ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। এটা আল্লাহর সেই সুন্নাহ, যা পূর্বে যারা অতীত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর তুমি আল্লাহর সুন্নাহতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা আহযাব ৩৩:৬০-৬২)

এভাবে আল্লাহ যেখানেই তাঁর নিজের সুন্নাহ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, প্রতিক্ষেত্রেই তিনি বলেছেন, তাঁর সুন্নাহ অপরিবর্তনীয় যা পূর্ব থেকে চলে আসছে। সুন্নাহ মানে

যদি ব্যক্তিগত অভ্যাস অনভ্যাস বোঝায় তাহলে আল্লাহর সুন্নাহ কথার কী তাৎপর্য থাকে? মোদ্দা কথা, আল্লাহ তাঁর রসুলকে যে দায়িত্ব বা মিশন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেটা বাস্তবায়নের জন্য রসুলাল্লাহ যে কর্মনীতি, নিয়ম বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন সেটাই হচ্ছে তাঁর সুন্নাহ। আল্লাহ তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে কেন পাঠিয়েছেন তা পবিত্র কোর'আনের অন্তত তিনটি আয়াতে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি (আল্লাহ) তাঁর স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন সত্য জীবনব্যবস্থা (দীন) ও পথনির্দেশ (হেদায়াহ) সহকারে যেন তিনি একে অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন (সুরা ফাতাহ ৪৮:২৮, সুরা তওবা ৯:৩৩, সুরা সফ ৬১:৯)। এই হচ্ছে রসুলের কাজ, আল্লাহর দীনকে অন্য সব মানবরচিত দীনের (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি) উপর প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও তা দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করাই ছিল তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে তিনি যে নীতি বা নিয়ম মেনে চলেছেন সেটাই তাঁর সুন্নাহ। জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া। কারণ কেবল উপদেশ দিয়ে একটি জাতির সবাইকে শৃঙ্খলিত রাখা যায় না, উপদেশের পাশাপাশি শাস্তিও দিতে হয়। তো অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কী নীতি ছিল? তিনি কি শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, নাকি ক্ষমা করার পক্ষে ছিলেন?

দুটো ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই এ বিষয়ে তাঁর নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। মা'ইয (রা.) নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করতে রসুলাল্লাহ (সা.)-এর কাছে বারবার আসেন এবং বলেন 'আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে শাস্তি দিন।' প্রথমে রসুলাল্লাহ (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেন এবং পরামর্শ দেন যাতে তিনি নিজের গুনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু মা'ইয (রা.) বারবার ফিরে আসেন এবং শাস্তির জন্য অনুরোধ করেন। যখন রসুলাল্লাহ (সা.) নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করেন। (বুখারি, হাদিস নম্বর: ৬৮২৪, মুসলিম হাদিস নম্বর: ১৬৯১)

অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত, ধনী ও প্রভাবশালী কোরায়েশ বংশের মাখজুম শাখার নারী ফাতিমা বিনতে কায়েস যখন চুরির অপরাধে ধরা পড়েন, তখন কুরাইশের নেতারা তাকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, যাতে তার সম্মান রক্ষা করা যায়। এজন্য তারা রসুলাল্লাহর (সা.) প্রিয় সাহাবী উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে দিয়ে রসুলাল্লাহর নিকট সুপারিশ করান। উসামা (রা.) যখন ফাতিমার শাস্তি মাফের সুপারিশ করেন তখন রসুলাল্লাহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'তুমি কি আল্লাহর হুদুদ

(আইন) সম্পর্কে সুপারিশ করছ? আল্লাহর কসম, যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও চুরি করত, আমি তার হাতও কেটে দিতাম। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ ছিল এটাই যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ক্ষমা করত, আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত, তখন তাকে শাস্তি দিত।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে রসুলাল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে জানান যে, আল্লাহর হুকুম কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কোনো পক্ষপাত করা হবে না। তারপর তিনি ফাতিমার হাত কাটার আদেশ দেন এবং শাস্তি কার্যকর হয়। (বোখারি, হাদিস নম্বর: ৬৭৯৮, মুসলিম, হাদিস নম্বর: ১৬৮৮)

তাহলে দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর সুন্নাহ বা নীতি কী? দু'জনই চুরি করে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে কিন্তু একজনকে তিনি ক্ষমা করতে চাইলেন। অপরজনকে কারো সুপারিশেই ক্ষমা করলেন না। কেন তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি এতটা কঠোর হলেন। এর কারণ হচ্ছে, মা'ইয (রা.) রিপুর বশবর্তী হয়ে একটি কঠিন অপরাধ করে ফেলেছেন। কেউ তাকে সেই অপরাধ করতে দেখেনি, কেউ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতেও আসেনি এবং তাঁর অপরাধের দ্বারা তিনি কারো ক্ষতিও সাধন করেননি। তিনি নিজেই অপরাধবোধের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের শাস্তি দাবি করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন ব্যভিচারের শাস্তি অতি কঠোর। তবু স্বেচ্ছায় সেই কঠোর শাস্তি বরণ করতে চাওয়া থেকে তার অনুতাপ ও আত্মিক পরিশুদ্ধির মাত্রা রসুলাল্লাহ বুঝতে পারেন ও তাঁকে ক্ষমা করেন।

অন্যদিকে সেই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও অবস্থাসম্পন্ন নারী যে অন্যের অধিকার গ্রাস করেছে, তাকে যদি তিনি অপরের সুপারিশ মেনে ক্ষমা করে দিতেন তাহলে সমাজে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হত যে, প্রভাবশালীরা অপরাধ করলে তার কোনো শাস্তি হয় না। রসুলাল্লাহ এটা হতে দিলেন না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি কতটা দৃঢ়সংকল্প তা বোঝাতে তিনি এও বললেন, যদি তাঁর মেয়ে ফাতিমাও (রা.) চুরি করত, তিনি তাকেও শাস্তি দিতেন। এটাই হচ্ছে পবিত্র কোর'আনে বর্ণিত আল্লাহর নীতি। আল্লাহ বলেছেন, হে মো'মেনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত

(সুরা নিসা ৪:১৩৫)। এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারও ধনী বা দরিদ্র অবস্থা কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না এবং নিজের বা নিকট আত্মীয়দের জন্যও পক্ষপাত করা যাবে না।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, 'হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (সুরা মায়েদা ৫:৮)। এই আয়াতে শত্রুর সঙ্গেও পক্ষপাতহীনভাবে ন্যায়বিচার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রসুলাল্লাহ এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। এগুলোই ছিল তাঁর সুন্নাহ। বর্তমানে এই সুন্নাহগুলোকে পরিত্যাগ করে রসুলাল্লাহর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাসকে সুন্নাহ বলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আবার দীনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যখন কোনো কাজ করা হচ্ছে তখন যদি সেখানে আরেকটি হুকুম উপস্থিত হয় তখন কোনটা রেখে কোনটা করতে হবে, এ রকম ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ কী ছিল? যেমন ধরুন, যুদ্ধের অভিযান শুরু হয়েছে, এর মধ্যে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তখন তিনি কী করেছেন? কোনটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?

বনি কোরায়জা অভিযানের জন্য সাহাবিদের প্রেরণের সময় রসুলাল্লাহ হুকুম দিয়েছিলেন যেন সবাই দ্রুত বনি কোরায়জার প্রান্তরে গিয়ে সমবেত হয় এবং 'বনি কোরায়জায় পৌঁছানোর আগে কেউ আসরের নামাজ আদায় না করে। সালাত আদায় করবে সেখানে পৌঁছে।' তিনি এও বলেন, 'যে দ্রুত সেখানে গিয়ে সালাত করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। (বোখারি, হাদিস ১২৮৪, মুসলিম ৩১২)'

এই নির্দেশ পাওয়ার পর সাহাবিরা দ্রুত বনি কোরায়জায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। তবে পথে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যে দুটি মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। একদল সাহাবি মনে করেন যে যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে বনি কোরায়জার মাঠে পৌঁছাতে হবে। এজন্য মাঝপথে তারা সালাতের জন্য থামলেন না; এমনকি সালাতের সময় চলে গেলেও না। তারা মাগরিবের পর সেখানে পৌঁছেন এবং কাজা সালাত আদায় করেন।

অন্যদল সাহাবি রসুলাল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশকে এমনভাবে বোঝেন যে তিনি দ্রুত যাওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু আসরের সালাতের সময় চলে যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং, তারা পথে আসরের সালাত আদায় করেন। (বোখারি হাদিস নম্বর ৯৪৬ এবং মুসলিম হাদিস নম্বর ১৭৭৯-১৭৮০)

এই ঘটনা সম্পর্কে যখন রসুলাল্লাহকে (সা.) জানানো হয়, তখন তিনি উভয় দলের উপর কোনো তিরস্কার করেননি। কারণ ঘটনা তখন অতীত আর এ নিয়ে

তিনি কথা বাড়াননি। কেননা অভিযানের পূর্বেই তিনি বলে দিয়েছিলেন সালাতের জন্য বিরতি না দিয়ে দ্রুত সেখানে যাওয়ার জন্য আর যারা দ্রুত সেখানে গিয়ে সালাত করবে তাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াবেরও ঘোষণা দেন। তাতে বোঝা যায় তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন জেহাদের অভিযানকে।

রমজান মাসে যদি কখনও জেহাদের অভিযানে যেতে হত, তখনও রসুলাল্লাহ সওমের তুলনায় জেহাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, 'একবার নবী (সা.) এর সঙ্গে আমরা সফরে ছিলাম। আমাদের কেউ সিয়াম পালন করেছেন আবার কেউ ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা এক প্রান্তরে অবতরণ করলাম। চাদরবিশিষ্ট লোকেরা আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ছায়া লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোনো কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন রসুলাল্লাহ বললেন, আজ তো সওম ভঙ্গকারীরা সমুদয় সওয়াব অর্জন করে নিল (বোখারি: ২৬৯১, মুসলিম: ২৪৯৩)।

অতি ধার্মিকতা, অতি পরহেজগারি করার মানসিকতাসম্পন্ন কিছু লোক সর্বযুগে, সর্বকালেই ছিল। কিন্তু আল্লাহর দীন ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি কঠোরতার পক্ষে না, তিনি সরলতার পক্ষে, ছাড় দেওয়ার পক্ষে। তিনি পবিত্র কোর'আনে বারবার এ বিষয়ে তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

০১. আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চান না, কোনো প্রকার সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সুরা মায়েদাহ ৫:৬)।

০২. সওমের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না' (সুরা বাকারা ২:১৮৫)।

০৩. আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। (সুরা হজ ২২:৭৮)

যখনই সাহাবীদের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি তিনি দেখতে পেয়েছেন, ভারসাম্যহীন হতে দেখেছেন তখনই তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন, তাদেরকে একত্র করে এই দীনের ভারসাম্যের নীতি ও তাঁর সুন্নাহ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একদল লোক নবী সহধর্মিণীদের কাছে এসে রসুলাল্লাহর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এ ব্যাপারে অবহিত হওয়ার

পর তারা তাদের নিজেদের ইবাদত-বন্দেগীকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা সর্বদা সারারাত সালাত আদায় করবেন, সারা বছর সওম রাখবেন, কখনও সওম ভাঙবেন না। তারা মুখরোচক খাবার, বিয়ে এবং অন্যান্য দুনিয়ার বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেন। এ বিষয়ে রসুলাল্লাহ জানলেন এবং সবাইকে মসজিদে নববীতে ডেকে বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং তাঁকে বেশি ভয় করি; তথাপি আমি সওম রাখি এবং সওম ভাঙ্গি, আমি ঘুমোই এবং নারীদেরকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (বোখারি- ৭০৯০, মুসলিম ১৪০১)।

এখানে তিনি নিজের সুন্নাহ কী সেটা জানিয়ে দিলেন আর সেটা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা, কোনো বিষয়ের উপর অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ না করা। যারা এটা করবে তারা তার উম্মাহর অন্তর্ভুক্তই থাকবে না। কেউ দীনের কোনো বিষয়ে অনর্থক কঠোরতা আরোপ করলে, দীন নিয়ে অতি ব্যাখ্যা করলে, মাসলা-মাসয়েল নিয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলে তিনি রেগে লাল হয়ে যেতেন। অথচ অনেকের চোখে যেটা গুরুতর অপরাধ সেটাকে রসুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এ বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানব।

একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে অভিযোগ করলেন যে অমুক লোক নামাজ লম্বা করে পড়ান কাজেই তার (পড়ানো) জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি এত রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি। রেগে গিয়ে রসুলাল্লাহ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে যেন সহজভাবে করে, কারণ পিছনে আছে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কিছু লোক যাদের জরুরি কাজ আছে।' (বোখারি ও মুসলিম ৪৬৬)। রসুলাল্লাহর এই রেগে যাওয়ার কারণ অতিরিক্ততা, বাড়াবাড়ি, অতি মুসল্লি হওয়ার চেষ্টা। হ্যাঁ, কেউ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যক্তিগতভাবে নামাজ পড়তেই পারে, কিন্তু জামাতে নামাজের ইমামতি করার সময় পিছনের সবার সুবিধা অসুবিধার কথা তাকে খেয়াল রাখতে হবে।

আরেকটি কারণে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হয়েছেন সেটা হচ্ছে ঐক্য নষ্টের কোনো কারণ ঘটতে দেখলে। কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তওহীদের ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা। ঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ কোনো বিষয় নিয়ে মতভেদ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে একটি দল, একটি পরিবার বা একটি জাতি একমত থাকে ততক্ষণ তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

যখনই কোনো বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়, তখনই প্রথম ভাঙ্গন আরম্ভ হয়। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন, এই দীনকে তোমরা কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে মতভেদ কোরো না (সুরা শুরা ৪২:১৪)। এই ঐক্য যাতে না ভাঙ্গে সে জন্য আল্লাহর রসুল সদা শঙ্কিত ও জাগ্রত থেকেছেন এবং এমন কোনো কাজ যখন কাউকে করতে দেখেছেন যাতে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে তখন ভীষণ রেগে গেছেন।

একদিন দুপুরে আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) রসুলাল্লাহর ঘরে যেয়ে দেখেন তাঁর মুখ মোবারক ক্রোধে লাল হয়ে আছে। কারণ তিনি দু'জন আসহাবকে কোর'আনের একটি আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে, সে কুফরী করেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ (উম্মাহ) তাদের (ওপর অবতীর্ণ) কিতাবগুলির (আয়াতের) অর্থ নিয়ে মতবিরোধের জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও বললেন (কোর'আনের) যে অংশ (পরিষ্কার) বোঝা যায় এবং ঐক্যমত আছে তা বল, যে গুলো বোঝা মুশকিল সেগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও (ওগুলোর অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করো না)। (আব্দাল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত, আবু হোরায়রা রা. থেকে আবু দাউদ ৪৬০৪)

বিশ্বনবী (সা.) রেগে লাল হয়েছিলেন কেন? কারণ তিনি পরিষ্কার বলেই দিলেন অর্থাৎ আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করলে জাতির ঐক্য নষ্ট হয়ে যাবে। এর পরিণামে জাতি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শত্রুর কাছে পরাজিত হবে এবং পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে। এই হাদীসটিতে রসুলাল্লাহ কেবল কোর'আনের আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন, যদিও এই নিষেধাজ্ঞা যে কোনো মতবিরোধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তকদির নিয়ে মতবিরোধ করার ক্ষেত্রেও এমন আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে রসুলাল্লাহ রেগে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। (মুসলিম, আবু দাউদ)।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হচ্ছে- যে কাজ অর্থাৎ মতানৈক্য, মতভেদ পরিণামে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে তা কোন পর্যায়ের অপরাধ? আল্লাহর রসুল বলছেন, তা কুফর। অর্থাৎ এক কথায় মতভেদ, মতানৈক্য যে সৃষ্টি করে সে কুফরী করে, অর্থাৎ সে কাফের হয়। কাফের হলে আর রইল কী? তার সমস্ত আমল তো অর্থহীন এবং তার পরিণাম জাহান্নাম।

এবার আসুন আরেকটি ঘটনা লক্ষ করি। একদিন আল্লাহর রসুল (দ.) তার আসহাবসহ মসজিদে নববীতে বসা আছেন। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুইন আরব যে নিজেও ওখানে সবার সঙ্গে বসা ছিল, সে উঠে মসজিদের ভেতরেই প্রশ্রাব করতে শুরু করলো। সাহাবারা সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন- এই থামো থামো।

কিন্তু আল্লাহর রসুল (দ.) তাঁর সাহাবাদের বললেন ওকে বাধা দিও না, করতে দাও। তাঁর আদেশে আসহাবগণ বিরত হলেন এবং লোকটি প্রশ্রাব করা শেষ করলো। তারপর বিশ্বনবী (দ.) ঐ লোকটিকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন যে এই জায়গা আল্লাহর এবাদতের জায়গা, আল্লাহকে স্মরণ ও কোর'আন পাঠের জায়গা। কাজেই এখানে কারো পেশাব পায়খানা করা উচিত নয়। তারপর তাঁর আদেশে পানি এনে মসজিদ ধুয়ে ফেলা হলো [আবু হোরায়রা (রা.) এবং আনাস (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম]। হাদিসের বর্ণনা এবং ভাষা থেকে একথা পরিষ্কার যে এমন একটি ঘটনায় তিনি বিন্দুমাত্র রাগ করেননি, একটুকুও উত্তেজিত হননি, লোকটাকে প্রশ্রাব শেষ করতে দিয়েছেন ও তারপর কাছে ডেকে শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আরেক দিন একজন লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। লোকজন তাকে ধরে মহানবীর (দ.) দরবারে নিয়ে যাবার জন্য রওয়ানা হলো। পথে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়ি পড়ে। লোকজন ইবনে আব্বাসের বাড়ীর কাছে আসতেই লোকটি হঠাৎ সবার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে ইবনে আব্বাসের (রা.) বাড়ীতে ঢুকে তাকে জড়িয়ে ধরলো। লোকজন তাকে তাঁর কাছে থেকে ছাড়াতে না পেরে আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে যেয়ে ঘটনা বললো। রসুলাল্লাহ (দ.) ঘটনা শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন 'সে তাই করেছে নাকি?' বিশ্বনবী (দ.) কোনো শাস্তির কথা বললেন না।

এক যুবক একদিন রসুলাল্লাহর কাছে এসে বলল 'আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু আমি ব্যভিচার (যেনা) থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারব না'। হাদিস বর্ণনাকরী বর্ণনা করছেন যে সেই মহামানব রাগ তো করলেন না-ই বরং ঐ যুবককে স্নেহভরে নিকটে ডেকে বসিয়ে বললেন, তোমার মা, বোন, মেয়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? সেই যুবক রক্তাক্ত চোখে জবাব দিল, 'কেউ তা করার আগেই আমি তাকে দু' টুকরো করে কেটে ফেলবো।' মহানবী (দ.) বললেন 'তাই যদি হয় তবে তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন যে তুমি যার সাথে ব্যভিচার করবে সেও তো কারো মা বা বোন বা মেয়ে (বোখারী)।'

সহিহ হাদিসে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে কোনো লোক নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ব্যভিচার করে ফেলেছেন। পরে শুধু অনুতপ্ত হয়েই তারা ক্ষান্ত হন নি, তারা আল্লাহর দেয়া শাস্তি গ্রহণ করে পবিত্র হতে চেয়েছে, তারা আল্লাহর রসুলের (দ.) কাছে এসে তাদের ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করে দিয়ে শাস্তি চেয়েছেন। ঐসব ঘটনায় বিশ্বনবী (দ.) কী করেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। কোনো সামান্যতম রাগ করেন নি বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে

যেতে চেষ্টা করেছেন। ভাবটা এই রকম যে তুমি অপরাধ করে ফেলেছ তো ফেলেছই, সেটা আবার প্রকাশ করতে এসেছ কেন? তুমি না বললে তো কেউ জানবেই না যে তুমি কী করেছ। কাজেই ও গোপন ঘটনা গোপনই রাখো।

শাস্তি পেতে কৃতসংকল্প সেই লোককে যখন তিনি কিছুতেই বিরত করতে পারেন নি তখন তিনি তাকে উকিলের মত জেরা করেছেন; এই উদ্দেশ্যে যে যদি ঐ লোকের বর্ণনায় কোনো খুঁত বের করতে পারেন, তবে হয় শাস্তি দেবেন না অথবা লঘু শাস্তি দেবেন। এমন একটি ঘটনা উপরে বলে এসেছি।

যে সব ঘটনায় আল্লাহর রসুল (দ.) বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, সেইসব ঘটনায় বর্তমানের ধর্মীয় নেতারা কী করবেন। মসজিদে পেশাব করলে তো মেরেও ফেলতে পারেন। অন্যদিকে যে কাজে যে ব্যাপারগুলোয় সেই সর্বরিপুজয়ী সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রেগে লাল হয়ে গেছেন, উত্তেজনা ভরে কসম খেয়েছেন সেই হাদিসগুলি একটু দেখুন। দেখবেন সেই ব্যাপারগুলো বর্তমানে শুধু যে মহা উৎসাহ ভরে করা হচ্ছে তাই নয়, মহা পুণ্যের মহা সওয়াবের কাজ মনে করে করা হচ্ছে যেমন কোর'আনের আয়াত থেকে শুরু করে নানা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাহফিল বসিয়ে বিতর্ক বাহাস করা। যে কাজগুলোকে বিশ্বনবী (দ.) কুফর বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেই কাজ যে যত বেশি করছে আজকের এই 'দীন ইসলামের' দৃষ্টিতে সে তত পাক্কা মুসলিম।

লক্ষ করলে আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাবেন। সেটা হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিগত মহাপাপ, গুনাহে কবিরার ব্যাপারেও তিনি কিছুমাত্র রাগেন নি। কিন্তু আজ আমাদের কাছে যে সব বিষয়ের কোনো গুরুত্ব নেই- যেমন জাতীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা, লক্ষ্য, আকিদা, আমলসমূহের গুরুত্বের ক্রম ইত্যাদি এককথায় যেসব বিষয়গুলি পৃথিবীতে আল্লাহর সংবিধান ও শাসন-প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করতে পারে সেগুলির প্রত্যেকটায় তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কারণ হলো এই যে, আল্লাহর সংবিধান কোর'আন এবং রসুলের (দ.) হাদিস অনুযায়ী মানুষের জীবন শাসন ও পরিচালনা করা হলে, আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী আদালতে বিচার করা হলে, আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধের শাস্তি দেয়া হলে সমাজ থেকে ব্যক্তিগত অপরাধ নিজে থেকেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রমাণ ইসলামের প্রথম ৬০/৭০ বছরের ইতিহাস। অন্যদিকে ঐ কাজ না করে ব্যক্তিগতভাবে যত পুণ্যের-সওয়াবের কাজই করা হোক যত তাকওয়া করা হোক সমাজের সর্বপ্রকার অপরাধ বেড়েই চলবে, ফাসাদ-অন্যায়-অবিচার বেড়েই চলবে, যুদ্ধ, রক্তপাত, হানাহানি বেড়েই চলবে, ইবলিস সফল ও কৃতকার্য হবে। প্রমাণ বর্তমান পৃথিবী।

এক কথায় বিশ্বনবীর (দ.) ও তাঁর সাহাবাদের ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা আর আজকের আমাদের ধারণা বিপরীতমুখী।

তাহলে রসুলাল্লাহ কোন বিষয়ে রেগে লাল হয়ে গেছেন আর কোন বিষয়ে সামান্যও উত্তেজিত হননি, তার মধ্যেও আমরা রসুলাল্লাহর কর্মপদ্ধতি সুন্নাহ বা নীতির সন্ধান পাই। এভাবে বলতে গেলে তাঁর জীবনের যে মূল দায়িত্ব অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবনে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা এক কথায় শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা, সেটা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাঁকে যে সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই তাঁকে কোনো না কোনো নীতি (সুন্নাহ) অবলম্বন করতে হয়েছে। সেগুলোর বিশদ বিবরণ দিতে গেলে ভিন্ন একটি গবেষণাধর্মী বই লিখে ফেলতে হবে। তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কী করেছেন, আনন্দ বিনোদনের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, নারীদের অংশগ্রহণের জন্য কী করেছেন, মোনাফেকদের সঙ্গে তিনি কীভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন, আমির নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে তিনি কী নিয়ম অনুসরণ করেছেন, দুই সাহাবির মধ্যে কোর'আনের কোনো আয়াত নিয়ে তর্ক হচ্ছে- এ সময় রসুল কী করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন নাকি রেগে লাল হয়ে গিয়েছেন ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর উম্মাহর জন্য তিনি 'সুন্নাহ' হিসাবে রেখে গেছেন। সেসব বাদ দিয়ে কেবল দাড়ি, টুপি, জোব্বা, মেওসয়াককে যারা সুন্নাহ আখ্যা দিয়েছেন, তারা এই দীনকে সংকীর্ণ করে ফেলেছেন। এই নীতিগুলো বুঝতে হলে সমগ্র ব্যাপারটি আমাদেরকে ধারণার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমরা আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ কী বুঝতে পারব এবং সেক্ষেত্রে অন্ধের মতো মাসলা-মাসায়েলের বই, ফেকাহের কিতাব না হাতড়িয়ে নিজেরাই কোন ক্ষেত্রে কী করণীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

রসুলাল্লাহ যখন মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)- কে ইয়ামেনের গভর্নর হিসাবে প্রেরণ করলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যখন তোমার কাছে কোনো বিচার নিয়ে আসা হবে, তখন কীভাবে তুমি ফয়সালা করবে?' মুয়াজ (রা.) উত্তরে বলেন, 'আমি আল্লাহর কিতাব (কোর'আন) দিয়ে বিচার করব।' নবী (সা.) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'যদি তুমি কোর'আনে কোনো সমাধান না পাও?' মুয়াজ (রা.) বললেন, 'তাহলে আমি রসুলাল্লাহর (সা.) সুন্নাহ দ্বারা বিচার করব।' এরপর নবী (সা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি তুমি সুন্নাহতেও কোনো সমাধান না পাও?' মুয়াজ (রা.) উত্তরে বললেন, 'তাহলে আমি আমার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ব্যবহার (ইজতেহাদ) করব।' এই উত্তরে রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি রাসুলের দূতকে এমনভাবে পরিচালিত

করেছেন যেভাবে তিনি সন্তুষ্ট।' (সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৯২, তিরমিজি, হাদিস নং ১৩২৭)

এই হাদিসটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ফিকাহ গ্রন্থগুলোর বুনিয়াদ। ফকিহরা বই লেখার শুরুতেই ইজতিহাদের অনুমতি নিয়েছেন এই হাদিস থেকে। এরপর আসে ইজমা কিয়াস ইত্যাদি। কিন্তু তাদের তৈরি মাসলা মাসায়েলগুলো স্থান-কাল-পাত্রের অধীন। কোর'আনের বা রসুলাল্লাহর সুন্নাহর মতো চিরন্তন নয়। এজন্য আল্লাহর রসুল বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন যে, আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে গেলাম, একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আরেকটি হচ্ছে রসুলের সুন্নাহ।

◇◇

ইতিহাসকে বহুলোক বহুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সত্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, ন্যায় ও অন্যায়ের অবিরাম দ্বন্দ্ব, সমষ্টি ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মাকে একদিকে ইবলিস অন্যদিকে আল্লাহর আত্মা, রুহাল্লাহর টানাটানি- এই হল আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সত্যিকার অতীত। এবং এ শুধু অতীত নয় ভবিষ্যতও নিঃসন্দেহে এই-ই। এর কোনো বিরতি, কোনো চ্যুতি হয় নি, হচ্ছে না, হবে না।

- এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

◇◇

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
(Mohammad Bayazeed Khan Panni:
The Founder of Hezbut Tawheed)

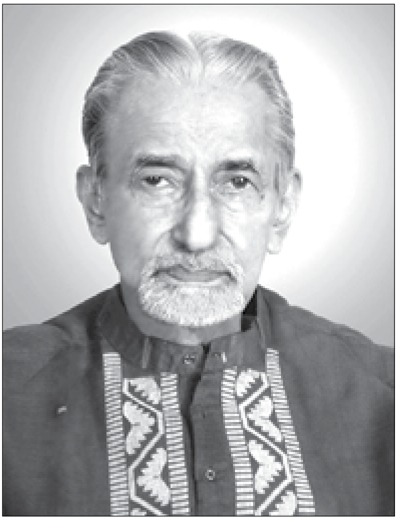

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পরিবার টাঙ্গাইলের করটিয়ার পন্নী পরিবার। অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই পরিবারে ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শবে বরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চরিত্রে ছিল আধ্যাত্মিক ও জাগতিক গুণাবলীর অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। ঘটনাবহুল ৮৬ বছরের জীবনে তাঁর একটি মিথ্যা বলারও নজির নেই।

সুলতানী যুগে গৌড়ের সুলতান (কররানি যুগ) হিসাবে, মুঘল আমলে আতিয়া পরগনার প্রশাসক (জায়গিরদার) হিসাবে এবং ব্রিটিশ যুগে করটিয়ার সুবৃহৎ এলাকার জনদরদি জমিদার হিসাবে এই ঐতিহ্যবাহী আফগান পন্নী পরিবার শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার সালতানাতকে মুঘল আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে গিয়ে সুলতান দাউদ খান কররানি ঐতিহাসিক রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬) প্রাণ উৎসর্গ করেন। বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল পন্নী জমিদারগণ। এমামুয্যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান

পন্নী তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা 'মাহমুদিয়া যন্ত্র' থেকে মৌলভী নইমুদ্দিন অনূদিত পবিত্র কোর'আনের প্রথম বঙ্গানুবাদ (২৩ পারা) প্রকাশ করেন। এই ছাপাখানা থেকেই তিনি প্রকাশ করতেন 'আখবারে এসলামীয়া' নামে মাসিকপত্র যা বাংলার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে কথা বলত। প্রাচ্যের আলীগড় বলে খ্যাত 'সা'দাত কলেজের' প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। তিনি প্রভিন্সিয়াল মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা এবং অর্থদাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন এমামুয্যামানের মায়ের নানা। তাঁর ছেলে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বগুড়া (এমামুয্যামানের খালু) ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৩-১৯৫৫)। পাকিস্তান আমলেও মাননীয় এমামুযযামানের পরিবারের আরো অনেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। চাচাতো ভাই খুররম খান পন্নী ছিলেন আইন পরিষদের চিফ হুইপ ও ফিলিপাইনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। আরেক চাচাতো ভাই হুমায়ুন খান পন্নী ছিলেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার। ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী। এমামুযযামানের মায়ের মামা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী। এমনিভাবে আরো বহু বরণ্যে ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল করটিয়ার পন্নী জমিদার পরিবার।

শিক্ষাজীবন:

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় করটিয়ার রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায়। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্তি হন এইচ. এম. ইনস্টিটিউশনে। এখান থেকে তিনি ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন পড়ে ভর্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এমামুয্যামান:

কলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় কলকাতা ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। তরুণ এমামুয্যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তিতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদি, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী অন্যতম। তিনি আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর 'তেহরীক এ খাকসার' আন্দোলনে যোগ

দিয়েছিলেন। তিনি খুব দ্রুত তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্ব লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে Special Assignment এর জন্য নির্বাচিত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' এর অন্যতম হিসাবে মনোনীত হন। তখন এমামুয্যামানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

চিকিৎসক ও সমাজসেবক:

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি হোমিওপ্যাথি নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং কর্মজীবনে তিনি দেশসেরা একজন হোমিওপ্যাথে পরিণত হন। ১৯৫৬-১৯৫৮ সনের কলেরা মহামারীর সময় তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে ভ্যাকসিন প্রদান করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মেডিকেল বোর্ডে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠারও তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৯৮ সনে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দুর্ধর্ষ শিকারী:

বাল্যকাল থেকে সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত তিনি পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বহু হিংস্র পশু শিকার করেছেন। তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' বাংলাদেশের জঙ্গলে শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রথম বই যা শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় অন্তুর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

চৌকস ক্রীড়াবিদ:

তিনি ছিলেন একজন শ্যুটার, ফুটবলার ও মোঁর সাইকেল স্ট্যান্ট। ১৯৫৬ সালে তিনি মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে জাতীয় দলের অন্যতম শ্যুটার হিসাবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডিকে আবার জনপ্রিয় করে তোলার

জন্য তিনি 'তওহীদ কাবাডি দল' প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি দেশজুড়ে বহু টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টেও কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়েছে।

লেখক ও প্রকাশক:

বেগম সুফিয়া কামাল এমামুয্‌যামানের নিকটাত্মীয় ছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থ 'মন ও জীবন' এর প্রকাশক ছিলেন এমামুয্‌যামান (১৯৫৭)। পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮ সনে তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম 'তওহীদ প্রকাশন'। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৯, এর মধ্যে এ ইসলাম ইসলামই নয়, দাজ্জাল? ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, ইসলামের প্রকৃত সালাহ, The Lost Islam উল্লেখযোগ্য।

পার্লামেন্টের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য:

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক যুগ পরে এমামুযযামান আবার রাজনীতিতে ফিরে আসেন। ১৯৬৩ সনে টাঙ্গাইল-বাসাইল এলাকা থেকে ছয়জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের উপর হামলা ও গণহত্যা আরম্ভ হয়। এমামুযযামান দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলোয় গিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা প্রতিহত করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকেই পুরোপুরি গুটিয়ে নেন, কারণ প্রচলিত রাজনীতির দুর্নীতির সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না।

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাঁর ছিল দৃপ্ত পদচারণা। তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ হোসেন খসরুর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। জাতীয় কবি নজরুলও ছিলেন একই গুরুর শিষ্য। নজরুলের কীর্তি সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি।

হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠা:

বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মুসলিম জগৎ কোনো না কোনো পাশ্চাত্য প্রভুর গোলাম, যারা কিনা এক সময় জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সামরিক অর্থনৈতিক শক্তিতে সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। তাদের এই করুণ পরিণত কেন হল? একসময় আল্লাহর অশেষ রহমে এ প্রশ্নের জবাব তিনি

পেতে আরম্ভ করলেন। একটু একটু করে, সারা জীবন ধরে তিনি বুঝতে পারলেন কোথায় সে শুভঙ্করের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা, তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বুঝলেন, চৌদ্দশ বছর আগে মহানবী (সা.) যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে দীনটি আর আজ আমরা 'ইসলাম ধর্ম' বলে যে দীনটি অনুসরণ করি এ দু'টি দীন পরস্পর-বিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো ইসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্তমানের মুসলিম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ইসলামের সঠিক আকিদা, তওহীদের মর্মবাণী, এবাদতের অর্থ, মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী হবার শর্ত, হেদায়াহ-তাকওয়ার পার্থক্য, সালাতের (নামাজের) সঠিক উদ্দেশ্য, দাজ্জালের পরিচয়, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, পাঁচ দফা কমসূচি এবং কীভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদিসহ আরো বহু বিষয় তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারলেন।

১৯৯৫ সনে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের এ প্রয়াসকে সাংগঠনিক রূপ দিতে 'হেযবুত তওহীদ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চিমা সভ্যতার ব্যর্থতার কারণ যেমন তুলে ধরেন, তেমনি প্রকাশ করেন ইসলামের সামগ্রিক ধারণা। উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতার মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক অবস্থানকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সারাদেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে উগ্রবাদী ধর্মান্ধ শ্রেণী। ফলে একাধিকবার তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে গ্রেফতারও করা হয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে হেযবুত তওহীদ নিরন্তরভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাজার বছরের ফিকাহ, তাফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সিরাতুল মুস্তাকিম) ইসলাম চাপা পড়ে রয়েছে সে ইসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার করে মানুষের সামনে উপস্থিত করতে।

শেষ উপদেশ:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের হেদায়াহ দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রসুলকে (সা.) যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিলেন সেই ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে তা এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ না করার নির্দেশ দিয়ে ২০১২ সনের ১৬ জানুয়ারি মাননীয় এমামুয্যামান আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার গোড়াইতে অবস্থিত পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাঁকে চিরশান্তিতে রাখুন।

পরিশিষ্ট (Appendix)

এই পুস্তিকায় হেযবুত তওহীদের বক্তব্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি জীবনব্যবস্থা ইসলামকে আল্লাহ সর্বযুগের উপযোগী করে তৈরি করেছেন। তাই বর্তমান এই জটিল ও বৈচিত্রময় পৃথিবীতে ইসলাম সবচেয়ে কার্যকরী। প্রয়োজন কেবল ইসলামের সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive Concept) যা ইসলামকে যুগোপযোগী, যুক্তিপূর্ণ, উদারনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনব্যবস্থা হিসাবে বুঝতে আমাদের সহযোগিতা করবে। ইসলাম এমন একটি দীন যেখানে কোনো সংকীর্ণতার স্থান নেই (সুরা হজ ২২:৭৮), কোনো অন্ধত্ব বা গোড়ামির স্থান নেই (সুরা আন'আম ৬:৫০), কোনো জবরদস্তি (সুরা বাকারা ২:২৫৬) ও বাড়াবাড়ির (আল মায়েদা ৫:৭৭) সুযোগ নেই। এই জীবনবিধান কোনো নির্দিষ্ট স্থান কাল বা পাত্রের মধ্যে সীমিত নয় (সুরা সাবা ৩৪:২৮)। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে একটি কট্টরপন্থী, উগ্রবাদী গোষ্ঠী রয়েছে যারা ইসলামকে প্রাচীন ধ্যানধারণার প্রলেপে আবৃত করে রেখেছে। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ধর্ম থেকে নিরাশ হয়ে অন্যত্র মানবজাতির সংকটের সমাধান খুঁজে ফিরছেন অথবা নিজেরাই বসেছেন সংস্কারসাধনে। আমরা ইসলামকে তার অনাবিল রূপে মানুষের সামনে তুলে ধরছি। আমাদের প্রস্তাবিত ইসলামের প্রকৃত রূপকে সাদরে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে জাতির সেই সংকীর্ণমনা অংশটি। তারা গত ৩০ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার (Propaganda) চালিয়ে আসছে এবং আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না।

কিন্তু আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, বর্তমানে যে রাষ্ট্রসংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এর প্রেক্ষিতে আমরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক, যৌক্তিক, আধুনিক নীতিমালা প্রস্তাব করছি। এই পুস্তিকায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম মাত্র। আমাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা বুঝতে হলে অন্যান্য বই, প্রবন্ধ পড়তে হবে এবং আমাদের বক্তব্য শুনতে হবে। **আমাদের এই প্রস্তাবনা পাঠের পর কেউ যদি ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে কোনো ধারা যোগ করতে চান তাহলে সেই পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।** তবে শেষ কথা হল, আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে না।' (সুরা রাদ ১৩:১১)।

....